বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
হোসনে আরা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৭১
সেশন : ২০০১-২০০২

Dhaka University Library
447508

447508

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ফোন : ৮৮০-২-৮৬৬১৯২০-৭৯/৬১৯০, ৬১৯১
Phone : 880-2-9661920-79/6190, 6191
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
Fax : 880-2-8615583
E-mail : history@univdhaka.edu

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Department of History, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh

তারিখ : ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, হোসনে আরা (রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৭১, সেশন ২০০৯-২০০২) আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য 'বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভটি তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত করেন নি।

447508

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ও
তত্ত্বাবধায়ক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
বগুড়া জেলার অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাজনৈতিক কার্যক্রম ১-২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, অসহযোগ আন্দোলন, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও ভারত গমন ২৯-৫০

তৃতীয় অধ্যায়
বগুড়ায় পাকবাহিনীর নির্যাতন, গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর ৫১-৭১

চতুর্থ অধ্যায়
বগুড়ার রণাঙ্গন ৭২-১০৯

পঞ্চম অধ্যায়
মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ১১০-১২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা ১২৭-১৩৯

উপসংহার ১৪০-১৪৪

পরিশিষ্ট ১৪৫-২১৯

গ্রন্থপঞ্জি ২২০-২৩১

447508

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম-আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ, বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। সৌভাগ্য কিংবা অর্জন যা-ই বলি-না-কেন একথা সত্যি, বাংলাদেশের মানুষের জীবনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই মহৎ অভিধার সংযোগ ঘটেছে। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রসন্নতার ঝিলিক লক্ষ করা গেলেও আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিকিৎসাসহ সর্বদিক বিবেচনায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-পীড়ন-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। এই দমন-পীড়ন ও চাপানো মতবাদের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি প্রথম দ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ তাদের মুখের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। ধীরে ধীরে অধিকারের প্রশ্ন আন্দোলনে রূপ নেয়।

শুরু হয় দমন-পীড়ন-নির্যাতন। বাঙালির ভাষা-প্রশ্নে ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি সরকার ভাষা-আন্দোলনকারীদের উপর নিষ্ঠুর-নির্মম নির্যাতন চালায়। সেদিন পাকবাহিনীর প্রত্যক্ষ গুলিতে শহীদ হন সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বারসহ নাম না-জানা আরো অনেকে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১—এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যায়। পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা ও অধিকারকে চরম অসম্মান করেই শুধু ক্ষান্ত হয় না, তারা জুলুম-নির্যাতন ও শোষণের মাত্রা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। '৫২-র ভাষা-আন্দোলন সময় গড়িয়ে '৬৯-এ এসে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনে' রূপ নেয়—ঘটে যায় গণঅভ্যুত্থান। সর্বস্তরের মানুষ তখন বাংলাদেশ ও মানুষের মুক্তিসহ বাঁচার মতো বাঁচার আত্মচিৎকারে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শোষণ-স্বার্থে টান পড়ায় মরিয়া হয়ে ওঠে। ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ তথা সেই সময়কার পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরো অধিকতর বাড়িয়ে দেয়। অতঃপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সাফল্য অর্জনকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অস্বীকৃতি জানায়। শুরু হয় আন্দোলন-সংগ্রাম-অসহযোগ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে 'ঐতিহাসিক ভাষণ' প্রদান করেন। এই ভাষণের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির প্রাণবীজ নিহিত। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

৯ মাস দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম-রক্তপাত, মা-বোনের সম্ভ্রম-ইজ্জত-হররানির পর বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন সাধিত হয়—বাংলাদেশ স্থান পেল বিশ্ব মানচিত্রে, লাভ করলো একটি পতাকা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশব্যাপী যে নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় সে-দিক বিচারে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং তা ঐতিহাসিক সত্য। এর সম অর্জন আর দ্বিতীয়টি নেই। এই অর্জনে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুখ-সড়কে অবস্থিত বগুড়ার অবদান অপরিসীম। ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কে অবস্থিত হওয়ার ফলে এবং সড়ক যোগাযোগ ভাল হওয়ার সুবাদে বগুড়া জেলায় পাকবাহিনী, তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদের অবস্থান ও যোগাযোগ রক্ষার অনুকূল-অবস্থা যেমন ছিল তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও তা সহায়ক এবং কঠিন দুটি অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় সীমান্তবর্তী জেলা এবং অবাঙালি-বিহারিদের অবস্থান থাকায় বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় ভিন্নমাত্রিকতা পায়। যার ফলে পাকবাহিনী, অবাঙালি বিহারিরা এবং এদেশীয় স্বাধীনতা-বিরোধীচক্র বগুড়ায় ব্যাপক লুট, অগ্নি-সংযোগ ও ধর্ষণ চালায়।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠ সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সাক্ষাৎকারের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। সময় এবং আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে ব্যাপকভিত্তিক মাঠ-গবেষণা পরিচালন সম্ভব না-হলেও সম্ভবপর প্রায় সবগুলো অনুষঙ্গেরই সহায়তা গৃহীত হয়েছে বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মে।

আঞ্চলিক ইতিহাস ভিন্ন কোনো দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন কখনো সম্ভব নয়। প্রতিটি অঞ্চলের সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যভিত্তিক ও ব্যাপকভাবে গবেষণাধর্মী আঞ্চলিক ইতিহাসকে একত্র করে একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক ইতিহাস রচিত হয়েছে। বিগত দশ বছর ধরে আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন এলাকার ইতিহাস রচিত হলেও বগুড়া সম্পর্কে সেরকম কোনো তথ্যবহুল ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয় নি।

বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অবিস্মরণীয় অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকবাহিনীর ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞের মধ্যদিয়ে যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তা আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না। এর পেছনে ছিল শত শত বছরের শোষণ ও বঞ্চনার মর্মজ্বালা ইতিহাস। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই বাংলা দুইশত বছর ব্রিটিশদের দ্বারা শোষিত হওয়ার পর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান নামে জন্ম লাভ করে। কিন্তু ১৯৪৮ সালেই পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার উপর আঘাত হানার মাধ্যমে নিজেদের স্বরূপ উন্মোচন করে। মূলত এর পর থেকেই বাঙালি জাতি একের পর এক আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা,

Dhaka University Institutional Repository

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং সবশেষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী ঢাকাসহ বড় বড় শহর আক্রমণের মাধ্যমে যে যুদ্ধের সূচনা করে তা ক্রমান্বয়ে শহর, বন্দর, গ্রাম-গঞ্জসহ সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের মুক্তিকামী আপামরজনগণ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ছাড়া বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ এই যুদ্ধের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছে। কেউবা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, কেউবা খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে। বাঙালি নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণের মাধ্যমেও দেশমাতৃকার সেবা করতে সচেষ্ট হন।

আঞ্চলিক ইতিহাস জাতীয় ইতিহাস রচনার মূলসূত্র হিসেবে কাজ করে। কারণ জাতীয় পর্যায়ে একটি দেশের যে ইতিহাস রচনা করা হয় তাতে বিভিন্ন এলাকার খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটে ওঠে। তথাপি স্থানীয়ভাবে তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা হলে তার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের সঠিক চিত্রটি সহজেই চিত্রায়ন সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বৃহত্তর বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হই।

বিভিন্ন জেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও বগুড়া অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া জেলা পাকবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী উভয়ের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। বগুড়া ছিল উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। এই জেলার উপর দিয়েই উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভূ-কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি। সেই সময়কার আঞ্চলিক পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতা, জাতীয় দৈনিকে আঞ্চলিক ঘটনার পূর্ণ ও ধারাবাহিক বিবরণ না থাকা, জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের যারা সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন তাদের অধিকাংশেরই তথ্যমূলক বিশদ বর্ণনা দিতে অক্ষমতা, বগুড়া অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কোনো মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি বা ব্যক্তিগত নথিপত্র না থাকা ইত্যাদি নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে গবেষণাকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবুও একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এ.কে. মুজিবুর রহমানের 'রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের তেমন কোনো ইতিহাস না থাকলেও বগুড়ার বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম জানা যায়। এই গ্রন্থ গবেষণাকর্মে কিঞ্চিৎ সহযোগিতা করলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ নয়। কাজী মোঃ মিছের এবং প্রভাসচন্দ্র সেন রচিত 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন, মধ্যযুগ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বগুড়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকলেও বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কোনো তথ্য এখানে নেই। এছাড়া জয়পুরহাট অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে 'মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট' গ্রন্থটি রচিত হলেও এখানে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যনির্দেশ এবং কিছু

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধার অতি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার, কিছু সংগঠকের স্মৃতিচারণ ও কয়েকজন সাংবাদিকের দু'একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন ভিন্ন এ গ্রন্থে তেমন কিছুই নেই যা একটি এলাকার পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' গ্রন্থে বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেখানে দেখা যায়, এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার ও সত্যেন সেনের গ্রন্থ থেকে সংকলিত বিষয়াবলি ছাড়া মৌলিক তথ্যানুসন্ধানী কোনো গবেষণা এখানে নেই। এছাড়াও অন্যান্য খণ্ডে কিছু মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় সহায়ক তেমন কিছুই লক্ষণীয় নয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাকবাহিনীর হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য উঠে এসেছে যা মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড ইতিহাস বিধায় মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা আরো গভীরভাবে অনুভূত হয়।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক প্রকাশিত তেমন কোনো গ্রন্থ নেই। তবে এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার রচিত 'দুই শতাব্দীর বুকে বগুড়া' গ্রন্থে বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা গবেষণা-সহায়ক হলেও পর্যাপ্ত নয়। তবে এই গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা কাল্পনিকতার আশ্রয়ে মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক যে কাহিনীচিত্র রচিত হয়েছে তারও গুরুত্ব অপরিসীম।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে 'বগুড়া জেলার অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাজনৈতিক কার্যক্রম' শীর্ষক আলোচনায় বগুড়া জেলার পরিচিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রত্ন-সম্পদ, নদীনালা, খালবিল, রাস্তাঘাট, কৃষিসম্পদ ও সম্ভাবনাসহ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্র-ভূগোল-ইতিহাস সন্নিবেশিত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ার অবদান তুলে ধরার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

'বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, অসহযোগ আন্দোলন, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও ভারত গমন' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনে উদ্দীপ্তমূলক ভাষণে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, ঢাকার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আন্দোলন-সংগ্রামমুখর নেতৃত্বসহ বগুড়ার সর্বস্তরের জনগণের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত মনোভাব ও অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ায় পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আল্-শামসরা ব্যাপক ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নি-সংযোগ চালায়। তাদের অমানবিক ও পৈশাচিক নির্যাতনের নিদর্শনস্বরূপ বধ্যভূমি ও গণকবরের অনুসন্ধানসহ এই সকল নির্যাতনের দালিলিক প্রমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টাসহ সাক্ষাৎকার স্থান পেয়েছে 'বগুড়ায় পাকবাহিনীর নির্যাতন, গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

আর 'বগুড়ার রণাঙ্গন' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে সমগ্র বগুড়া জেলার প্রায় সবগুলো থানার মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। সম্মুখযুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ, নৌ-যুদ্ধ, আকাশ পথের প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বর্ণনায় উঠে এসেছে বগুড়ার সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষের দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ। স্বদেশ-চেতনা, সমাজবদ্ধতা ও দায়বদ্ধতা সম্বলিত এই অধ্যায়টিতে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা' শীর্ষক এই অধ্যায়টিতে বগুড়ার মানুষের ত্যাগ, কৃতিত্ব, দেশপ্রেম, কষ্টসহিষ্ণু মনোভাব এবং নৈপুণ্য স্থান পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা আতঙ্কিত হওয়ার মতো। স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের নেপথ্যে অনেক রক্ত, শ্রম, ঘাম ও জীবন দান করতে হয়েছে। কুচক্রী ও দালাল শ্রেণী বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা, লুণ্ঠনসহ যাবতীয় অপকর্মের মাধ্যমে দমিয়ে রাখার প্রয়াস চালিয়েছিল, সেই শ্রেণীচক্রের কার্যকলাপে ভাস্বর 'স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়।

'বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ' অভিসন্দর্ভে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ার সামগ্রিক চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে অনেক সময় বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখে যে, দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। কেউবা অবস্থা এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ পাল্টে নতুন ধারার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা তথ্য প্রকাশে অনীহা কিংবা ভয়ভীতি অথবা নিজের ক্ষতির দিকটি বিবেচনা করেছেন। তবুও এ কাজে বগুড়াবাসী যে সহযোগিতা প্রদান করেছেন সে সহযোগিতা স্মরণযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বগুড়া জেলা : পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ প্রকল্প' শীর্ষক গবেষণা পত্রে আমার শিক্ষক অধ্যাপক তাইবুল হাসান খান বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। 'বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার নেপথ্যে তাঁর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সহযোগিতার ঋণ অপরিশোধ্য। এই গবেষণাকর্ম অধ্যাপক তাইবুল হাসানের অনুসন্ধানী প্রকল্পেরই পরিপূরক।

সেই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে আমি ধন্যবাদ জানাই—আমাকে এই কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য। অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক আহমেদ রেজা, ড. আফরোজা হোসেন, ড. শাহসূফী মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষসহ যাঁরা আমাকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বিশদ সংবাদ দিয়ে বই-পুস্তক-তথ্যসহ বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আবদুল লতিফ সিদ্দিকী—তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঋণের নয়, 'পিতা-পুত্রী'র।

সর্বোপরি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের নাম স্মরণযোগ্য। তাঁর কুশলী তাগাদা, দূরদর্শী তত্ত্বাবধান এবং কষ্টসহিষ্ণু ত্যাগ আমাকে গবেষণাকর্মে প্রভূত সহায়তা করেছে—আমি ঋণী।

বগুড়ার জীবিত মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের জনগণ এই কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করে আমাকে ঋণাবদ্ধ করেছেন। সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ভাষা সৈনিক গাজীউল হক, সংস্কৃতি কর্মী ড. এনামুল হক, রাজনীতিবিদ মমতাজ উদ্দিন, ফেরদৌস জামান মুকুল, এ.বি.এম শাজাহান, শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, শোকরানা, গোলাম জাকারিয়া খান রেজা, আমান উল্লাহ খান, আমজাদ হোসেন, আবদুল জলিল, মোখলেসুর রহমান, আবদুল মতিন, আবদুল আজিজ রঞ্জু, এ্যাডভোকেট রেজাউল বাকী, রেজাউল করিম মন্টু, আব্দুল হামিদ, শফিকুল আলম, এ.কে মুজিবুর রহমান, কমরেড আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুস সাত্তার তারাসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা—তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আবুল কাশেম মন্ডল, সাংবাদিক জিয়া শাহীন, আমিনুল হক বাবুল এবং গোলাম রব্বানী লিটন তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যে সহযোগিতা করেছেন তা অপরিশোধ্য।

তথ্য সংগ্রহসহ কম্পোজ-প্রুফ সংশোধনের মতো পরিশ্রমী কাজে সহযোগিতার সারিতে যাদের নাম বলতে হয় তাদের মধ্যে আবদুল হান্নান ঠাকুর, শামসুজ্জামান মিলকী, মামুন অর রশীদ, সোহেল রানা, ওমর খৈয়াম, কাফী এবং মাসুদ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমার এই গবেষণাকর্ম সামান্য কাজে লাগলে শ্রম সার্থক হবে।

গবেষণাকর্মের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর লাইব্রেরি, জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আর্কাইভস, ড. হায়াৎ মামুদ এবং ড. এ.কে.এম শাহনাওয়াজ, ড. আতিকুর রহমান-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাসহ অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভ করেছি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক এবং মাঠ-গবেষণা নির্ভর কাজ করতে গিয়ে আমার সন্তানদ্বয় অঙ্কুর ও অরণিকে স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। এই কর্মে আমার স্বামী ড. গোলাম মোস্তফা ও সন্তানসহ বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সকলের সহানুভূতি আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়া জেলার অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাজনৈতিক কার্যক্রম

ভৌগোলিক বিবরণ

বগুড়া বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুখ-সড়কে অবস্থিত। ভারতীয় সীমান্তবর্তী জেলা বিশেষত, হিলি স্থলবন্দর বৃহত্তর বগুড়া জেলায় অবস্থিত হওয়ার ফলে এই জেলার গুরুত্ব অপরিসীম। সড়কপথ-নৌপথ-রেলপথ থাকায় এবং বগুড়ার অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া জেলার গুরুত্ব অধিকতর—সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় শরণার্থীদের যাতায়াত, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এবং ট্রেনিং সমাপান্তে হিলি সীমান্ত দিয়ে বগুড়া হয়ে রংপুর, গাইবান্ধা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ এমনকি টাঙ্গাইল ও জামালপুরের কিয়দংশে অপারেশন চালানোর ক্ষেত্রে বগুড়ার ভূমিকা অপরিসীম।

সড়ক, নৌপথ এবং রেলপথে যোগাযোগ ভালো হওয়ায় বগুড়া মুক্তিযোদ্ধাদের যেমন অনুকূল হয়েছিল ঠিক তেমনি পাকবাহিনীও সুবিধা ভোগ করেছিল সমভাবে। ফলে বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপকতা লাভ করেছিল—রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা নির্যাতন চালিয়েছিল ব্যাপক—তাদেরকে সাহায্য করেছিল বিহারিরা।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বগুড়া জেলা রাজশাহী বিভাগের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। এ জেলা ২৪°-৩২´ থেকে ২৫°-১৭´ অক্ষাংশ এবং ৮৮°-৫৭´ থেকে ৮৯°-৪৭´ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বগুড়া জেলার বর্তমান আয়তন ২৯১৯৯ বর্গ কি.মি। বগুড়ার উত্তরে জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলা, দক্ষিণে চলন বিল, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা, পূর্বে যমুনা নদী ও জামালপুর জেলা, পশ্চিমে চলন বিলের অংশবিশেষ, নওগাঁ ও নাটোর জেলা অবস্থিত।[১]

বগুড়া নামের উৎস সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পুত্র সুলতান মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন বোগরা খানের নামানুসারে এ অঞ্চলের নামকরণ হয়। তিনি ১২৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশ শাসন করেন তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

জেলা প্রশাসনের দলিল-দস্তাবেজ থেকে বগুড়ার গঠন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে, বর্তমান রাজশাহী জেলার ৪টি থানা (আদমদীঘি, বগুড়া, শেরপুর ও নওখিঁল), দিনাজপুরের ৩টি থানা (লালবাজার, বদলগাছি ও ক্ষেতলাল) এবং রংপুরের ২টি থানাসহ (গোবিন্দগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ) মোট নয়টি থানা নিয়ে ১৮২১ সালে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। পরবর্তীতে জেলার প্রাথমিক কাঠামো থেকে নয়টি থানা বাদ দিয়ে নতুন সাতটি থানা সংযোজিত করে বৃহত্তর বগুড়া জেলা সৃষ্টি হয়। ঐ সময় বগুড়া জেলা দুটি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়, (১) বগুড়া সদর ও (২) জয়পুরহাট। বগুড়া সদর

Dhaka University Institutional Repository

মহকুমা আদমদীঘি, দুপচাঁচিয়া, শিবগঞ্জ, কাহালু, নন্দীগ্রাম, শেরপুর, বগুড়া, গাবতলী, ধুনট, সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা এবং জয়পুরহাট মহকুমা কালাই, পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ও আক্কেলপুর থানা নিয়ে গঠিত। বগুড়াকে পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলায় বিভাজিত করা হয়। বর্তমানে বগুড়ার উপজেলাসমূহ হলো : আদমদীঘি, বগুড়া সদর, ধুনট, দুপচাঁচিয়া, গাবতলী, কাহালু, নন্দীগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, শিবগঞ্জ ও সোনাতলা এবং জয়পুরহাট জেলার উপজেলাসমূহ হলো : আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল এবং পাঁচবিবি। যেহেতু আমাদের গবেষণার সময়কাল ১৯৭১, সেহেতু বগুড়া জেলা বলতে বৃহত্তর বগুড়া জেলাকেই বোঝানো হল।

সাধারণভাবে সমগ্র বগুড়া জেলা একটি সমতল ভূমি। এর ভূমি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ ঢালু এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে দুই অসমান ভাগে বিভক্ত। জেলার দুই পঞ্চমাংশেরও কম ভূমি নিয়ে গঠিত পূর্বভাগের এলাকাটির নাম যমুনা প্লাবন ভূমির নিম্নাঞ্চল। এখানকার ভূমি অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, ঝিল ও জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্ষাকালে এখানকার অধিকাংশ স্থানই ব্রহ্মপুত্র, বাঙ্গালী ও কাটাখালী নদীর জলে প্লাবিত হয় বলে এ অঞ্চলের মাটির উপর পলি সঞ্চিত হয়। এজন্য পলি সমৃদ্ধ উর্বর এই এলাকাকে যমুনার প্লাবন ভূমি বা 'ভরদেশ' বলা হয়। পশ্চিমাংশের ভূখণ্ডটি বরেন্দ্র অঞ্চলের অংশ। এই এলাকা বরেন্দ্র অঞ্চলের মধুপুর ক্লে বা কাদা অঞ্চল নামে পরিচিত। এ অঞ্চল পার্শ্ববর্তী পলি অঞ্চল থেকে উঁচু সমতলভূমি। এর পূর্বদিক সামান্য উঁচু এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক কিঞ্চিৎ ঢালু। বরেন্দ্র অঞ্চলের মধুপুর ক্লের মাটি সাধারণত এঁটেল-দোআঁশ ও এঁটেল। এখানকার মাটি ভারী বলে মাটির অভ্যন্তর অংশে পানি চলাচলের গতি মন্থর। এ অঞ্চলের মাটির রং নানা বর্ণের ছিটাসহ লালচে বর্ণের হয়। স্থানীয়ভাবে এখানকার মাটি 'খিয়ার' নামে পরিচিত। বরেন্দ্র অঞ্চলে সামান্য জঙ্গল পরিদৃষ্ট হলেও অধিকাংশ ভূমিই পরিষ্কার ও আবাদী।

বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বগুড়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষত, মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ এ দেশের সভ্যতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আজও বহন করছে। প্রাচীন যুগ থেকে পাল ও সেন শাসনামল পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে 'পুণ্ড্রবর্ধন' বা হাল-আমলের বগুড়া এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করেছিল। বর্তমানেও এ জেলা ব্যবসা ও শিল্প কেন্দ্র হিসাবে উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দেশের সকল জেলার ন্যায় বগুড়া জেলাতেও একাধিক ছোট বড় নদ-নদী আছে। নদীগুলোর মধ্যে করতোয়া জেলার মধ্যভাগ দিয়ে এবং অন্যান্য নদীগুলি জেলার পূর্ব বা পশ্চিম ভাগের উপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। জেলার পূর্ব ভাগে বাঙ্গালী ও ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা নদী এবং পশ্চিমে যমুনা বা

Dhaka University Institutional Repository

ছোট যমুনা, তুলসী, হারাবতী, নাগর, ইছামতি, খঅরি ও গাংনাই নদী রয়েছে। এছাড়া পশ্চিমাংশে টেকরপাড়া খাড়ি, নুনগোলা খাড়ি, গজারিয়া ইছামতি, রামশালা খাড়ি এবং পূর্বাংশে সুখদহসহ কতগুলি নদী আছে।[২]

বগুড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের ইতিহাসে বগুড়া এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন আমলে এ জেলা পৌণ্ড্র অথবা পুণ্ড্র রাজ্যের অংশ ছিল পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল। বগুড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বর্তমানে মহাস্থান নামে পরিচিত একটি প্রাচীন সুরক্ষিত নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। এই মহাস্থানগড়ই ছিল পৌণ্ড্র দেশের মহাসমৃদ্ধশালী রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন নগর। চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সম্ভবত ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর লিখিত ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখিত আছে যে, বাংলার এ অঞ্চল হর্ষবর্ধনের শাসনাধীনে ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণের সময় থেকে বগুড়া ধারাবাহিক ও প্রামাণিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। সি-যু-কি নামক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি বঙ্গদেশের এ অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে খুবই মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন যে, মহাস্থানগড় বা পুণ্ড্রনগর ছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অভাবে উত্তর বাংলায় রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে শৈল বংশীয় একজন রাজা পুণ্ড্রদেশ অধিকার করেন। এই বিজয়াভিযান বাকপতি রচিত গৌড়বহো গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কনৌজের (কান্যকুব্জের) যশোবর্মা (৭২৫-৭৫২) খ্রিঃ) পরাজিত করে বঙ্গদেশকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এর ফলে, বগুড়া জেলা যশোবর্মার শাসনাধীনে আসে। কিন্তু গৌড়বঙ্গে তাঁর অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য (৭২৪-৭৫০ খ্রিঃ) ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে যশোবর্মাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বঙ্গদেশ অধিকার করেন।[৩]

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল উত্তর-পশ্চিম বাংলায় পাল রাজ্য স্থাপন করেন। বরেন্দ্র ছিল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল। করতোয়া সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বরেন্দ্রকে পূর্ব দিক দিয়ে ঘিরে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হত। পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর মহিষী রান্নাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রিঃ) সিংহাসনে আরোহন করেন। পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ দেবপাল পিতার যোগ্যপুত্র ছিলেন এবং পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে এ জেলা পাল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

সেন বংশীয় রাজা হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০ খ্রিঃ) ছিলেন এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি পাল বংশের শেষ রাজা মদন পালকে পরাজিত করে বগুড়া জেলাসহ উত্তর বাংলার অধিকাংশ ভূ-ভাগ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রিঃ) আনুমানিক ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনামলে বগুড়া জেলাসহ বরেন্দ্রভূমি ছিল তাঁর শাসনাধীনে। অতঃপর লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৬ খ্রিঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। বগুড়াসহ সমগ্র পুণ্ড্রবর্ধন তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২০২ বা ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী সেন রাজ্যের রাজধানী লক্ষণাবর্তী দখল করেন। বগুড়া জেলার অন্তর্গত ভবানীপুরের কয়েক মাইল উত্তরে এবং শেরপুরের কিছু দক্ষিণে কমলাপুর নামক স্থানে পরবর্তী সেন রাজাদের রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে, বল্লাল সেন এ রাজধানী নির্মাণ করেন। গৌড়ের বাহাদুর শাহ (১৩১০-১৩৩০ খ্রিঃ) কর্তৃক সেন বংশের শেষ রাজা অচ্যুত সেন পরাস্ত হন। পরবর্তীকালে বগুড়াসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল দিল্লী সালতানাতের অধীনস্থ হয়।

প্রায় দু'শ বছর বগুড়া জেলা মুঘলদের শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু মুঘল শাসনামলের শেষের দিকে আওরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় নবাব মুর্শিদকুলী খান বাস্তবে স্বাধীন নরপতির মত সুবে-বাংলার প্রশাসন পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীন খান (১৭২৯-১৭৩৯ খ্রিঃ), সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রিঃ), আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিঃ) এবং সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রিঃ) নামমাত্র মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং তাঁকে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করতেন; কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। মুর্শিদকুলী খান খুবই কট্টর রাজস্বনীতির প্রবর্তন করে জমিদারী প্রথার আমূল সংস্কার সাধন করেন। তাঁর অনুসৃত নতুন রাজস্বনীতি অনুসারে বগুড়া জেলাকে তিনজন জমিদারের মধ্যে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলে বগুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ নাটোর রাজের নিয়ন্ত্রণে, উত্তর-পশ্চিমাংশ দিনাজপুর রাজের নিয়ন্ত্রণে এবং মধ্যবর্তী ভূভাগ সিলবর্ষ পরগণার মুসলিম জমিদার পরিবারের নিয়ন্ত্রণে প্রদান করা হয়। কিন্তু এ জেলার অধিকাংশ স্থানই নাটোর রাজ রামজীবনের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান পরলোক গমন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে এ জেলার ইতিহাস স্থানীয় জমিদারদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মুসলমান শাসনামলের শুরু থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বগুড়ার ইতিহাসে শান্তি ও প্রগতির যুগ বলে চিহ্নিত করা চলে।[৫]

সুবে বাংলার ইতিহাসে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণ—লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক সুবে-বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন। পলাশীর যুদ্ধের পর সুবে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে সুবে-বাংলার দেওয়ানী লাভ করে এ জেলার শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ঘটে। সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। বাংলার ফকির সম্প্রদায়ের দলপতি মজনু শাহ মাস্তানা বুরহানার নেতৃত্বে ফকিরেরা কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৭৬৩ থেকে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মজনু শাহের কর্মকেন্দ্র ছিল বগুড়া। তিনি ফকির সম্প্রদায়ের মাদারী মতাবলম্বী বুরহানা গোত্রের একজন নেতা ছিলেন। প্রায় ২৫ বছর (১৭৬৩-১৭৮৭ খ্রিঃ) ধরে তাঁর সংঘাতময় কর্মজীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি উত্তর বাংলার জেলাসমূহে এবং পূর্ব বাংলার ঢাকা ও ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা পরিচালনা করেন।[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বগুড়ায় নাগা সন্ন্যাসীদের লুণ্ঠনমূলক তৎপরতা শুরু হয়। পণ্ডিত শাহের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীদের তৎপরতা ফলে বগুড়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে। বগুড়া ও শেরপুরের সংযোগকারী সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝিরা নামক এক গ্রামে পণ্ডিত শাহ ও তাঁর অনুচরেরা বাস করতেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলের ভবানী পাঠক নামক একজন শীর্ষস্থানীয় সন্ন্যাসী নেতাকে দমনের নিমিত্ত লেফটেন্যান্ট ব্রেনানকে নিয়োগ করা হয়। লেফটেন্যান্ট ব্রেনান উল্লেখ করেছেন যে, দেবী চৌধুরাণী নামক একজন মহিলা সন্ন্যাসী নেতা পাঠকের দলভুক্ত ছিলেন। বেতনভোগী বরকন্দাজের এক বিশাল বাহিনীসহ তিনি নৌকায় বাস করতেন এবং পাঠকের লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ ছাড়াও তিনি নিজেও ডাকাতি করতেন। অবশেষে কোম্পানি এসব ডাকাতিদের সাফল্যজনকভাবে দমন করে জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সমর্থ হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বগুড়ায় প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হওয়ার দরুণ বহুসংখ্যক নীল কারখানা বা কুঠি গড়ে উঠেছিল। জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশের থানাগুলিতে নীল চাষ বৃদ্ধি পায়। মানাস নদীর তীরে ধুনট ছিল নীলের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এখানে আটটি নীলের কারখানা ছিল। অন্যদিকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক প্রজা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রজারা বে-আইনী কর দিতে অস্বীকার করলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। পাবনা জেলার প্রজা বিদ্রোহ বগুড়ার প্রজাদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ফরায়েজী ও তরীকায়ে মুহম্মদীয়া (জিহাদ) নামক দুটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ দুটি সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা এ অঞ্চলের মানুষজন খুবই প্রভাবিত হয়। ধর্মযুদ্ধরূপে এই আন্দোলন শুরু হলেও পরবর্তীকালে তা ইংরেজ শাসন বিরোধী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। বগুড়ার সাধারণ মুসলমানদের কাছে এ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন খুবই প্রিয় হয়ে উঠে এবং এর অনুসারী ছিল কৃষক, তাঁতী, জেলে ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা। ফরায়েজীরা ধর্মীয় অনুশীলনগুলি কড়াকড়িভাবে পালন করতেন। ধর্মীয়বিধি বহির্ভূত যে কোন নিয়মকে তাঁরা বেদাত বলে অভিহিত করতেন। সামাজিক কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির তাঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় নীলকর এবং তাদের সমর্থক হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরায়েজীদের অবিরাম সংগ্রাম জেলায় প্রভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তার বিশ্বস্ত মুরীদ মৌলভী শাহ ইসমাইল ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মহশেরাতে জিহাদ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ব্রিটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এ জেলা থেকে জিহাদের জন্য লোক ও অর্থ সংগৃহীত হয়।[৭]

কোম্পানির রূঢ় ঔপনিবেশিক শাসন লুণ্ঠন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রায় একশত বৎসরের পুঞ্জিভূত অসন্তোষের ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ সিপাহী, রাজন্যবর্গ ও জনগণের একাংশের প্রথম বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া। বগুড়া জেলায় সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত গুজব ছড়িয়ে পড়লে জেলা কর্তৃপক্ষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়। উদ্বেগাকুল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বাহিনী ও ইউরোপীয় নাগরিকের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে এবং কোম্পানির সৃষ্ট জমিদার, জোতদার ও মধ্যবিত্তদের সহযোগিতা লাভ করে।[৮]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রিঃ) পর তুরস্কের সুলতানের (বা মুসলমানের জগতের খলিফা) সাম্রাজ্য বিজয়ী মিত্র শক্তির দ্বারা বিভক্ত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানের মর্যাদা রক্ষাকল্পে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন আলী ভ্রাতৃদ্বয় মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও মৌলানা শওকত আলী। মহাত্মা গান্ধীও খেলাফত আন্দোলনের সমর্থন প্রদান করেছিলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। আলী ভাতৃদ্বয় ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন বগুড়া অঞ্চলেও শুরু হয়েছিল। বর্তমান ধুনট উপজেলার মৌলভী আশরাফ আলী, ডাক্তার শের আলী ও সৈয়দ আব্দুল করিম দাউদি খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এ জেলার অন্যান্য নেতা ছিলেন সুরেশ চন্দ্র দাস ও মতীন্দ্র মোহন রায়।[৯]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব শেষ হওয়ার পর, ডাক্তার সাইফউদ্দিন কিচলুর তানজিম আন্দোলন বগুড়া জেলায় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেন জনাব ইসহাক উদ্দিন। ডাক্তার সাইফউদ্দিন কিচলুও আন্দোলনে জনপ্রিয় করার নিমিত্ত বগুড়া অঞ্চলে আগমন করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার পরবর্তী রাজনৈতিক কার্যকলাপ মুসলিম লীগ আন্দোলনকে কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

করে গড়ে ওঠে। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব হাবীবুল্লাহ বগুড়া সফরে এলে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং এখানকার জনগণ পাকিস্তান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের খ্যাতিমান নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ায় আগমন করে মুসলিম লীগের একটি কমিটি গঠন করেন। বগুড়ায় সিলবর্ষের জমিদার জনাব মুহাম্মদ আলী এ কমিটির সভাপতি হন। পরবর্তীকালে জনাব মুহাম্মদ আলী, ডাঃ হাবিবুর রহমান, মৌলানা মজাহার হোসাইন, ডাঃ কসিরউদ্দিন তালুকদার প্রমুখ লীগ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় স্বাধিকার আন্দোলন বগুড়া জেলায় প্রভাব বিস্তার করে।[১০]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে বগুড়া পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অংশভুক্ত হয়। প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ বগুড়ার ভূমি, মানুষ ও আবহাওয়াজনিত মেজাজের মধ্যেই রাজনীতি সচেতনতা বিদ্যমান। এই অঞ্চলের মানুষ সংগ্রামী, প্রগতিশীল ছিলো। তবে প্রগতিবিমুখতাও কালেভদ্রে লক্ষযোগ্য হয়। ভারতীয় সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় দেশভাগের পর বিপুল সংখ্যক মুসলমান বগুড়ায় বসতি স্থাপন করে।

'৭১ পূর্ববর্তী বগুড়ার রাজনৈতিক অবস্থা

ভাষা আন্দোলন ও বগুড়া

ধর্মকে মূল ভিত্তি করে ভারতবর্ষ বিভাজন ছিল ঐতিহাসিক নিয়মের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। বাঙালি জাতির পরবর্তী সময়ের আন্দোলন ও পদক্ষেপ তা-ই প্রমাণ করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রথম বছরেই ভাষা নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালির অসন্তোষ ও অনাস্থা প্রকাশ পায়। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলিমলীগ পন্থী সদস্যরা এতে দ্বিমত পোষণ করলে এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট এবং ২৯ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস ও ধর্মঘট পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য জেলা বৃহত্তর বগুড়ায় নানাবিধ কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শিকপাল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখন বগুড়া আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাষা আন্দোলনের অনেক জাতীয় নেতাও তখন বগুড়ায় ছিলেন। জাতীয়তাবোধ ও ভাষা প্রশ্নে বাঙালি জাতি যখন বিক্ষুব্ধ তখন এই বিক্ষোভকে সংগঠিত ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে বৃহত্তর বগুড়ায় পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক শাখা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ছাত্র-

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এ সময় সক্রিয় ভূমিকা রাখে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র ফেডারেশন' ও বগুড়া আযিযুল হক কলেজের সচেতন ছাত্র-শিক্ষক সমাজ। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো প্রকার কমিটি বা সাংগঠনিক ভিত্তি ছাড়াই সম্মিলিত তৎপরতায় আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।[১১] এ সময় আযিযুল হক কলেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন (কবি ও অধ্যাপক) আতাউর রহমান। কলেজের বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে আতাউর রহমানের উপর আন্দোলনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ সময় ভাষা সৈনিক গাজীউল হক একই কলেজে আতাউর রহমানের নিচের শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন। তবে ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক প্রগতিশীল কর্মে তারা ছিলেন একাত্ম।[১২] বছরের মাঝামাঝি সময়ের দিকে বগুড়ায় ভাষা আন্দোলন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলে আতাউর রহমান আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৩] এদিকে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র ফেডারেশন-এর উদ্যোগে আযিযুল হক কলেজ থেকে যে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয় সেটি শহরের সাতমাথা মোড়ে পৌঁছলে মুসলিম লীগ নেতা আবদুল হামিদ খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সমর্থকরা মিছিলে হামলা চালায়। এই হামলায় মিছিলে নেতৃত্বদানকারী আবদুল মতিনসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর ভাবে আহত হন। এটি ছিল বগুড়ায় ভাষা আন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রথম আঘাত।[১৪] প্রায় একই সময়ে বামপন্থী রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত আক্কেলপুর ও পাঁচবিবিতে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে যুবলীগ জয়পুরহাট মহকুমায় ব্যাপক গণসংযোগ করে।[১৫] ১৯৪৮ সালে বগুড়ার ভাষা আন্দোলনে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে : ১. আতাউর রহমান (বগুড়া সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক, ১৯৫৪-র নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য), ২. অধ্যাপক গোলাম রসুল, ৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (অধ্যক্ষ, আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া), ৪. মুহাম্মদ আবদুল মতিন, ৫. অধ্যাপক আবুল খায়ের, ৬. অধ্যাপক প্রিথিম দত্ত, ৭. আতাউর রহমান, ৮. গাজীউল হক (পরবর্তী সময়ে ঢাকায় আন্দোলনে সম্পৃক্ত), ৯. গোলাম মহিউদ্দিন (চিকিৎসক, বগুড়া), ১০. জালাল মহিউদ্দিন আকবর, ১১. নাজির হোসেন, ১২. সাত্তার, ১৩. তরিকুল খান, ১৪. হারুন হোসেন মোল্লা, ১৫. ইবনে মিজান, ১৬. শ্যামপ্রদ সেন ও ১৭. ডা. মতিয়ার রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৯ সালে বগুড়ায় ভাষা আন্দোলন পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। বছরের শুরুতেই আযিযুল হক কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের যোগসাজসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, বিড়ি শ্রমিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রচেষ্টা ছিল আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করার দিকে। তারা ভাষা আন্দোলনকে একটি জঙ্গি রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এ সময় পুনরায় সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে মুসলিম লীগ ও অবাঙালিরা হামলা চালালে ছাত্রী নেত্রী সালেহা বেগম ছাত্রনেতা আবদুস শহীদসহ কয়েকজন আহত হয়। মিছিলে

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রী আহত হবার বিষয়টিতে প্রতীয়মান হয় যে, বগুড়ার আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল। এ সময় পাকিস্তানি শাসক দল মুসলিম লীগ বামপন্থী কর্মী ও সমর্থকদের উপর চড়াও হলে বগুড়ায় ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান, সাহিত্যমোদী অঙ্গন থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শহরের আন্দোলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁরা প্রায় প্রতিদিনই উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তন, বাংলা স্কুল, টমসন হল প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার, ভাষা প্রশ্নে বিতর্ক অনুষ্ঠান, গান, কবিতা, নাটকের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরতেন। এ সময় শহরের দত্তবাড়ি, গোহাইল রোড, লতিফপুর কলোনিসহ বেশ কিছু স্থানে মুসলিম লীগ সমর্থক ও বিহারিদের প্রশাসনিক ও ব্যবসা ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেলে আন্দোলন অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়।[১৬] ১৯৫০ সালে দেশব্যাপী ভাষা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় সরকারি বাহিনী ও পাক-শাসকদের অনুগত শক্তির দমননীতি। মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সরিয়ে দিতে সংগঠিত করা হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পুলিশ বাহিনীর তৎপরতায় শুরু হয় গ্রেফতার। বগুড়াতেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। বৃহত্তর বগুড়ায় আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বহু কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। অন্যরা গোয়েন্দা তৎপরতায় আত্মগোপনের জন্য অন্য অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হন।[১৭]

১৯৫১ সালের প্রায় শুরু থেকেই পুনরায় আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে বামপন্থী নেতাকর্মীরা অন্যান্য সংগঠনের ব্যাপারে কার্যক্রম চালাতে থাকে। এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি একটি 'কন্ট্রাক্ট কমিটি' গঠন করে আন্দোলনকে বেগবান করতে। এই 'কন্ট্রাক্ট কমিটি'র সম্পাদক ছিলেন প্রণব চৌধুরী এবং অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন মুহাম্মদ আবদুল মতীন, মোখলেসুর রহমান ও শাহ আহমেদ। এই কমিটির তৎপরতায় বগুড়ায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পথ সুগম হয়। এ সময় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মোখলেসুর রহমান, সুবোধ লাহিড়ী, আক্কেলপুরের ছমির উদ্দিন মণ্ডল, আবদুল খালেক মণ্ডল, হারুনুর রশিদ, গোলাম মহিউদ্দিন, ছাত্রলীগ নেতা নূর হোসেন মোল্লা, আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আবদুল আজিজ কবিরাজ, ভীষণ রত্ন, অ্যাডভোকেট আকবর হোসেন আকন্দ, মোশাররফ হোসেন মণ্ডল, আবদুল ওয়াজেদ খলিফা, আবদুস শহীদ, ফজলার রহমান, হাবিবুর রহমান, বিড়ি শ্রমিক নেতা শাহ আহমেদ, সাদেক আহমেদ, আবদুল খালেক, জালালউদ্দিন আকবর, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, ফজলার রহমান ভেলুপুরী প্রমুখের উপর। এখানে উল্লেখ্য যে, কন্ট্রাক্ট কমিটি আরেকটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল যে, 'নন-কমিউনিস্টদের সামনে রাখা'। বৃহত্তর বগুড়ায় উদ্যোক্তারা এই নীতিতে সফল হন। ফলে এই আন্দোলন একটি 'গুণগত পরিবর্তনমুখী' আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে ধাবিত হয়।[১৮] এদিকে ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে কৃষক আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগে জয়পুরহাটে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ডা. আবদুল কাদের চৌধুরী, গাজীউল হক, মোখলেসুর রহমান, সুবোধ লাহিড়ী, মীর শহীদ মণ্ডল, ছমির উদ্দিন মণ্ডল, ডা. মুছাব্বর আলী খন্দকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। '৫২-র প্রথম দিকেই আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সর্বদলীয় সাংগঠনিক ভিত্তি জরুরি হয়ে পড়ে। এই লক্ষ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে ডাকা হয় এক সমাবেশের। এই দিন বগুড়ার থানা রোডে ছাত্রনেতা আবদুস শহীদের পৈতৃক বাসভবনে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি বৈঠকে বসে। এই বৈঠকে প্রবীণ রাজনীতিবিদ মজির উদ্দিন আহমেদকে সভাপতি ও ছাত্রনেতা গোলাম মহিউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই কমিটির পূর্ণ তালিকা এভাবে সাজানো যায় :

১. সভাপতি : মজিরউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক নিশান পত্রিকার সম্পাদক, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য।

২. সহ-সভাপতি : (ক) আবদুল আজিজ কবিরাজ, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক আন্দোলন নেতা; (খ) ভীষদ রত্ন।

৩. আহ্বায়ক : গোলাম মহিউদ্দিন, ১৯৪৮ সালে আন্দোলনের দায়ে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বহিস্কৃত, বগুড়া শহরে চিকিৎসক।

৪. যুবলীগ প্রতিনিধি : (ক) গোলাম মহিউদ্দিন, (খ) শেখ হারুনুর রশীদ (বর্তমানে অ্যাডভোকেট ও জেলা ন্যাপ নেতা), (গ) জমিরউদ্দিন মণ্ডল (কৃষক নেতা ও ৭১ সালে শহীদ)।

৫. অন্যান্য প্রতিনিধি : (ক) এ. কে. মুজিবুর রহমান (পরবর্তী সময়ে এম.পি.), (খ) সিরাজুল ইসলাম (ন্যাপ-ভাসানীপন্থী নেতা), (গ) আবদুস শহীদ (তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা), (ঘ) নূরুল হোসেন মোল্লা (বর্তমানে বগুড়া উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক), (ঙ) কমরেড সুবোধ লাহিড়ী (মোটর শ্রমিক নেতা, পরবর্তী সময়ে ভারতে বামপন্থী কর্মী), (চ) আবদুর রহিম সওদাগর মতিন, (ছ) শাহ আহমেদ হোসেন (বিড়ি শ্রমিক নেতা), (জ) মোখলেসুর রহমান (রিকশা শ্রমিক নেতা), (ঝ) ফজলুর রহমান (কৃষক নেতা ও ৭১ সালে শহীদ), (ঞ) খোন্দকার রুস্তম আলী কর্ণপুরী (তমদ্দুন মজলিসের সদস্য), (ট) লুৎফর রহমান সরকার (কলেজ ছাত্র, পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কার), (ঠ) কবিরাজ মোফাজ্জল বারী (কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ও ৭১ সালে শহীদ)। এঁদের মধ্যে লুৎফর রহমান সরকারসহ কয়েকজন আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকেন নি।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় একই সময়ে জেলার জয়পুরহাট মহকুমায় আবদুল গফুরকে আহ্বায়ক করে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রইসউদ্দীন (ধলাহার), ডা. আয়েজউদ্দীন, খয়বর আলী মিয়া, ডা. মুছাব্বর আলী খন্দকার প্রমুখ। এই সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনকে বেগবান করতে পারে নি। কারণ মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা আব্বাস আলী খান ও আবদুল আলীমের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় আন্দোলন প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়। তবে আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম পাঁচবিবি ও আক্কেলপুরে পালিত হয়। পাঁচবিবিতে নাসিরউদ্দীন ও কবি আতাউর রহমান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সেখানে একটি সংগ্রাম পরিষদও গঠিত হয়। এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন পাঁচবিবি লালবিহারী হাই স্কুলের কয়েকজন প্রগতিশীল চিন্তাধারার শিক্ষক। এঁদের মধ্যে আতাউর রহমান ছাড়া প্রধান শিক্ষক বিনোদ লাল নন্দী, বয়েজ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় জনতার মধ্যে শুকুর আলী মণ্ডল, ডা. মেহের আলী, গোপাল চন্দ্র সাহা, অরবিন্দ কুণ্ডু, রকিব মাস্টার, মনিরউদ্দিন, মনসুর আলী ফকিরের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দশম শ্রেণীর ছাত্র মীর শহীদ মন্ডল, আবু খালেদ, আমানউল্লাহ, আমিনুর রহমান টুকু এবং কলেজ ছাত্রদের মধ্যে আবদুস সাত্তার দেওয়ান, আবদুল লতিফ, ফরমান আলী, রফিকউদ্দিন, তফিজউদ্দিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসব কর্মকাণ্ডে নেপথ্য প্রেরণাদাতা ছিলেন বামপন্থী নেতা ডা. আবদুল কাদের চৌধুরী। তেমনিভাবে আক্কেলপুরে কবি আতাউর রহমান, মনতাহার রহমান, ডা. আজিজার রহমান, শিশির মোহন্ত, অমলেন্দু মোহন্ত, কাজী আবদুল বারী, আবদুল জলিল, মোহাম্মদ আলী লস্কর, ওঙ্কারমল আগরওয়ালা, নবীরউদ্দিন, কাজী গোলাম রাব্বানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২০]

১৯৫২ সালে বগুড়ায় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর থেকেই বগুড়া শহর হয়ে উঠে মিছিলের শহর। ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি জেলা স্কুল মাঠে আবদুল আজিজ কবিরাজের সভাপতিত্বে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনকে বেগবান ও সংঘবদ্ধ করতে প্রত্যেক থানায় ভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনের আহ্বান এই সমাবেশে জানানো হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সংগঠিত ঘটনার খবর ঐদিনই বগুড়ায় পৌছায়। যে ক'জন আন্দোলনকারীর শহীদ হবার খবর ছড়িয়ে পড়ে, তাঁদের মধ্যে বগুড়ার সন্তান গাজীউল হকের নামও শোনা যায়। এতে বগুড়াবাসী দলমত নির্বিশেষে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।[২১] পরদিন ঢাকায় মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে বগুড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হয়।[২২] কিন্তু জয়পুরহাট মহকুমার পাঁচবিবি থানায় ঢাকার মিছিলে হত্যাকাণ্ডের খবর পৌছায় পরদিন দৈনিক আজাদ পত্রিকা মারফত। এদিকে আক্কেলপুরে এই খবর ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে পৌছালে ২২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আক্কেলপুরে আন্দোলনের প্রাণপুরুষ কবি আতাউর রহমান আদমদীঘি (বগুড়া) ও বদলগাছি

Dhaka University Institutional Repository

(নওগাঁ) থানায়ও ব্যাপক গণসংযোগ ও জনগণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। সদর থানায় ২৩ ফেব্রুয়ারি গোলাম মওলা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সরকারি ডাক্তারখানা মাঠে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ওয়াজেদ আলী খন্দকার, মোবারক সরদার, শাহাজাহান চৌধুরী, আবদুল লতিফ, আবদুল গফুর, ডা. ভবানীচরণ কুণ্ডু, ডা, মুছাব্বর আলী, শৈলেশ কুমার ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ২৩ ফেব্রুয়ারি তরিকুল আলম খানের সভাপতিত্বে বগুড়ার জগন্নাথ মাঠে এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয় এবং পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে এদিনের হরতালের সমর্থনে অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন বন্ধ থাকে। ঐদিন শেরপুর থানায় প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পাঁচবিবি স্কুলের মাঠে ২৪ ফেব্রুয়ারি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্র হত্যার নিন্দা, ক্ষোভ প্রকাশ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করায় আজাদ-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে অভিনন্দন জানানো হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি পাঁচবিবিতে এক বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঁচবিবি লালবিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিনোদলাল নন্দী। ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি শান্তাহারে হরতাল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজা রামপুরে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়।[২৩] এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ ফেব্রুয়ারি বগুড়া স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ ও সভার আয়োজন করে।[২৪] এক কথায় বলা যায়, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি এবং ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমগ্র বগুড়া জেলা আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দেশের অন্যান্য স্থানের ভাষা আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে হাসান আজিজুল হক 'বাহান্নর একুশ : ঢাকার বাইরে' প্রবন্ধে বগুড়ার তিলকপুর ও পাঁচবিবির কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে ২৯ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক গোলাম মহিউদ্দিন ও শেখ হারুনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। একইসঙ্গে শেরপুরের সুবোধ লাহিড়ী, বগুড়ার নূরুল হোসেন মোল্লা, আব্দুল মতীন, আক্কেলপুরের ছমির মণ্ডলকে গ্রেফতার করে রাজবন্দিদের ওয়ার্ডে বন্দিরূপে রাখা হয়।[২৫] এভাবে বগুড়ার ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, পেশাজীবী শ্রেণীর মানুষ। বগুড়ার ভাষা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ও জাতীয় ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও বাঙালির প্রথম বিজয়

ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যকার বিষয়ে মুসলিম লীগ সরকারের বৈষম্যমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-বাংলার জনগণ বিশেষ করে ছাত্রদের চাপে নেতৃবৃন্দ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রধান সাংগঠনিক রূপকার। এ.কে ফজলুল হক ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রধান ব্যক্তিত্ব। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এই দুই ব্যক্তিত্বের মাঝে উভয়কূল রক্ষক। আর যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা প্রণয়নের মূল প্রবক্তা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় যুক্তফ্রন্ট গঠনের সঙ্গে জেলা শহর বগুড়াতেও যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। যুক্তফ্রন্ট বগুড়া শাখা বগুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমিতির মাধ্যমে প্রচারাভিযান শুরু করে। এ সময় বগুড়া সফর করেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, জাকোরীর পীর হাসিমুদ্দিন, আনোয়ারা বেগম এম, এল, এ প্রমুখ নেতৃবর্গ।[২৬]

১৯৫৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্টের সেক্রেটারি কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও আতাউর রহমান খান যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা ঘোষণা করেন। '৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বগুড়ায় কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয় যথাক্রমে বজলুর রহমানকে সভাপতি ও খোন্দকার মোফাজ্জল বারীকে সম্পাদক করে।[২৭] ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বগুড়ায় সকল পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক কর্মতৎপরতা ও নির্বাচনী তোড়জোড় পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে দৈনিক আজাদ পত্রিকার রিপোর্ট ছিল এরকম :

> নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনাইয়া আসিতেছে বিভিন্ন দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তাহাদের সমর্থকদের মধ্যে ততই কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই জেলার ৮টি মুসলমান আসনের জন্য ২৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। সমস্ত আসনে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী মনোনীত করিয়াছে। ২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন সাংবাদিকও রহিয়াছেন।[২৮]

এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জেলার সর্বত্র প্রচারণার উদ্দেশে সর্বদলীয় ছাত্র কর্মী-শিবির গঠন করে। অপর দিকে মুসলিম লীগের প্রচারণার দায়িত্বে ছিল সবুজকোর্তা নামে এক ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া প্রবণতাকে কাজে লাগানোর জন্য নেতা-কর্মীরা তাদের গণ-সংযোগ বাড়িয়ে দেন। দেশব্যাপী শুরু হয় গণ-সংযোগ পরিলক্ষিত হয় গণ-জোয়ার। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দলীয় কার্যক্রমে অংশ নেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এই নির্বাচনী কাজের অংশ হিসেবে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বগুড়ার সুদূর পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন জনসভায় প্রচার কার্যের অংশ হিসেবে বক্তৃতা করেন। বগুড়া শহর এবং শহর-সংলগ্ন একাধিক জনসভাসহ প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দের আগমন ও বক্তৃতা প্রদানের প্রভাব পড়েছিল নির্বাচনে। একথা সর্বজন স্বীকৃত, বিজয়ের পথে এ ধরনের কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়েছিল। মওলানা ভাসানী মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব খুব যৌক্তিকতার সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্কতার সম্মিলন ছিল ভাসানীর রাজনীতির মূল দর্শন। মুসলমান জনগণকে আলোড়িত করার মানসে এবং নিজের ধর্মীয় রাজনৈতিক বেশ অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্তে বগুড়ার শহর সংলগ্ন এলাকায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এরই অংশ হিসেবে মওলানা ভাসানী ডোমন পুকুর মাদ্রাসার মাঠে বক্তব্য প্রদান করেন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব এ.কে মুজিবুর রহমান এবং মাহবুবুর রহমান চৌধুরী পুটু মিয়া।[২৯]

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল গণসঙ্গীত। গণসঙ্গীতের মধ্যে শ্রেণী চেতনার এবং শ্রেণী সংগ্রামের কথা ছিল। সংগ্রামশীল মানুষের শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার কথা সাধারণ মানুষের মনে আবেগের ঝড় তুলতো—সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সমস্যার কথা, অর্থনৈতিক সমস্যার কথা গণসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হতো। যার ফলে যুক্তফ্রন্ট সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিল খুব সহজেই। এজন্য অত্র অঞ্চলে যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে বিজয়ী হয়।[৩০] মুসলিম লীগ সরকার যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের নানাভাবে হয়রানি করে। শুরু হয় জেল-জুলুম-নির্যাতন। দেশব্যাপী চলে এই কর্মকাণ্ড। বগুড়ায় ১৯ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে যুক্তফ্রন্টের ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তেঘরিয়া হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসার ১০ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি মাসুদার রহমান ওরফে বাচ্চু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়।[৩১]

একদিকে নির্যাতন, অন্যদিকে বিজয়ের জন্য মুসলিম লীগ বগুড়ায় ব্যাপক প্রচার কার্য চালায়। এ-সকল প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করেন—পাকিস্তান গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট জনাব তামজুদ্দিন খান, পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুস সবুর। এছাড়াও বগুড়ার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ—ডা. হাবিবুর রহমান, ডা. কোরবান আলী, জনাব ফজলুল বারী, জনাব হাসানুজ্জামান, জনাব শামসুল হক, জনাব সাহেদ আলী, জনাব নূরুল মোমেন, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। এই সকল নেতৃবৃন্দ একযোগে বগুড়ার বিভিন্ন আসনে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করেন।[৩২] এছাড়াও মুসলিম লীগের এক কর্মী সভায় বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের ট্রেজারার জনাব সিরাজুল হক বলেন : 'একমাত্র মুসলিম লীগই জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।'[৩৩] মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতি তাদের পরাজয় ঠেকাতে পারে নি। পরিশেষে ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। সম্প্রদায় ভিত্তিক 'পৃথক নির্বাচন' পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন। মুসলিম আসন ছিল ২৩৭ টি এবং অমুসলিম আসন ৭২টি। যুক্তফ্রন্ট মোট ভোট পায় ৯৭ শতাংশের বেশি।[৩৪] বগুড়ায় মোট ৮টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনেই যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১

বগুড়ার নির্বাচনী ফলাফল, ১৯৫৪

জাতীয় আসন : ২৩ ; নির্বাচনী এলাকা : বগুড়া উত্তর-পশ্চিম; মোট ভোট ৭৩২৭৩, প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার = ৩৮.২১

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মজিরউদ্দিন আহমেদ	যুক্তফ্রন্ট		১৯,০০০	৯৫.৯৬
০২.	মুখলেসুর রহমান চৌধুরী	মুসলিম লীগ		৮০০	৪.০৪
				= ১৯,৮০০	

জাতীয় আসন : ২৪ ; নির্বাচনী এলাকা : বগুড়া পশ্চিম

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মৌলভী জসিরউদ্দীন আহমেদ	যুক্তফ্রন্ট		১৯,০০০	৬৭.৮৬
০২.	মৌলভী মজিবর রহমান মন্ডল	মুসলিম লীগ		৯,০০০	৩২.১৪
				= ২৮,০০০	

জাতীয় আসন : ২৫ ; নির্বাচনী এলাকা : বগুড়া উত্তর

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	
০১.	মফিজউদ্দীন আহমেদ (নির্বাচিত)	যুক্তফ্রন্ট	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

জাতীয় আসন : ২৬ ; নির্বাচনী এলাকা : বগুড়া উত্তর পূর্ব

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	
০১.	সৈয়দ আহমেদ	যুক্তফ্রন্ট	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

জাতীয় আসন : ২৭ ; নির্বাচনী এলাকা : বগুড়া দক্ষিণ-পশ্চিম

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	
০১.	আকবর আলী খান চৌধুরী	যুক্তফ্রন্ট	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

জাতীয় আসন : ২৮ ; নির্বাচনী এলাকা : কেন্দ্রীয় বগুড়া

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (পুটু মিয়া)	যুক্তফ্রন্ট		২৫,৭৪৩	৭৬.৮৫
০২.	শেখ হাবিবুর রহমান	মুসলিম লীগ		৭,৭২৮	২৩.০৭
০৩.	ফয়েজউদ্দীন আহমেদ	স্বতন্ত্র		২৮	০.০৮
				=৩৩,৪৯৯	

জাতীয় আসন : ২৯ ; নির্বাচনী এলাকা : বগুড়া পূর্ব

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	
০১.	দেওয়ান মহিউদ্দীন	যুক্তফ্রন্ট	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

জাতীয় আসন : ৩০ ; নির্বাচনী এলাকা : বগুড়া দক্ষিণ-পূর্ব

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	
০১.	তসিমউদ্দীন তালুকদার	যুক্তফ্রন্ট	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

[সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ]

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে জয়লাভের পর এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় ১ এপ্রিল। কিন্তু এর দু'মাস পর নানাবিধ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে এবং সারা দেশ জুড়ে ধরপাকড় শুরু করে। বগুড়ায় যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তারা হলেন—ড. এনামুল হক, নূরুল হোসেন মোল্লা প্রমুখ। নির্বাচনের পরে যুক্তফ্রন্টের যে-সকল কর্মীকে নির্বাচন পূর্ব সময়ে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মুক্তি দাবী করা হয়।[৩৫] এই দাবি গণ-দাবিতে পরিণত হয়। গণদাবিকে পাকিস্তানী সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। অবশ্য উপেক্ষা না-করার যথেষ্ট কারণ ছিলো—স্বাধিকার আদায়ের প্রশ্নে সচেতন বাঙালি অন্তত সেই সময়ে একই পতাকাতলে নিজেদেরকে স্থিত করতে পেরেছিল। ক্ষুদ্রস্বার্থ, ব্যক্তিগত লাভালাভের চেয়ে দেশ-জাতির কল্যাণই তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে বগুড়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন—জনাব মোশাররফ হোসেন মণ্ডল, বগুড়া সর্বদলীয় কর্মী শিবিরের সেক্রেটারি জনাব ফজলুর রহমান, জেলা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জনাব আমিরুদ্দীনসহ ১৩ জন।[৩৬] ২৭ মার্চ বগুড়ায় যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে 'শোকরিয়া' দিবস উদযাপিত হয়। নব নির্বাচিত সদস্যগণ এক বিরাট শোভাযাত্রাসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে সমাবেশ করেন।[৩৭] এই সভায় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দেশ-জাতির কল্যাণে কাজ করার জন্য শক্তি ও সাহস কামনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২১শে এপ্রিল মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বগুড়া সফর করে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ওয়াদা পালন করার আশ্বাস দেন।[৩৮] ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল ৫২'র ভাষা আন্দোলনের চেতনার একটি বিরাট জয়গান এবং সাফল্য। ৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের পেছনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক দক্ষতা, কর্মপরিকল্পনা এবং সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা সমানভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীকালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে—এ-কথা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়।

৬২'র শিক্ষা আন্দোলন

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় যে-সকল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ১৯৬২ সালের শিক্ষা-আন্দোলন ছিল তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর দমন-পীড়নের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্ররা এই রাজনৈতিক শূন্যতাকে পূরণ করার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ১৯৬২'র এই ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ লাগে বগুড়াতেও। ঢাকায় ছাত্রদের উপর নির্যাতন এবং ছাত্রদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বগুড়ায় কলেজের ছাত্ররা এর প্রতিবাদ জানায়। বগুড়া সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

আযিযুল হক কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রবৃন্দ এক বিবৃতিতে ছাত্রসহ সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানায়। তারা ছাত্রদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত ছাত্র দুইজনের উপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জোর দাবি জানায়। বিবৃতিতে জোরালোভাবে বাক্ স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।[৩৯]

৬২'র আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে এসে ছাত্ররা শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু করে। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্ররা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।[৪০] এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভাষা-প্রীতিসহ দেশের প্রতি কমিটমেন্ট প্রকাশিত হয়। প্রথমে এই আন্দোলন শুরু করে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা। তারপরে পর্যায়ক্রমে এই আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত মূলত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৭ সেপ্টেম্বর সারা প্রদেশব্যাপী হরতাল কর্মসূচি দেওয়া হয়। এই কর্মসূচি চলাকালে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত হয়।[৪১] বগুড়াতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এ প্রসঙ্গে পত্রিকার সংবাদ এ-রকম : 'বগুড়াতেও এদিন হরতাল পালন করা হয়। ছাত্রগণ শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে এবং তাদের দাবি দাওয়ার সমর্থনে বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকে।'[৪২] ছাত্রনেতা ছাদেক আলী আহম্মদকে আহ্বায়ক করে বগুড়ায় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল করার জন্য সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন রহিম চৌধুরী। আমান উল্লাহ খান, জওহর মল্লিক, মোস্তাফিজার রহমান (পটল) প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। এদের নেতৃত্বেই বগুড়ায় দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।[৪৩]

১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে N.D.F (National Democratic frount) গঠন করলে বগুড়াতেও N.D.F-এর শাখা সংগঠন খোলা হয়। এই N.D.F-এর ব্যানারে বগুড়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল এবং জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা সমাবেশ করে। পূর্বদেশ পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায় :

> বগুড়া ৩০শে সেপ্টেম্বর। সম্প্রতি জনাব আকবর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফ্রন্টের এক সভায় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবি করে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। ন্যাপের প্রাক্তন সেক্রেটারী জনাব মোশাররফ হোসেন মণ্ডল, সাবেক আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এ.কে মুজিবুর রহমান, ভূতপূর্ব পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব বি.এম ইলিয়াস, এডভোকেট জনাব

Dhaka University Institutional Repository

মাজহারুল ইসলাম, কবি আব্দুল আজিজ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বর্তমান সরকারের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের এবং পুলিশী জুলুমের তীব্র সমালোচনা করে উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।[৪৪]

১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। দেশব্যাপী আন্দোলনের নেপথ্যে ছিলেন শিক্ষিত জনগণ। ছাত্রদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে বগুড়ায় গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন—আমান উল্লাহ খান, রহিম চৌধুরী, মোস্তাফিজার রহমান (পটল), সাদেক আলী আহম্মদ, সেলিম প্রমুখ।[৪৫]

ছয় দফা আন্দোলন

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্লাটফরম থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের পটভূমিতে তাঁর ঐ ঘোষণা ছিল বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ দাবি। শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি—এসব ক্ষেত্রে বঞ্চনার সমন্বিত ফসল হিসেবে জন্ম নেয় ৬৬-র ছয়দফা আন্দোলন। ছয় দফার ভিত্তিতে সাত কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শেখ মুজিব দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটে বেড়ান। ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামানসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বগুড়া সফরে আসেন এবং স্থানীয় এডওয়ার্ড পার্কে এক বিশাল জনসভায় ছয় দফার উপর ভাষণ দেন। শেখ মুজিব মঞ্চে বক্তৃতা করতে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, 'শোষণের যাঁতাকল থেকে দেশকে মুক্ত করাই আওয়ামী লীগের নীতি। ৬ দফা কর্মসূচী একাধারে পাকিস্তানের মুক্তির সনদ।' তিনি ৬ দফা দাবিকে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত আখ্যা দিয়ে বলেন যে, 'পাকিস্তানকে প্রকৃত শক্তিশালী করে তোলাই ছয় দফা দাবির আসল উদ্দেশ্য।'[৪৬]

আওয়ামী লীগ নেতা জনাব বি.এম ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন—জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আব্দুল মোমেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে.এম ওবায়দুর রহমান প্রমুখ।

৮ মে শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমেদকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা প্রদেশে ১৩ মে আওয়ামী লীগের ডাকে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। বগুড়াতে প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে এডওয়ার্ড পার্কে আয়োজিত সভায় অবিলম্বে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তিদাবি, জরুরি আইন প্রত্যাহার, টেণ্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল এবং প্রদেশব্যাপী পূর্ণ রেশনিং চালু করার দাবি জানানো হয়। বি.এম ইলিয়াসের সভাপতিত্বে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত এই সভায় আরো বক্তৃতা করেন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হাবিবুর রহমান ও জনাব হাফিজুদ্দীন প্রমুখ।[৪৭] ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সারা প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগের ডাকে হরতাল পালন করা হয়। বগুড়াতেও এদিন হরতাল পালন করা হয়। ১৬ জুন বগুড়াস্থ ইত্তেফাক প্রতিনিধি জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (পটল) কে নিরাপত্তা আইনের অজুহাত দেখিয়ে গ্রেফতার করা হয়।[৪৮]

'৬৯-এর গণআন্দোলন

'৫২-র ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির ক্রম-অগ্রসরমান জীবনে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফার সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের ৮ দফার সমর্থনে যে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে সেই আন্দোলনে বগুড়ার ছাত্র-জনতা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। ছাত্ররা এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হলেও তৎকালীন 'ডাক' বা 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই সময়ে বগুড়ায় ১১ দফার ছাত্র-আন্দোলন এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব যারা দিয়েছিলেন এবং আন্দোলনের গতিকে বেগবান করেছিলেন তাদের মধ্যে ছাত্রলীগের আব্দুস সামাদ, খাদেমুল ইসলাম, মকবুল হোসেন, আফতাব, নজরুল, রেহানা, মুন্নী, আকরাম হোসেন খান এবং ছাত্র ইউনিয়নের রফিকুল ইসলাম লাল, হায়দার আলী, বাদশা, হেলাল, স্বপন, বদিউল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪৯] বগুড়া গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন— কবিরাজ শেখ আব্দুল আজিজ, আমানউল্লাহ খান, মোস্তাফিজার রহমান (পটল) গাজীউল হক, হাসেন আলী খান জায়েদী, হাসেন আলী সরকার, সিরাজুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান খান, ডা. জাহেদুর রহমান, মোশারফ হোসেন মণ্ডল, এ.কে মুজিবুর রহমান, হারুনুর রশীদ, সাদেক আলী আহম্মদ, মোজাম্মেল হোসেন খান, হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ, মোখলেছুর রহমান এবং মীর ইকবাল হোসেন প্রমুখ নেতা ও কর্মীগণ। সেই সময়ে পশ্চিম বগুড়ার মহকুমা শহর জয়পুরহাটেও পাকিস্তান সরকার বিরোধী আন্দোলন প্রবলভাবে দানা বাঁধতে থাকে।[৫০] আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। সাধারণ জনগণ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য-বিবৃতি থেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এই সময়ে বগুড়া এলাকায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরী, মীর শহীদ মণ্ডল ও আবু নাসের খান ভাসানী।[৫১] মূল রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ছাত্র সংগঠন। দেখা যায় যে, সেই উত্তাল সময়ে ছাত্র-সংগঠন সমূহ স্ব-স্ব প্যারেন্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত রীতিমতো।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হবার ঘটনায় বগুড়ায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়।[৫৩] হরতালে অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ ধীরে ধীরে জঙ্গিরূপ ধারণ করে। মিছিলে সাধারণ মানুষের সংযোগ বাড়তে থাকে। গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মিছিলটি সর্বজনীন অধিকার আদায়ের প্রতীকে পরিণত হয়। এ দিন বগুড়ায় প্রায় ১০ হাজার মানুষের সমন্বয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলকারীরা কালো পতাকা বহন করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এবং সংগ্রামী শ্লোগানে বগুড়ার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে—মানুষের মনে সংগ্রামের জোয়ার বইয়ে দেয়।[৫৪] বগুড়া শহরের আন্দোলন-সংগ্রামে থানা সদরগুলোও আলোড়িত হয়ে ওঠে। এই সংগ্রামী চেতনায় যুক্ত হয় ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এবং গ্রামের কর্মী-সমর্থক-সাধারণ জনগণ। পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ৩ ব্যক্তির নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর আক্কেলপুরে প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ এক সর্বদলীয় মশাল মিছিল বের হয়।[৫৫] এরই ধারাবাহিকতায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আহ্বানে ৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সপ্তাহ, জেলার গ্রামে গ্রামে শোভা যাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মসূচি পালন করা হয়।[৫৬] নেতা-কর্মীদের প্রেরণায় এবং সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষায় ১৭ জানুয়ারি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে দাবি দিবস উপলক্ষে বগুড়া শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদ নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বগুড়া শহরে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় বলা হয় :

> এই দিন শহরের হাট-বাজার, দোকান-পাট এবং যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। সকাল ৯টায় ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে এবং [...] সাত মাথায় জমা হয়। পরে সেখান থেকে এক বিরাট মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সকাল ১১টায় আইনজীবীদের একটি মিছিল বার লাইব্রেরিতে থেকে বের হয়। তারা শোকের প্রতীক হিসাবে কালো পতাকা বহন করে। [...] স্থানীয় আলতাফুন্নেসা ময়দানে ডাক ও ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ন্যাপের সম্পাদক জনাব মোশাররফ হোসেন মণ্ডল সভায় সভাপতিত্ব করেন।[৫৭]

গণ-আন্দোলনের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ প্রতিটি স্থানে। ১৩ ফেব্রুয়ারি সোনাতলা উপজেলার গোপালতলার ছাত্রদের নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত রাজনৈতিক জোট (ডাক)-এর উদ্যোগে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। বগুড়ায় এই হরতাল পালন সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার খবর ছিল এরকম :

Dhaka University Institutional Repository

১৪ ফেব্রুয়ারি বগুড়া শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হইয়াছে। ব্যাংকসহ দোকানপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকে। রাস্তায় কোনো প্রকার যানবাহন চলাচল করে নাই। সরকারি আধাসরকারি অফিস বন্ধ থাকে। বগুড়া রেল স্টেশনে আজ কোনো ট্রেন আসে নাই। কালো পতাকাসহ বিরাট মিছিল শহরের সকল সড়ক পরিভ্রমণ করে। মিছিলে সরকার বিরোধী শ্লোগান দেয়া হয়।

আলতাফুন্নেসা ময়দানে জনাব আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি পূর্ণ ভোটাধিকার, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল ও ১১ দফা দাবি পূরণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।[৫৮]

১৯৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দাবি দিবস পালন উপলক্ষে আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে আনুমানিক ৪০ হাজার জনগণের সমাবেশ হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডক্টর সামছুজ্জোহা মিলিটারি-পুলিশ কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার সংবাদ বগুড়ায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বেগে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা পৃথক পৃথকভাবে নীরব ভূমিকায় অশ্রুসিক্ত নয়নে নগ্নপদে শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করলে জনবিক্ষোভ আরও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[৫৯] এ দিন ছাত্র জনতা মিছিল শেষে আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে এসে সমাবেশ করে। স্থানীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি রফিকুল ইসলাম লাল এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় রাজশাহীতে গুলিবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৬০] বেলা ১১ টায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও শ্রমিক ইউনিয়ন একত্রে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। জামিল এ্যান্ড কোম্পানির কারখানা ও বসতবাড়ি অটো মোবাইল কারখানা এবং কতিপয় মুসলিম লীগ নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।[৬১] এর পরদিন দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রধান শিরোনাম ছিল :

> বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক থানা আক্রমণ কনভেনশন লীগ অফিস ভস্মীভূত, বগুড়ায় সান্ধ্য আইন জারী ই.পি.আর মোতায়েন। ঢাকা ৪ঠা মার্চ। আজ সকালে বগুড়া শহরে মারাত্মক গোলযোগের পর বগুড়া পৌর এলাকায় দুপুর ১২টা হইতে ১৮ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে কালিয়া এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে। বগুড়ায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য ই.পি.আর তলব করা হইয়াছে। [...] ক্রুদ্ধ জনতা কোতওয়ালী থানা আক্রমণ করে। থানায় হামলা চালানোর ফলে দুইজন পুলিশ অফিসারসহ আটজন পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। শান্তাহারেও এদিন পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

১৮ মার্চ (১৯৬৯) বগুড়া গণতান্ত্রিক ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে বগুড়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ সরকারের শোষণ ও দমননীতির প্রতিবাদে ডাক এবং নিজেদের দাবির ভিত্তিতে এক বিরাট মিছিলসহ শহর প্রদক্ষিণ করে এসে আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে ছাত্র সভা করে।[৬৩] ২৫ মার্চ সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা হলে বগুড়ায় ব্যাপক ধর-পাকড় আরম্ভ হয়। এ সময় গ্রেফতার হন ন্যাপ নেতা এ্যাডভোকেট গাজীউল হক, মোশারফ হোসেন মণ্ডল, মীর ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আরও গ্রেফতার হন সুবোধ লাহিড়ী, দূর্গাদাস মুখার্জী, জওহর মল্লিক, আব্দুল লতিফ, মোখলেছুর রহমান, আব্দুল খালেক (আক্কেলপুর), আব্দুর রাজ্জাক, আকরাম হোসেন খান প্রমুখ।[৬৪] সংগ্রামী ছাত্র-নেতৃবৃন্দের মধ্যে মমতাজ উদ্দীন, সুখদেব ঘোষ, মৃদুল কিশোর ধর, মোফাজ্জল হোসেন, হায়দার আলী, রফিকুল ইসলাম লাল, স্বপন গুহ রায়, কামরুল হুদা টুটুকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রলীগের আব্দুস সামাদ, খাদেমুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলাম গ্রেফতার হন। ছাত্র ইউনিয়নের মনোজ দাশগুপ্ত, আব্দুর রাজ্জাক, দিলীপ বক্সী, ফজলুল হক, ফিরোজ আহম্মদ, মাহমুদুল আমীন, দৌলতজামান, আক্তার হোসেনসহ আরো বহু ছাত্রের উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়।[৬৫]

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০-এর নির্বাচনে বগুড়া জেলার জাতীয় পরিষদে ৫টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৯টি আসন ছিল। জাতীয় পরিষদে বগুড়া ১ আসন ছিল জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, ক্ষেত্রলাল এলাকা নিয়ে। আরেকটি আসন ছিল আদমদীঘি দুপচাঁচিয়া এলাকা নিয়ে। সে-সময় জনসংখ্যা অনুপাতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আসন নির্ণীত হয়। যে-সকল দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে—আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর গ্রুপ), কনভেনশন মুসলিম লীগ (ফজলুল কাদের ও কাইয়ুম গ্রুপ), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, পি.ডি.পি, এম.পি.এল, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের দাবি জানিয়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করতে থাকলেন। এর ফলে সারা দেশের মত নির্বাচনে বগুড়াতেও আওয়ামী লীগের পক্ষে গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়। ট্রেনযোগে বঙ্গবন্ধু যখন নির্বাচনী সফর করছিলেন জয়পুরহাট রেলওয়ে স্টেশন প্লাটফরম থেকে সমগ্র জয়পুরহাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল।[৬৬] নির্বাচনে আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের ৫টি আসনের মধ্যে ৫টিতেই এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৯টি আসনের মধ্যে ৮টি আসন লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২

জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল

জাতীয় আসন : ১৯; বগুড়া-১; মোট ভোট ১,৮৫,৬৫১ ; প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার = ৪৯.৩৯

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	ড. মফিজ আলী চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৬১,৭৫৯	৬৭.৩৫
০২.	আব্বাস আলী খান	জামায়াত	দাঁড়িপাল্লা	২৫,৭৯১	২৮.১৩
০৩.	আব্দুল আলীম	মুসলিম লীগ	হারিকেন	৪,১৪৩	৪.৫২
				= ৯১,৬৯৩	

জাতীয় আসন : ২০; বগুড়া-২; মোট ভোট ২,৯১,২১৩ ; প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার = ৬৯.২৪

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	একে মজিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	১,৫৫,০০৮	৭৬.৮৭
০২.	তসির উদ্দিন সরকার	জামায়াত	দাঁড়িপাল্লা	৩৬,৮৭২	১৮.২৯
০৩.	আব্দুল মজিদ তালুকদার	মুসলিম লীগ	হারিকেন	৯,৭৬২	৪.৮৪
				= ২,০১,৬৪২	

জাতীয় আসন : ২১; বগুড়া-৩; মোট ভোট ১,৮৮,৭৪৮ ; প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	আকব্বর আলী খান চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	নৌকা		
০২.	ইমান আলী	জামাত	দাঁড়িপাল্লা		
০৩.	রইনুদ্দিন মিয়া	মুসলিম লীগ	হারিকেন		

জাতীয় আসন : ২২; বগুড়া-৪; মোট ভোট ২,০৯,৫০২ ; প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার = ৫০.৪৮

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মোঃ হাবিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৯২,৩৬৭	৮৭.৩৪
০২.	আব্দুল মোতালেব	পিডিপি		৯,৫১৩	৯.০০
০৩.	আব্দুল হামিদ কর	মুসলিম লীগ	হারিকেন	৩,৮৭৮	৩.৬৭
				= ১,০৫,৭৫৮	

জাতীয় আসন : ২৩; বগুড়া-৫; মোট ভোট ২,১৯,২১৮ ; প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার = ৪৫.১৪

ক্র.নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মোঃ জাহিদুর রহমান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৫৫,৮০৩	৫৬.৩৯
০২.	মজিবুল্লা	জামায়াত	দাঁড়িপাল্লা	৩৮,৯৪৩	৩৯.৩৫
০৩.	এ টি সাদি	ডা. সংঘ		৪,২১২	৪.২৬
				= ৯৮,৯৫৮	

[ব্যক্তিগত সংগ্রহ : আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, সাবেক সংসদ সদস্য, কার্যনির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক পরিষদ-এর নির্বাচনের ছক আকারে ফলাফল

জাতীয় আসন : ৩৩; বগুড়া-১

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	সাইদুর রহমান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	২২,৯৫৪	৬২.৯৬
০২.	মীর শহীদ মন্ডল	ন্যাপ (ওয়ালি)	ফুঁড়েঘর	১৩,৫০৬	৩৭.০৪
				= ৩৬,৪৬০	

জাতীয় আসন : ৩৪; বগুড়া-২

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	কসিম উদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৩৭,৪১৮	৯২.২৩
০২.	শেখ নাসির উদ্দিন	স্বতন্ত্র		৩,১৫১	৭.৭৭
				= ৪০,৫৬৯	

জাতীয় আসন : ৩৫; বগুড়া-৩

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	আব্দুল হান্নান্নাত চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	নৌকা	২৭,৬৫৭	৫৯.৬৫
০২.	মতিউর রহমান	নেজামে ইসলাম		১৮,৭০৯	৪০.৩৫
				= ৪৬,৩৬৬	

জাতীয় আসন : ৩৬; বগুড়া-৪

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মোজাফ্ফর হোসেন	আওয়ামী লীগ	নৌকা	১৩,৫৫১	৫৯.০০
০২.	মাওলানা আব্দুর রহিম	জামায়াত	দাঁড়িপাল্লা	৯,৪১৮	৪১.০০
				= ২২,৯৬৯	

জাতীয় আসন : ৩৭; বগুড়া-৫

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	হাসেন আলী সরকার	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৩৬,৩৭২	৭৫.৭৪
০২.	হোসেন আলী আখন্দ	স্বতন্ত্র		৬,১৬৭	১২.৮৪
০৩.	সিরাজুল হক তালুকদার	মুসলিম লীগ	হারিকেন	৫,৪৮৬	১১.৪২
				= ৪৮,০২৫	

জাতীয় আসন : ৩৮; বগুড়া-৬

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	তাহেরুল ইসলাম খান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৩২,৪২৩	৭১.৫৫
০২.	ওয়াজেদ হোসেন তরফদার	মুসলিম লীগ	হারিকেন	১২,৮৯৩	২৮.৪৫
				= ৪৫,৩১৬	

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন : ৩৯; বগুড়া-৭

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	ডাঃ মোঃ গোলাম সারোয়ার	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৩২,১৯৭	৮১.১২
০২.	খুরশীদ আলী	জামায়াত	দাঁড়িপাল্লা	৭,৪৯৩	১৮.৮৮
				= ৩৯,৬৯০	

জাতীয় আসন : ৪০; বগুড়া-৮

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মোঃ আব্দুর রহমান ফকির	জামায়াত	দাঁড়িপাল্লা	১৩,৬৯৩	৫২.৬৮
০২.	এ কে মুজিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	১২,৩০০	৪৭.৩২
				= ২৫,৯৯৩	

জাতীয় আসন : ৪১; বগুড়া-৯

ক্র. নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্তভোট	%
০১.	মোঃ মাহমুদুল হাসান খান	আওয়ামী লীগ	নৌকা	৯,০৮৫	৬১.০১
০২.	মীর ইকবাল হোসেন	ন্যাপ		৫,৮০৬	৩৮.৯৯
				= ১৪,৮৯১	

[সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, সাবেক সংসদ সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ]

প্রাচীন নগর-সভ্যতা, প্রত্ন-সম্পদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষি-বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সমৃদ্ধিমানতায় উজ্জ্বল বগুড়া জেলা। প্রাচীন 'পুণ্ড্রবর্ধন' বা 'মহাস্থানগড়' নিয়ে প্রচলিত আছে নানা কাহিনী, মিথ, পুরাণ ও ইতিহাস। বৃহত্তর বগুড়া তথা সমগ্র উত্তরাঞ্চলে সংগঠিত হয়েছিল হাজং বিদ্রোহ, ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনসহ একাধিক আন্দোলন ও সংগ্রাম। ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৫২'র ভাষা-আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বগুড়ার অনেক কীর্তিমান ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন। তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বগুড়ার সৃজনশীল, অকুতোভয় নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, ভাষা সৈনিক গাজীউল হক, মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন চরমপত্রের পাঠক এম.আর আখতার মুকুল, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পাঠক ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা নূর-উল-ইসলামসহ অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত সচেতন মানুষ অধ্যুষিত এই প্রাচীন 'পুণ্ড্র' তথা বর্তমান 'বগুড়া' জনপদ।

উত্তরাঞ্চলের মুখ-সড়কে অবস্থিত এই জনপদে শিল্পের বিকাশ হয়েছিল অনেক পূর্বেই। সড়ক, নৌ এবং ট্রেন যোগাযোগ ভালো হওয়ায় এখানে শহর ও শিল্পকেন্দ্রিক শ্রম-কলোনী গড়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় আন্দোলন ও সংগ্রামে সংযোগ ঘটানো সহজ হয়—মানুষের গোষ্ঠীচেতনা ও সংগঠন প্রবণতা প্রবল হয়। দলীয় কর্মকাণ্ড, রেষারেষি বাড়তে থাকে। ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক মনোভাব পাল্টে গিয়ে দলীয় ও রাজনীতি চেতনা প্রাবল্য পায়। উপরন্তু ভূমি সমতল হওয়ায় এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ায় দেশভাগের কারণে এদেশে আসা ভারতীয় মুসলমানগণ বগুড়ায় বসতি স্থাপন করে। অপরপক্ষে বিহারিরা তো ছিলই। অবাঙালি বিহারিরা, ভারত থেকে আসা মুসলমানদের অনেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে না। তারা পাকিস্তান, ইসলাম ও মুসলমানত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ বাজি রাখে। শুরু হয় আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ। অন্যদিকে বাঙালি জাতি স্বশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নেয়। বগুড়া স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সকল সংগ্রাম যেমন, ভাষা-আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী তৎপরতা, জেনারেল আইয়ুব খানের সৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন সর্বোপরি '৭০ সালের নির্বাচনে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। '৭০-এর নির্বাচনে বগুড়ায় আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের বিজয়কে নস্যাৎ করে পাকিস্তান সামরিক জান্তা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করলে সারা প্রদেশের মতো বগুড়াও নতুন সংগ্রামে ঝুঁকে পড়ে। এবার স্বায়ত্তশাসন নয়, স্বাধীনতার দাবিতে বগুড়া সোচ্চার হয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের নতুন অধ্যায়।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১৮৯।

২. ব্রিগেডিয়ার এম. মোসাহেদ চৌধুরী (অব.) সম্পাদক, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বগুড়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৮৯, পৃ. ১।

৩. ঐ, পৃ. ৩১।

৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৭৭, পৃ. ৫৪।

৫. *প্রাগুক্ত*, জেলা গেজেটীয়ার বগুড়া, পৃ. ৩৫-৪১।

৬. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন*, কলকাতা, ডি.এন.ডি.এ ব্রাদার্স, ১৯৮০, পৃ. ৭২।

৭. *প্রাগুক্ত*, জেলা গেজেটীয়ার বগুড়া, পৃ. ৪৬-৪৬।

৮. রতনলাল চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ১৮৩।

৯. *প্রাগুক্ত*, বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বগুড়া, পৃ. ৪৬-৪৭।

১০. ঐ, পৃ. ৪৭।

১১. আবুল হোসেন খোকন, 'বগুড়া', *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, (সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ১৪৫-১৫০।

মজির উদ্দিন আহমেদ, গোলাম মহিউদ্দিন, শেখ হাফজুর রশীদ, জমির উদ্দিন মণ্ডল, এ.কে মুজিবুর রহমান, কবিরাজ শেখ আবদুল আজিজ, সিরাজুল ইসলাম, আবদুস শহীদ, নূরুল হোসেন মোল্লা, সুবোধ লাহিড়ী, আবদুর রহিম সওদাগর, শাহ আহমেদ হোসেন, মোখলেসুর রহমান, বজলুর রহমান, কবি মোতন আলী কর্ণপুরী, লুৎফর রহমান সরকার, কবিরাজ মোফাজ্জল বারী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেই সময়ে বগুড়ায় ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১২. সুজন হাজারী, 'জয়পুরহাট', *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ১৫৫।

১৩. গোলাম মহিউদ্দিন, 'বগুড়ায় ভাষা আন্দোলন', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৩।

১৪. সাক্ষাৎকার, আবদুল মতিন, ১৯ জুন ২০০৫। লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিক। স্থায়ী ঠিকানা : কলেজ রোড, শেরপুর, বগুড়া। 'দৈনিক উত্তর বার্তা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, ছাত্রজীবন থেকে বামপন্থী রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী, মার্ক্সীয় চিন্তা চেতনার ধারক-বাহক। আজীবন প্রলেতারীয় শ্রেণীর মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করেন। ১৯৪৮ সালে ভাষা-প্রশ্নে মিছিল চলাকালে মুসলিম লীগের কর্মী-সমর্থক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হন আযিযুল হক কলেজের অনেক ছাত্রসহ আব্দুল মতিন। ৬৬-র ৬ দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন জনাব আব্দুল মতিন—তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে তথ্যগুলো জানা যায়।

১৫. সুজন হাজারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬।

১৬. আবুল হোসেন খোকন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

১৭. সাক্ষাৎকার, ড. এনামুল হক, ২০ মার্চ ২০০৬। কবি, নাট্যকার, গীতিকার, সাবেক মহাপরিচালক জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা : জলেশ্বরীতলা, বগুড়া। গান রচনা, কণ্ঠ ও সুরারোপে দক্ষ। ভাষা-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধকালে দেশাত্মবোধক গানে এদেশের মানুষকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯৫৩/৫৪ সালে অনেক রাজনৈতিক সভার উদ্বোধনী গণসঙ্গীত গায়ক ছিলেন। সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে গণসঙ্গীত গায়ক ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিসেবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে রাজনৈতিক কারণে জেলে বন্দি হন। ১৯৫৪ সালে গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনো একক রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব নাই। দেশের কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল ছিল ৫৪'র আন্দোলন—সাক্ষাৎকারে তিনি জোর দিয়ে একথা বলেন। ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের নেপথ্যে জনগণের সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক জোয়ারকে তিনি প্রাধান্য দেন। বগুড়ায় বিশেষত পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, আক্কেলপুর প্রভৃতি স্থানে অগ্রগামী চিন্তাধারার বামপন্থী কর্মী ও নেতা ছিল বলেই তেভাগা আন্দোলনটা ঐ সমস্ত এলাকাতেই হয়েছিল। যার প্রভাব পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলেছিল।

১৮. *প্রাগুক্ত*, আবদুল মতিন, ১৯ জুন ২০০৫।

১৯. *প্রাগুক্ত*, গোলাম মহিউদ্দিন, পৃ. ৪৫।

২০. প্রাগুক্ত, সুজন হাজারী, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

২১. *প্রাগুক্ত*, ড. এনামুল হক, ২০ মার্চ ২০০৬।

২২. *দৈনিক আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

২৩. *প্রাগুক্ত*, আবদুল মতিন, ১৯ জুন ২০০৫।

২৪. *দৈনিক আজাদ*, ১ ও ২ মার্চ ১৯৫২।

২৫. হাসান আজিজুল হক, *অতলের আঁধি*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১১৪।

২৬. সাক্ষাৎকার, এ.কে মুজিবুর রহমান, ২২ জুন ২০০৬। বর্তমানে ৮৪ বছরের দীর্ঘ জীবনযাপন করছেন। বঙ্গবন্ধুকে 'মিতা' সম্বোধন করতেন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ঘোষণাকালে বগুড়ায় রাজনৈতিক পরিবেশ বর্ণনা করেন এভাবে : পাকিস্তানীরা আমাদের শুষে খাচ্ছে, সবকিছু সম্পদ তারা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে ৩টা রাজধানী বানাচ্ছে—করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ।
মুক্তিযুদ্ধকালে বগুড়ার নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম এ.কে মুজিবুর রহমান যুদ্ধকালে সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও তাৎক্ষণিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিশিসান দিয়েছেন যা যুদ্ধভায়ের জন্য সহায়ক হয়েছে।

২৭. দৈনিক আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩।

২৮. ঐ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪।

২৯. সাক্ষাৎকার, এ.কে মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, ২২ জুন ২০০৬।

৩০. সাক্ষাৎকার, ড. এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, ২০ মার্চ ২০০৬।

৩১. *দৈনিক আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪।

৩২. ঐ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪।

৩৩. ঐ, ২ মার্চ ১৯৫৪।

৩৪. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), (১৯৫৩-১৯৬৯), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৩০-৩১।

৩৫. *দৈনিক আজাদ*, ২২ মার্চ ১৯৫৪।

৩৬. ঐ, ২৪ মার্চ ১৯৫৪।

৩৭. ঐ, ২৮ মার্চ ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. ঐ, ২১ এপ্রিল ১৯৫৪।
৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ এপ্রিল ১৯৬২।
৪০. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
৪১. আবুল কাশেম, 'বাবট্টির শিক্ষা আন্দোলন : প্রকৃতি ও পরিধি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ২৩-২৪, পৃ. ৪০।
৪২. *দৈনিক আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২।
৪৩. এ.জে.এম সামুছ উদ্দিন তরফদার, *দুই শতাব্দীর বুকে : (বগুড়ার ইতিহাস)*, বগুড়া, প্রজা বাহিনী প্রেস, ১৯৭৬, পৃ. ১৪২।
৪৪. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৭ অক্টোবর ১৯৬২।
৪৫. এ.জে.এম সামুছ উদ্দিন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।
৪৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ এপ্রিল ১৯৬৬।
৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মে ১৯৬৬।
৪৮. ঐ, ১৩ জুলাই ১৯৬৬।
৪৯. এ.কে মুজিবুর রহমান, রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৫।
৫০. এ.জে.এম সামুছউদ্দিন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।
৫১. মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, সম্পাদনা : আবুল কাশেম, জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট, ২৬ মার্চ ১৯৯৯।
৫২. সাক্ষাৎকার, মমতাজ উদ্দিন, ২২ জুন ২০০৬। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রনেতা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি, বর্তমানে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ও মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দেশচিত্র সম্পর্কে বিশেষত, বগুড়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও চিত্র তুলে ধরেন জনাব মমতাজ উদ্দিন।
৫৩. *দৈনিক আজাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৬৮।
৫৪. ঐ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৮।
৫৫. ঐ, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৮।
৫৬. ঐ, ৮ জানুয়ারি ১৯৬৯।
৫৭. ঐ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৯।
৫৮. ঐ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
৫৯. এ.জে.এম সামুছউদ্দিন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।
৬০. *দৈনিক আজাদ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, ৪ মার্চ ১৯৬৯।
৬১. এ.জে.এম সামুছউদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।
৬২. *দৈনিক আজাদ*, ৫ মার্চ ১৯৬৯।
৬৩. ঐ, ১৯ মার্চ ১৯৬৯।
৬৪. সাক্ষাৎকার, আমানউল্লাহ খান, ২০ জুন ২০০৬। পিতা : কুতুবুদ্দিন খান, গ্রাম : জয়লাজুয়ান, থানা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া। বর্তমান ঠিকানা : নিশিন্দারা হাউজিং প্রকল্প, বাড়ি-২, রোড-২৯, বর্তমান বয়স : ৬৭ বছর। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর। তিনি যুদ্ধকালে দৈনিক ইত্তেফাক-এর বগুড়া প্রতিনিধি ছিলেন। এখনও সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গেই যুক্ত। ১৯৭১ সালে বগুড়াতেই বিভিন্ন এলাকায় মুজিব বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের যুদ্ধবিষয়ক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বগুড়া জেলায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের include করা, তাদেরকে ট্রেনিং-এ পাঠানো ছাড়াও স্বাধীনতার জন্য কৌশল প্রণয়নসহ এলাকার মানুষের সহযোগিতা ও মনোবল বাড়ানোর জন্য কাজ করেছেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বগুড়া জেলায় নির্বাচন পরিচালকের দায়িত্বপালন করেন। বঙ্গবন্ধু তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন বলে সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় তিনি এই অভিমত দেন। তিনি বলেন, ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হল। ৩০ ডিসেম্বর বগুড়া থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'দৈনিক বাংলাদেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই 'দৈনিক বাংলাদেশ' Divide বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশিত দৈনিক। জনাব খান সাবেক সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা।
৬৫. এ.জে.এম সামুছউদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫।
৬৬. মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

অসহযোগ আন্দোলন, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও ভারত গমন

১৯৭০-এর নির্বাচনে আসন সংখ্যার ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ। এই বিজয়ের পরবর্তী ধাপ হিসেবে অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ মুজিবুর রহমান, এটাই স্বাভাবিক। বাঙালির বিজয় অত্যাসন্ন দেখে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার এবং এর সমমনা দলগুলো নানা টালবাহানা শুরু করে। তারা বিনা কারণে, অজুহাত দেখিয়ে ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদের বৈঠক বানচাল করে দেয়। এই হঠকারি সিদ্ধান্তের নেপথ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থপরতা, একরৈখিক মনোভাব এবং গভীর ষড়যন্ত্র নিহিত। পরবর্তী সময়ের ধারাবাহিক ঘটনা বিশ্লেষণে এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় : ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ৩ মার্চ ঢাকাস্থ প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে সকাল ৯টায় অধিবেশন বসবে বলে জানানো হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ প্রায় গুছিয়ে ফেলে। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেন, ৬ দফা প্রশ্নে কোন সুরাহা না হওয়ার কারণে তার দল আহুত অধিবেশনে যোগ দিতে অপারগ। অপরদিকে ১৭ ফেব্রুয়ারি বেলুচ নেতা নবাব আকবর খান বুগতি ভুট্টোর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, ভুট্টোর অধিবেশনে যোগদানে অপারগতা প্রকাশ পাকিস্তানের দু'অংশকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এদিকে বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম-পাকিস্তানিদের গোপন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। এরই মধ্যে কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ ভুট্টোর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলে পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৩ জন পরিষদ সদস্য ঢাকায় আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে সম্মতি প্রকাশ করেন। এহেন পরিস্থিতিতে ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার জোর দাবি জানালে ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতারের মাধ্যমে পূর্ব ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। আকস্মিক এই ঘোষণা অধিকার বঞ্চিত, শোষিত বাঙালি জাতিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও অগণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি চূড়ান্ত অসহযোগিতার পথে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনোপ্রকার কর্মসূচি ঘোষণার পূর্বেই বাঙালি জাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ বাঙালি জাতির এই জাগরণের ঢেউ উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বগুড়াকেও উত্তাল ও আন্দোলিত করেছিল সমভাবে। বৃহত্তর বগুড়ার সচেতন, প্রগতিশীল

Dhaka University Institutional Repository

ও স্বাধীনতাকামী বীর জনতা নিজেদেরকে আন্দোলনে যুক্ত করে স্ব-স্ব অবস্থান প্রকাশ করেছিল। ১ মার্চের ঘোষণার পরপরই বগুড়ার ছাত্রনেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগের তৎকালীন কার্যালয় জিন্নাহ হলে (বর্তমানে মাসুদ হল) এক জরুরি সভায় বসে। সভাশেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এরপর বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ঘোষিত কর্মসূচির সমর্থনে বগুড়ায় মিটিং-মিছিল অব্যাহত থাকে। শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ এবং সাতমাথায় প্রতিদিন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন: ১. মাহমুদুল হাসান খান, ২. এ.কে. মুজিবুর রহমান, ৩. ডা. জাহেদুর রহমান, ৪. মোস্তাফিজুর রহমান পটল এবং ৫. আমানউল্লাহ খান।[১] দেশের আপামর জনগণের মতো বগুড়াবাসীও অপেক্ষায় ছিল ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ঘোষণার। কিন্তু দুষ্টচক্র কোনো প্রকার ঘোষণা ছাড়াই বেতার সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। তবে বিবিসি'র মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও দেশের খবর জানতে পেরে সচেতন বগুড়াবাসী 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এর পরেই জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মমতাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনকে সম্পাদক এবং ছাত্রলীগ নেতা আমিনুল ইসলাম মিন্টুকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[২] অন্যত্র ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নাম পাওয়া যায় রফিকুল ইসলাম লাল ও মমতাজউদ্দীনের।[৩] তখন প্রতিদিনের প্রস্তুতিপর্বে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে এ.কে. মুজিবুর রহমান, মাহমুদুল হাসান খান, ডা. জাহেদুর রহমান, আকবর আলী খান চৌধুরী, মজিবর রহমান (আক্কেলপুর), হাসেন আলী সরকার, মোজাফফর হোসেন, ডা. গোলাম সারোয়ার, মিরাজুল ইসলাম সুরুজ, আমানউল্লাহ খান, মোস্তাফিজুর রহমান পটল, হাসেম আলী খান জায়েদী, হাসেন আলী তালুকদার, কছিমউদ্দিন আহমদ, আবুল হাসানাত চৌধুরী, মফিজ চৌধুরী, শেখ আবদুল আজিজ, মোজাম্মেল হোসেন খান, মোল্লা মজিবর রহমান, মন্তেজার রহমান মণ্ডল, আবদুর রহিম তালুকদার, আলী হোসেন, সৈয়দ নূরুল হুদা, চিত্তরঞ্জন সরকার, গোলাম রহমান সরকার, অহিতুল্লাহ আহম্মদ, আয়েনউদ্দীন আহম্মদ, আজাহার আলী মণ্ডল, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আবু খাদেম খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৪] বগুড়ার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পাকিস্তানের শোষণ-নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের কথা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এবং বাঙালিদের ভাষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতিসহ সামূহিক মুক্তি ও কল্যাণের দৃঢ় আশায় নেতৃবৃন্দের কর্মসূচি ফলপ্রসূ আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুবই অবদান রেখেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বগুড়া অঞ্চলে ন্যাপের প্রভাব ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি বগুড়ার ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৫] দলীয় নীতি-আদর্শ দেশ-জাতির স্বার্থে ম্লান হয়ে যায়—একটি কথাই প্রাধান্য পায়—আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, আমরা তার মুক্তি চাই। অসহযোগ আন্দোলনে ন্যাপ নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছিলেন : গাজীউল হক, সিরাজুল ইসলাম, মোশাররফ হোসেন মণ্ডল, হারুনুর রশিদ, সাদেক আলী, মোখলেসুর রহমান, মীর ইকবাল হোসেন, দুর্গাদাস মুখার্জী, আবদুল লতিফ, আবদুর রাজ্জাক, গোলাম মোস্তফা খান, ডা. আবদুল কাদের চৌধুরী, মীর শহীদ মণ্ডল প্রমুখ।[৬]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর পরই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি ক্যাম্প। স্বাধীনতাকামী বগুড়ার সচেতন জনমনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শক্তি ও প্রেরণা যোগায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। আন্দোলনকামী নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে ছাত্রসমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বগুড়া শহর, থানা সদর এমনকি পাড়ায় পাড়ায় সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চলতে থাকে।[৭] ছাত্রলীগের সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বগুড়া শহরের এডওয়ার্ড পার্ক, সেন্ট্রাল স্কুলে সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। মোস্তাফিজার রহমান পটলকে প্রধান করে ঐ সময় বগুড়ায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়।[৮] অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঢাকার নেতাদের সঙ্গে বিশেষ করে ছাত্রনেতৃবৃন্দের সঙ্গে বগুড়ায় অংশগ্রহণকারীদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। তৎকালীন ছাত্রনেতা আ.স.ম. আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলন কমিটির সদস্য আমানউল্লাহ খান তখন জাতীয় চার নেতার অন্যতম ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলীর প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ফলে বগুড়ায় দেশের পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থার খবর দ্রুত চলে আসত। বগুড়ায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মমতাজউদ্দীন, আবদুস সামাদ, খাদেমুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম মিন্টু, শামসুর রহমান, সাইদুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক মিল্লাত, ফেরদৌস জামান মুকুল, রেজাউল বাকী, রেজাউল করিম রেজা, মাহবুবুর রহমান রাজা, মকবুল হোসেন, মোঃ শোকরানা, আমিনুল ইসলাম পিন্টু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে বগুড়া জেলা কমিটি মাসুদার রহমান হেলালকে অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত করে জেলা স্কুল মাঠে রাইফেল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে। ছাত্র ইউনিয়নের অন্যান্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে হায়দার আলী, স্বপন গুহ রায়, রফিকুল ইসলাম লাল, নূরুল আনোয়ার বাদশা, মনোজ দাশগুপ্ত, বদিউল আলম প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দের ও কর্মীদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সার্বিকভাবে ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং শুরু হয় আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে এবং করোনেশন স্কুল প্রাঙ্গণে। এ সময় সোনাতলায় সৈয়দ নূরুল হুদা, জুলফিকার হায়দার, তোফাজ্জল হোসেন, তাজুল ইসলাম প্রমুখের নেতৃত্বে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিফ্রন্ট ও ট্রেনিং কার্যক্রম চলতে থাকে—সকলের লক্ষ্য একটাই পাকবাহিনীর হাত থেকে দেশের মুক্তি।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে বগুড়ার থানাগুলোতেও আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। শেরপুরে গঠিত হয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আবদুস সাত্তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন ন্যাপ নেতা সিদ্দিক হোসেন। প্রথমে শেরপুর ডি.জে হাইস্কুল চত্বরে কাঠের বন্দুক দিয়ে ট্রেনিং শুরু হলেও পরে শেরপুর থানা থেকে দেয়া ১৪ টি রাইফেল দিয়ে চলে সশস্ত্র ট্রেনিং। ট্রেনিং-এর দায়িত্বে ছিলেন থানার তৎকালীন হাবিলদার আবদুল হালিম। তাকে সহযোগিতা করেন শেরপুর থানার দারোগা ওয়াজেদ মিয়া।[৯] সুবল চন্দ্র দাস নামে শেরপুরের একজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বলেন : 'এ সময় ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে যে-সব দাবি দাওয়া পেশ করা হয় আমরা তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করি। ঢাকা থেকে নির্দেশ এল, ট্রেনিং সেন্টার হল হাইস্কুলে। এখানে সিদ্দিক এবং হালিম নামে দু'জন ট্রেনিং দেয়।'[১০]

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পরপরই বগুড়ার অন্যতম মহকুমা শহর জয়পুরহাটের ছাত্র, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী সম্প্রদায় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বাসী সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশকে রক্ষা করার জন্য একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। আব্দুল মোতালেব চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জনাব কাফেজ উদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক এবং মাহতাব উদ্দিন মণ্ডলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে এবং পরবর্তীতে যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা দিয়ে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন : জনাব সাইদুর রহমান এম.পি.এ, জনাব আবুল হাসনাত চৌধুরী এম.পি.এ, আব্দুল মোতালেব চৌধুরী, ডা. আবুল কাশেম, তোয়াব সওদাগর, মহিম চন্দ্র সরকার, শাকিল উদ্দিন আহমেদ, এমদাদুল বারী, সোহন লাল বাজলা, বেলাল উদ্দীন সরকার, নূর হোসেন মণ্ডল, জালালউদ্দীন মণ্ডল, আনিসুর রহমান প্রমুখ। পরবর্তী সময় এই কমিটিকে সর্বদলীয় রূপদানের জন্য স্থানীয় জামায়াত প্রধান আব্বাস আলী খান, কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান আব্দুল আলীম, আবু ইউসুফ, মোঃ খলিলুর রহমান এবং ন্যাপ প্রধান মীর শহীদ মণ্ডলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে একমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

মীর শহীদ মণ্ডল ছাড়া অন্যরা সহযোগিতা না করে এর সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছে।[১১] ১৮ মার্চ ১৯৭১ জয়পুরহাট মহকুমায় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন : মীর শহীদ মণ্ডল, ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরী, ড. মফিজ চৌধুরী, মাহতাব উদ্দিন মণ্ডল, কাফেজ উদ্দীন আহমেদ, কে.এম ইদ্রিস আলী, ইউনুস আলী, আমিনুল হক বাবুল, গোলাম রসুল চৌধুরী প্রমুখ।[১২]

অসহযোগ আন্দোলনে বগুড়ার নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মা-বোনেরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে, সভা সমাবেশ করে। এই সময়ের নেতৃস্থানীয় মহিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বেগম জহুরা, ইয়াসমিন, হিমায়েতুন নেসা, জহরা খানম, আমেনা রইস, খালেদা হানুম, নেসা প্রমুখ। হিমায়েতন নেসার আহ্বানে বাংলাদেশ মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জিন্নাহ হলে মহিলা সভায় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সভাশেষে একটি বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পর বৃহত্তর বগুড়া জেলাতেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৩ মার্চ বগুড়ার পাশাপাশি জয়পুরহাট মহকুমায় সরকারি ডাক্তারখানা মাঠে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতাদের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সভায় উপস্থিত সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি হাজী আব্দুল মালেককে দিয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শহরের সব জায়গায় এই পতাকা উত্তোলিত হয়। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান আব্দুর রাজ্জাক বগুড়া জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান মোস্তাফিজার রহমান পটলসহ জয়পুরহাটে আসেন। তাঁরা স্থানীয় থানা আনসারসহ এতদ অঞ্চলের অস্ত্রের মজুদ বিষয়ে জ্ঞাত হন এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশ ও আনসার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।[১৩]

সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাক্তন সৈনিক শাকিল আহমেদের নেতৃত্বে ও কমান্ডে মার্চ মাসের ১৫ তারিখে জয়পুরহাট সরকারি কলেজ মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। আজিজুল বারী, আব্দুল কাদের এবং আব্দুল ওয়াদুদ শাকিল আহমেদের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এপ্রিল মাসে পাকবাহিনীর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই ট্রেনিং ক্যাম্প চালু ছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে পাঁচবিবি এল.বি (লাল বিহারী) হাইস্কুল ও আক্কেলপুর হাইস্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করা হয়।[১৪]

১৫ মার্চ জয়পুরহাট কলেজে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শুরু হবার পর জয়পুরহাট চিনিকলের ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে আজিজুল বারী, আমজাদ হোসেন, কালু, একরামুল হক, আনোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, হাফিজার রহমান প্রমুখ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি তৈরি কার্যক্রম শুরু করেন। সিমেন্ট প্রকল্প থেকে বিস্ফোরক এনে জীবন বাজি রেখে হাতিয়ার তৈরিসহ উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বোমা তৈরির কাজ শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জয়পুরহাট চিনিকলে একটা কামান বানানো হয়। ফায়ার করলে যাতে পাঞ্জাবিরা ভয় পায় সেই উদ্দেশ্যেই কামানটি তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রণকৌশল ও রণনীতির অভিনিবেশ লক্ষ করা যায়। কামান তৈরি করার এক্সপ্লোসিভ জোগাড় করা হয় জি.এস.পি কয়লা কোম্পানি থেকে। স্প্রিন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয় মোটরের বড় বড় লোহার বলকে। এক্সপ্লোসিভ ঢুকানোর পর কামানটার ভেতরে ডেটোনেটর ও সেফটি ফিউজ দিয়ে ফায়ার করে। প্রথমে এটা সফলভাবে চললেও পরবর্তীতে এই যন্ত্রের সামনের দুইটা পা ভেঙ্গে পড়ে। এভাবে জয়পুরহাটে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ মেধা খাটিয়েছেন।[১৫] পাকবাহিনীকে হেনস্থা করার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি সামান্য হলেও কাজে এসেছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্য সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তহবিল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার খরচের যোগান দেয়া হয়। ২৭ মার্চ মীর শহীদ মণ্ডল, শামসুল হুদা সরদার এবং পাঁচবিবি থানার এস.আই আব্দুর রাজ্জাক কড়িয়া ইপিআর ক্যাম্প থেকে ইপিআর বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মঞ্জুর হোসেন ও অবাঙালি সকল ইপিআর সদস্যদের গ্রেফতার করে পাঁচবিবি থানা হাজতে আটক করে। এ সময় কড়িয়া ইপিআর কোম্পানির কমান্ডারের চার্জ দেয়া হয় ওয়ারলেছ মাস্টার ফজলকে। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন হাবিলদার মকবুল, খবির, ড্রাইভার জীবন চাকমা, কাশেম প্রমুখ।[১৬] মুক্তিযোদ্ধাদের এই পর্যায়ক্রমিক অগ্রসরমানতায় সহযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের মনোবল বৃদ্ধি পায়। বিজয়ের জন্য এ-রকম কর্মকাণ্ড সহায়ক হয়েছিল বলেই অনেকে মনে করেন।

পাঁচবিবি থানায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ দু'দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় পাঁচবিবি থানা সংগ্রাম কমিটি। উল্লেখ্য সারাদেশে সংগ্রাম কমিটিগুলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হলেও পাঁচবিবিতে গঠিত হয় ন্যাপের (মোজাফফর) নেতৃত্বে। সংগ্রাম কমিটির অফিস স্থাপিত হয় বালিঘাটা (পাঁচবিবি) বহুমুখী সমবায় সমিতির কার্যালয়ে। তবে অঘোষিত গোপন অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতো তৎকালীন সি.ও (উন্নয়ন) অফিস। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্রলীগের সমন্বয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এর নেতৃত্বে ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয় ছাত্র ইউনিয়নের অফিস। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন জয়পুরহাট মহকুমা ন্যাপের সভাপতি মীর শহীদ মণ্ডল, যুগ্ম-আহ্বায়ক পাঁচবিবি থানা

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের সম্পাদক আজিজার রহমান চৌধুরী।[১৭] দল নয়, দেশ ও দেশের মানুষই বড়—আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে সেদিন তাই প্রমাণিত হয়েছিল।

৭ মার্চের পর অসহযোগ আন্দোলনে সারাদেশের মত জয়পুরহাট মহকুমার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তৎকালীন সময়ে জয়পুরহাটে কাঁচা রাস্তা বেশি থাকায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল ট্রেন। এমতাবস্থায় বিওপিগুলোতে অবস্থানরত ইপিআর সদস্য যারা বিভিন্ন জেলার অধিবাসী ছিল তাদের সঙ্গে পরিবার পরিজনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তারা চরম আর্থিক কষ্টে পড়ে। কারণ অসহযোগের ফলে তাদের বেতন ভাতা বন্ধ ছিল, রেশন ছিল না। সংগ্রাম কমিটি ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ইপিআরদের আহার ও হাত খরচের ব্যবস্থা করার জন্য থানার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন চাল-ডাল, আলু, শাকসবজি সংগ্রহ করে ইপিআরদের আস্তানায় পাঠানো হতো। এছাড়াও এ সময়ে কেরোসিন ও লবণের মজুদ ফুরিয়ে গেলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ভারত থেকে মোষের গাড়িতে করে কেরোসিন তেল ও লবণ এনে ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হতো।[১৮] এভাবেই শত ত্যাগ ও পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা।

পূর্ব-পাকিস্তানে ইপিআরের যতগুলো শক্ত সীমান্ত ফাড়ি ছিল তার মধ্যে পশ্চিম বগুড়ার জয়পুরহাট মহকুমার পাঁচবিবি থানার সীমান্ত ফাড়িগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য। এই সীমান্ত ফাড়ি দখলের উদ্দেশে পাকবাহিনী ২০ এপ্রিল (১৯৭১) রংপুর থেকে কামদিয়া-পাঁচবিবি সড়ক পথে কৌশল অবলম্বন করে গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে পাঁচবিবিতে ঢুকে পড়ে। এখানে পাঁচবিবির প্রবেশমুখ ফিচকাঘাটে দু'জন লোককে গুলি করে হত্যা করে। অতঃপর পাঁচবিবি হাটে প্রবেশ করে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এখানে নিহত হয়—ননী গোপাল কুণ্ডু, আয়মারসুলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমল কুণ্ডু, সাত্তার পাগলাসহ আরো নাম-না-জানা হাটুরে লোকজন। ২২ এপ্রিল সকালে মুক্তিযোদ্ধারা হিলি খাদ্যগুদাম থেকে চাল সংগ্রহ করে। এই ঘটনার পর পাকবাহিনী হিলি দখল করে নেয়। ২৪ এপ্রিল রবিবার রাত আড়াইটায় পাকবাহিনী ট্রেনযোগে শান্তাহার থেকে জয়পুরহাটে আসে। অতঃপর পাকবাহিনী জয়পুরহাট দখল করে শুরু করে তাদের ব্যাপক নির্যাতন ও গণহত্যা।[১৯] অন্যদিকে সান্তাহারে ১৯৭১-এর মার্চ মাস থেকেই বিহারিদের অত্যাচার শুরু হয়। এই অবিচার-অত্যাচার প্রতিরোধকল্পে আলহাজ্ব কাছিম উদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে সেখানে সংগ্রামী জনতা সংঘবদ্ধ হয়। মার্চ মাসেই আদমদীঘি হাইস্কুল মাঠে সাধারণ মানুষদের নিয়ে সশস্ত্র ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। সেখানে ট্রেনিং-এর দায়িত্বে ছিলেন সেনা সদস্য আমজাদ হোসেন খন্দকার, শামসুল আরেফিন বুলু, আবুল হোসেন, আবদুল হাকিম, অপিরউদ্দীন প্রমুখ।[২০] জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দেশের জন্য কাজ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নেতৃবৃন্দ এবং সুশীল সমাজ উদ্বিগ্ন। জনমনে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এই টানাপড়েন অবসানের উদ্যোগে ঢাকায় তখন চলছে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। সমগ্র দেশবাসীর মতো বগুড়াবাসীও অপেক্ষায় ছিল সেই আলোচনার ফলাফল জানতে। কিন্তু ১৬ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আলোচনায় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায় নি পাকিস্তানিরা। এদিকে প্রতি বছর ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হলেও শেখ মুজিবের আহ্বানে পূর্ববাংলায় 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্র সমাজে 'প্রতিরোধ দিবস' বলে ঘোষণা দেয়। দেশব্যাপী পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে লাল-সবুজের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা উড়ানো হয়। সেদিন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আলোচকবৃন্দ বাংলাদেশের পতাকাশোভিত গাড়িতে চড়ে আলোচনায় যোগ দিতে যান। ঐদিন বগুড়ার ছাত্র সমাজ বিশেষত, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ভোর ৬ টায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। পরে সকাল আটটায় আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতা ফেরদৌস জামান মুকুল বলেন : '৭১ সালের ২৩ শে মার্চ, আমার মনে আছে আমরা পাকিস্তানি পতাকা পুড়ে দেই, বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। সব জায়গা থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে দিয়ে সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হল। বাংলাদেশের সেই পতাকাটা যার সবুজের মাঝখানের লালবৃত্তে হলুদ মানচিত্র ছিল।'[২১] ঐদিন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসান খান ও সাধারণ সম্পাদক এ.কে. মুজিবুর রহমান জয়বাংলা বাহিনী ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। কুচকাওয়াজ পরিচালনা করেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান মোস্তাফিজার রহমান পটল। ছাত্রলীগের সভাপতি মমতাজউদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনসহ ছাত্রনেতা আবদুস সামাদ, খাদেমুল ইসলাম, সাকিরুল ইসলাম ও অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন।[২২]

জাতীয় পরিষদের ২৫ মার্চ আহুত অধিবেশন পুনরায় স্থগিত হয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তান হতে আগত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ২৪ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। কিন্তু তখনও বাঙালির সামনে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আলোচনার সুতো ঝুলিয়ে রাখা হল। আওয়ামী লীগের আলোচক দলকে ২৪ মার্চ রাতেও জেনারেল পীরজাদা আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, ২৫ তারিখের চূড়ান্ত আলোচনার সময় তিনি জানিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই টেলিফোন ম্যাসেজ বাস্তবে আর আসে নি। তবে ২৪ মার্চেই ছাত্রনেতা মোস্তাফিজার রহমান পটল ও মতিয়ার রহমান ঢাকা থেকে বগুড়ার ছাত্রনেতা আবদুস সামাদকে জানান শেখ মুজিব ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এর পরিপ্রেক্ষিতে

Dhaka University Institutional Repository

অবনতি হতে পারে। এই খবর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ডিবি ইন্সপেক্টর শাহ মকবুল হোসেন ও থানা কর্মকর্তা নিজামুল হককে জানানো হয়। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বগুড়ায় ছাত্রদের মিছিল বের হয়। এর সঙ্গে যোগ দেয় শ্রমিক মিছিল। মিছিলকারীদের স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বগুড়া। এরই মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মিটিং অনুষ্ঠিত হয় পুলিশ লাইনের আর. আই. হাতেম আলী খানের সঙ্গে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় কোনোক্রমেই সরকারি ভাণ্ডারে গচ্ছিত অস্ত্র পাক-সেনাদের হাতে সম্পন্ন করা হবে না এবং যথাযথভাবে আক্রমণ প্রতিহত করা হবে। এস. আই. আফতাবউদ্দীনকে দায়িত্ব দেয়া হয় থানার ওয়্যারলেস অপারেটরদের তদারক করতে। একই সঙ্গে বগুড়া থানায় অতিরিক্ত ৫০ জন পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়। স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত বাঙালির বীরত্বপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে স্বৈরাচার পাকিস্তানি সরকার সুযোগ গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র, সৈন্য আর গোলাবারুদ মোতায়েন সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরের অসামরিক জনগণের উপর শুরু করে বর্বরোচিত আক্রমণ। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে এই আক্রমণ ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যায় পরিণত হয়। উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা শহর হিসেবে বগুড়াও ছিল পাকবাহিনীর টার্গেট। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা থেকে পুলিশ ওয়্যারলেসে খবর আসে পাকবাহিনী ঢাকা আক্রমণ করেছে। বগুড়া থানা থেকে ঢাকা কিংবা রংপুরে যোগাযোগ করতে চাইলেও পারা যায় না। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা থেকে খবর পাওয়া যায় ৩২টি ট্রাকভর্তি সৈন্য বগুড়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।[২৩] এই সংবাদ পাওয়া মাত্র থানার ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন, ইন্টেলিজেন্স অফিসার মকবুল হোসেন দ্রুততার সঙ্গে নেতা-কর্মীদের কাছে তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। ছাত্রলীগের মমতাজউদ্দীন ও ছাত্র ইউনিয়নের রফিকুল ইসলাম লালের নেতৃত্বে পুরো শহরে তখন ছাত্র-বিগ্রেডের পাহারা চলছে। উপরন্তু তাৎক্ষণিকভাবে থানার সকল পুলিশের মধ্যে রাইফেল ও গুলি বিতরণ করে চারদিকে পজিশন নিতে বলা হয়। একই ব্যবস্থা জেলার অন্যান্য থানায়ও প্রযোজ্য হবে বিধায় নির্দেশও দেয়া হল। নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্র বিগ্রেডের নেতা-কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় চিৎকার করে সাধারণ মানুষদের জাগিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে খোলা জিপে করে থানার ওসি আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে দিলেন। এরই মধ্যে একত্রিত হলেন ডা. জাহেদুর রহমান, গাজীউল হক, একে মুজিবুর রহমান, মোশারফ হোসেন মণ্ডল, মাহমুদুল হাসান খান, মমতাজ উদ্দীন, মাসুদার রহমান হেলাল, মোজাম্মেল হক লালু, টি.এম. মুসা পেন্তা, শোকরানা, জাকারিয়া, আবদুস সামাদ, হায়দার আলী, স্বপন গুহ রায়, এনামুল হক তপন, রফিকুল ইসলাম লাল প্রমুখ ছাত্রনেতৃবৃন্দ। ঘুমন্ত শহর কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠল—বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।[২৪] মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ-জনতার ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত হল, পাকবাহিনীকে রুখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়ার উত্তরদিকে রংপুর থেকে আসার রাস্তা এবং শহর থেকে দক্ষিণ দিকে আড়িয়াবাদ ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসার রাস্তা যে কোন উপায়ে বন্ধ করতে হবে। প্রতিরোধের অংশ হিসাবে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ছাত্রনেতা আবদুস সামাদ ও রেজাউর রহমান ডেংগু বগুড়া-আড়িয়া সড়কে গাছ কেটে, ইটের স্তূপ ফেলে ব্যারিকেড দিয়েছিল। তাই বাকি থাকে শুধু বগুড়া-রংপুর সড়ক অর্থাৎ উত্তরদিক থেকে প্রবেশপথ। সিদ্ধান্ত হল ত্বড়িৎগতিতে মাটিডালীতে ব্যারিকেড দিতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাছ কেটে ব্যারিকেড দেয়া হল। এরই মধ্যে সাতমাথা, কালিতলা, বড়গোলা, মহাস্থানে গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হল। কালিতলা মসজিদ থেকে লুৎফর রহমান সাইরেন বাজিয়ে শহরবাসীকে সতর্ক করে দেন। সেই রাতেই বগুড়া শহরের আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়নের কর্মিসহ সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রেল স্টেশনে যায় এবং সেখানে থাকা ট্রেনের বগিগুলো উল্টিয়ে দেয়। এরপর বগুড়া শহরে প্রবেশের যে তিনটা প্রবেশমুখ ছিল সেগুলোকে ১, ২, ও ৩নং রেল ঘুমটি বলা হয়। সেখানে দুইটা করে লোড বগি দিয়ে দেয়া হয়। এই বগিগুলি একজন বিহারি ড্রাইভারকে বাধ্য করে মালগাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়। পাকবাহিনী শহরে প্রবেশের পূর্বেই ব্যারিকেডে বাধা পেল। কিন্তু রাস্তায় ফেলে রাখা গাছের ডাল, ড্রেনের স্লাব সরিয়ে কিছু দূর এগোতেই আবার বাধা, ব্যারিকেড। এভাবে ব্যারিকেড সরিয়ে শহরে পৌছার পূর্বেই ভোর হয়ে যায়। ঠেঙ্গামারা নামক স্থানে গাছ কাটারত রিকশাচালক তোতা মিয়া পাকবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন—তোতা-ই বগুড়ার প্রথম শহীদ।[২৫] আরেকটু এগিয়ে কালিতলায় এসে পাকবাহিনী ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী রমজান নামক রিকশা চালককে হত্যা করে। এরইমধ্যে মসজিদের কাছে পাকবাহিনী আসতেই গর্জে ওঠে বড় ড্রেনের মধ্যে পজিশন নেয়া এনামুল হক তপনের পিস্তল। এর মাধ্যমেই বগুড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে পিছু হটে এনামুল হক তপন, বখতিয়ার হোসেন বখতুসহ অন্যান্যরা। এই সুযোগে পাকবাহিনী বড়গোলা পার হয়ে ঝাউতলা পৌছায়। সঙ্গে সঙ্গে আজাদের বন্দুক গর্জে ওঠে। কিন্তু পাকবাহিনীর গুলিতে সেখানেই শহীদ হয় আজাদ।[২৬] এরপর পাকবাহিনী অগ্রসর হয় রেলক্রসিং-এর দিকে। কিন্তু সেখানে মালগাড়ি এনে রাস্তা অবরোধ করে রাখা ছিল। এদিকে আজাদ গেস্ট হাউজের ছাদে পজিশন নিয়েছিলেন থানার দারোগা নিজামউদ্দীন, নূরুল ইসলামসহ কিছু পুলিশ। ততক্ষণে সচল হয় ট্রিগারে রাখা তাদের হাত। সাতমাথার বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নেয়া লাল, পেন্তা, রাজ্জাক, বাদশা, খোকন, মাসুদ, রানা, মিন্টু, নান্না, রেজাউল, বুলু সোহরাব, বুলবুল, মজনু, হেলাল, মুকুল, সাইদুলসহ অন্যান্যদের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে অসুবিধায় পড়ে যায় পাকবাহিনী। ইউনাইটেড ব্যাংকের ছাদে ছিল টিটু, হিটলু, ছুনু, কাবুল, দোলনসহ অনেকে। পাকবাহিনী সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের উপর। সেখানে শহীদ হয় টিটু। ধরে নিয়ে যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাকিদের। কিন্তু ছাত্র-জনতার বিক্ষিপ্ত আক্রমণের মুখে হানাদাররা পিছু হটতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে গেলে সুবিল ব্রিজ পার হয়ে মহিলা কলেজে আশ্রয় নেয় পাকবাহিনী। ঐ দিনই ছাত্রনেতা মুকুল, সাইদুল, রাজা প্রমুখ মিলে থানার প্রায় ৩০০ বন্দুক ও গুলি ছাত্র-জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেন।[২৭] পাকবাহিনীর পশ্চাৎপসারণে উল্লসিত হয়ে ওঠে বগুড়াবাসী, গাজীউল হকের ভাষ্য : 'রাস্তায় বেরিয়ে এলো বগুড়া শহরের লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিনে আমাদের ছেলেরা প্রাণ দিয়েছে। সে জন্যে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত। কিন্তু তার সঙ্গে মিলে আছে জয়ের আনন্দ। এক অভূতপূর্ব আস্বাদ। বর্বর হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করেছি আমরা। আমরা হটিয়ে দিয়েছি, জয়ী হয়েছি।'[২৮]

২৬ মার্চ ৩টার দিকে মহাস্থানে ব্রিজ ধ্বংস করার প্রাক্কালে ট্রাক ভর্তি পাকবাহিনী যাবার সময় আশপাশের বাড়ি-ঘরে আগুন দেয়। ব্রিজ অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন জিয়াউল হক খান মঞ্জু এবং গোলাম জাকারিয়া রেজা। সেদিন বিকেলেই একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন যোগাড় করে ফেলে স্বপন, চন্দন, ফজলার রহমান প্রমুখ। সেই মেশিনে ছেপে বুলেটিন বের করা হয় সন্ধ্যায়। হেডলাইন ছিল, 'প্রথমদিনের যুদ্ধে বগুড়াবাসীর জয়লাভ : পাঁচজন পাকসেনা নিহত'। সেই বুলেটিনে সর্বাত্মক যুদ্ধের আহ্বানও জানানো হয়।[২৯] এরই মধ্যে ডা. জাহেদুর রহমানের হস্তগত হয় ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ সংবলিত ওয়্যারলেস মারফত পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ২৬ মার্চ সন্ধ্যার পর শহরের বাদুরতলার এক বাড়িতে যুদ্ধ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাঁচ সদস্যের একটি হাইকমান্ড করা হয় : ১. অ্যাড. গাজীউল হক—যুদ্ধের দায়িত্ব, ২. ডা. জাহেদুর রহমান—খাদ্য ও চিকিৎসার দায়িত্ব, ৩. মাহমুদ হাসান খান—প্রশাসন, ৪. মোখলেসুর রহমান—যোগাযোগ, ৫. আবদুল লতিফ—প্রচার।[৩০]

২৭ মার্চ সকাল থেকেই মারমুখী হয়ে ওঠে পাকসেনারা। মহিলা কলেজে অবস্থান নেয়া পাকবাহিনী সুবিলের উত্তরপাড় থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সুবিলের দক্ষিণপাড়ে অবস্থান নেয়া সংগ্রাম পরিষদের সশস্ত্র কর্মীরা পাল্টা গুলি ছুঁড়ে। এরই মধ্যে ডা. জাহেদুর রহমান পুলিশ লাইন থেকে কিছুসংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়ে হাজির হয়। পাকবাহিনীর মেশিনগানের গোলার মুখে পুলিশ সমর্থিত সংগ্রাম পরিষদের প্রতিরোধ কোনো অংশেই কম ছিল না। তার প্রমাণ সেদিনও কটন মিলের সীমানা ছাড়িয়ে শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে নি পাকবাহিনী। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে সেদিন শহীদ হয় তারেক। এ সম্পর্কে গাজীউল হক বলেন : 'বিকেল ৩টায় মর্টারের গোলার আঘাতে শহীদ হলো তারেক, দশম শ্রেণীর ছাত্র—মৃত্যুর সময়েও তার হাতে ধরা ছিলো একটি একনলা বন্দুক। তারেকের রক্তে ভিজে গিয়েছিল আমার বুক। মনে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছিলাম।'[৩১] পুলিশ বাহিনীর সদস্য ছাড়া সেদিনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন মাসুদ, গোলাম রসুল, গোলাপ, রফিকুল ইসলাম লাল, আবু

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়ান রানা (পরে শহীদ হন), ঝন্টু, মাহমুদ, টি. এম. মুসা পেন্তা, ফারুক, শোকরানাসহ অনেকে।[৩২] সেই তারিখেই বাদুরতলায় চালু করা হয় একটি খাদ্য ও চিকিৎসা কেন্দ্র। খাদ্য ক্যাম্পের দায়িত্ব দেয়া হয় কমিশনার আমজাদ হোসেনকে। এই ক্যাম্প থেকে সশস্ত্র যোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করা হত। এ কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মোশাররফ হোসেন মণ্ডল, আবেদ আলী, আবু মিয়া, মজিবর রহমান এবঙ আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটি তত্ত্বাবধান কমিটি গঠন করা হয়। চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডা. কহিরউদ্দীন তালুকদার। তার সঙ্গে ডা. হাবিবুর রহমানও কাজ করেন। ডা. কহিরউদ্দীন তখন ডক্টরস এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন এবং এর পূর্বে তিনি বগুড়া জেলা মুসলিমলীগের সভাপতি ছিলেন। মুসলিমলীগপন্থী হয়েও তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে কাজ করেছিলেন। '৭১-র মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় ২৩ মার্চ তিনি সাতমাথার মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেছিলেন।[৩৩] ২৭ মার্চ রাতেই বগুড়াবাসী জানতে পারে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জিয়াউর রহমান নামক একজন মেজর বেতারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন।[৩৪] ঐদিনই বগুড়ায় পাকবাহিনী আওয়ামী লীগ কর্মী মাহফুজার রহমানকে তাঁর মাটিডালীর বাড়িতে খুঁজে না পেয়ে তাঁর ভাইয়ের ছেলে রেজাউল ইসলাম ডাবলুকে ধরে নিয়ে বেয়নেটের আঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং কলেজ রোডস্থ প্রাক্তনমন্ত্রী ফজলুল বারীর বাড়িতে হামলা করে। সেই বাড়িতে ফজলুল বারী ও স্কুল শিক্ষক আবদুল হামিদকে গুলি করে হত্যা করে।

২৮ মার্চ বিকেল থেকে এক কোম্পানি ইপিআর বগুড়ায় যুদ্ধরত মুক্তিফ্রন্টের সঙ্গে যোগ দেয়। এই কোম্পানির দায়িত্বে ছিলেন নওগাঁর ইপিআর উইং-এর উপ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী। কিন্তু ঐদিন সকাল থেকেই পাকবাহিনীর গোলাবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধ চলতে থাকে। যার ধারাক্রম অনুযায়ী পাকবাহিনী বগুড়াবাসীর উপর ৩০ মার্চ কটন মিলের গেস্ট হাউসের ছাদ থেকে মেশিনগানের আক্রমণ চালায়। এদিকে বসে নেই প্রতিরোধ বাহিনী। তপন, মুকুল, বজলু, মিন্টু, ডিউক, সামাদ, মাসুদ, কেরামত, ধলু, হারুন, সাত্তার, রশীদ প্রমুখের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে গ্রামবাসী জনতা। দীর্ঘ বন্দুকযুদ্ধের মধ্যেই পাকবাহিনী শহরে প্রবেশের জন্যে ক্রলিং করে এগোতে থাকে। কিন্তু বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের সমর প্রধান গাজীউল হকের বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেদিনের মত বগুড়াকে রক্ষা করেছিল। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক বলেন :

> বেলা ডোবার একটু পর পাকসেনারা রেল লাইন পার হয়ে থানার মোড়ে পৌছালো। হতাশ হয়ে গেলাম, এবার বগুড়ার পতন নিশ্চিত প্রায়। জলিল বিড়ি ফ্যাক্টরির পেছনে এক ছোট বাড়িতে ছাত্রলীগের সামাদ, মাসুদ, কেরামত আলী গোরা আমরা কয়েকজন জড়ো হয়েছি। মাসুদকে দেখে

Dhaka University Institutional Repository

একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ২০ শে মার্চ রাতে মাসুদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান পটল আমাকে নিয়ে গিয়েছিল স্টেডিয়ামের কাছে তাদের তৈরি বোমার কার্যকারিতা দেখাবার জন্যে। দু'টি বোমা ফাটানো হল। সে কি বিকট আওয়াজ। কিন্তু হতাশ হলো সবাই, দেয়ালে একটু পর্যন্ত চিড় ধরে নি। ধ্বনি সর্বস্ব বোমা।

ঘটনাটা মনে আসতেই মাসুদের কাছে জানতে চাইলাম সেই বোমা আছে কি-না। সামাদ জানালো ২/৩ টি বোমা আছে। সামাদ এবং মাসুদ ছুটলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতবোমা দুটো নিয়ে এসে হাজির। বললাম যেমন করেই হোক দত্তবাড়ির উত্তরে যে কোন জায়গায় রাস্তার ওপর বোমা দুটো ফাটাতে হবে। এবং কিছু মুক্তিসেনা কাছাকাছি জায়গায় ফাঁকা গুলি ছুঁড়বে এবং সরে পড়বে।

শেখ ইনসান আলী সাহেবের বাড়ির উত্তর ধারে বোমা দু'টি ফাটানো হলো। সে কী বিকট শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে এলোপাতাড়ি কিছু একনলা দু'নলা বন্দুকের গুলির আওয়াজ। পেছন থেকে আক্রান্ত হয়েছে ভেবে সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে হানাদার সোনরা ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত পিছু হটে কটন মিলের গেস্ট হাউসে এবং সুবিলের উত্তর পাড়ের ঘাঁটিতে ফিরে গেল। সেদিনের মতো হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক আনাড়ি মুর্খ সেনাপতির রণকৌশলে বগুড়া শহর সেদিন পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।[৩৫]

অন্যদিকে কিছু পাকসেনা সদস্য দুপুরবেলা গ্রামের দিকে গিয়ে কিছু নিরীহ গ্রমাবাসীকে ধরে নিয়ে আসে। এদের কাউকে রাস্তার ব্যারিকেড সরাবার কাজে লাগায় আবার কাউকে কাউকে গুলি করে হত্যা করে।[৩৬] পাকবাহিনীর এ ধরনের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলে। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি পুড়ে দেয়া, জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া, অবলীলায় মানুষ হত্যা করাই ছিল তাদের কাজ। সারিয়াকান্দিতে এ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়, যুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকেই সেখানে নির্যাতনের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। অন্যদিকে ইপিআর আগমনের ফলে যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ইপিআর কমান্ডার এসে পুলিশ ইন্সপেক্টর ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিরোধ নয়, আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করেন।

২৯ মার্চের সকাল ছিল মুক্তিফ্রন্টের জন্যে শুভদিনের সূচনাপর্ব। কেননা এর আগের রাতেই পাকবাহিনী কটনমিলের আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে একধাপ পিছু হটে সুবিলের উত্তরপাড়ের মূল ঘাঁটিতে ফিরে যায়। সেদিন তারা বৃন্দাবন পাড়ায় হামলা চালায়। কিন্তু ইপিআর কমান্ডার কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত পন্থায় আক্রমণের ফলে পেট্রোলিং-এ বের হওয়া ৩টি গাড়িসহ পাকবাহিনীর সদস্যরা আক্রান্ত হয়। এতে অংশ নেয় ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্র জনতা।[৩৭] ৩০ মার্চ বগুড়ায় এসে পৌঁছাল মেজর নজমুল হক। প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য তিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডেকে পাঠান। শহরের উপকণ্ঠে নিশিন্দিরা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠক চলাকালেই বগুড়ায় বিমান হামলা শুরু হয়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি না-হলেও কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ে হাই কমান্ড।[৩৮] বিমান হামলায় বগুড়াবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হলেও এর কার্যকারিতার অপূর্ণতা দেখে আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে সবার মনোবল। সেদিনই মেজর নজমুল সার্কিট হাউসে কন্ট্রোল রুম বসানোর ব্যবস্থা করেন। ৩১ মার্চ পাকবাহিনী ও মুক্তিফ্রন্ট উভয় পক্ষই অঘোষিত যুদ্ধবিরতি পালন করে। কিন্তু পাকবাহিনীর এহেন বিরতির পেছনে কী বিষয় কাজ করছে তা বোঝা যায় নি। ঐদিন রাতের বেলা সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর আস্তানায় গ্রেনেড চার্জ করে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা কায়দায় আগুন ধরিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয় পাকবাহিনীর ঘাঁটি। এতে পাকবাহিনীর সদস্যরা বিহ্বল হয়ে পড়ে। এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে করতে তারা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের এই পলায়নের বিষয়টি কেউই আঁচ করতে পারে নি। এই ক'দিনে বগুড়ার ছাত্র-জনতা-পুলিশ-ইপিআর-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পাকবাহিনীর প্রায় ৪০ জন সৈন্য মারা যায়। এপ্রিল মাসের প্রথমদিন থেকেই বগুড়াবাসী অনুভব করে স্বাধীনতার স্বাদ। শত্রুবাহিনী শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় আনন্দে নেচে ওঠে সবাই। তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে পুনরায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। যার সদস্য এ কে মুজিবুর রহমান, ডা. জাহেদুর রহমান, মাহমুদ হাসান খান এবং গাজীউল হক।[৩৯] এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সেদিন থেকেই সেন্ট্রাল স্কুল মাঠে প্রাক্তন সৈনিক দরিবউদ্দীন ও আবু সুফিয়ান (পরে শহীদ) এবং করোনেশন স্কুলে হাবিলদার এ.কে.এম সামছুল হকের অধীনে ছাত্র-জনতার ট্রেনিং শুরু হয়। এই ট্রেনিং কার্যক্রমের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ডা. জাহেদুর রহমান। সেই রাতেই সুবেদার আকবর আড়িয়াবাজার ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক গাজীউল হকের কাছে। সেদিন এই সমরনায়ক বলেছিলেন : চলুন। মোট ১০৯ জন যোদ্ধা নিয়ে তিনদিক থেকে ঘেরাও করা হল আড়িয়া বাজার ক্যান্টনমেন্ট। এর মধ্যে ৫০ জন পুলিশ, ৩৯ জন ইপিআর এবং ২০ জন মুক্তিসেনা।[৪০] আড়িয়াবাজার আক্রমণ বিষয়ক পরিকল্পনা পূর্বেই হয়েছিল : 'বগুড়াতে তখন একটা অ্যামুনিশন ক্যাম্প ছিল। বেটা একজন ক্যাপ্টেন কমান্ড করছি। ওখানে মাত্র ২০/২৫ জন সৈন্য প্রহরা দিচ্ছিল। আমি সবাইকে কীভাবে অ্যামুনিশন ডাম্প দখল করতে হয় তার ব্যবস্থ করি।'[৪১] ঐদিন বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ আড়িয়াবাজার ক্যান্টনমেন্ট তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে মুক্তিফ্রন্ট। দুইপক্ষে শুরু হয় গোলাগুলি। এরইমধ্যে আবার পাকবাহিনীর বিমান আক্রমণ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনীর সুবিধার্থে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীর মরিচের গুঁড়া ছিটানোর ফলে দুপুর নাগাদ সাদা পতাকা তুলে ক্যাপ্টেন নূর। কিন্তু বীরযোদ্ধা মাসুদের মৃত্যুতে থমকে দাঁড়ায় সবাই। ক্যাপ্টেন নূরসহ ৬৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে ২১ জন পাঞ্জাবি সৈন্য ছিল। জনতার দাবি আর

Dhaka University Institutional Repository

জনরোষের কাছে রক্ষা পায় নি পাক সৈন্যরা। সেখান থেকে ৫৮টি ট্রাক ভর্তি অ্যামুনিশন পাওয়া গেলেও ব্যবহারের অস্ত্র ছিল না। এছাড়া কিছু চায়নিজ রাইফেল ও গুলি পাওয়া যায়। প্রাপ্ত এসব অ্যামুনিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরবর্তী সময়ে ভারতে পাঠানো হলে জানা যায় সেগুলো ছিল ১০৫ গান ও আর আর-এর অ্যামুনিশন।[৪২]

এদিকে বগুড়া শহরকেন্দ্রিক পাকবাহিনীর এই আক্রমণও প্রতিরোধ চললেও অন্যান্য থানায়ও চলছিল প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের নির্যাতন ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট। ফলত, অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও বামপন্থী রাজনীতিবিদগণ বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে পাড়ি জমান। এরই মধ্যে রাস্তার ব্যারিকেড ও টহল অব্যাহত থাকে। বগুড়ায় প্রবেশের দুই আলাদা রাস্তায় বসানো হয় আলাদা চৌকি। একদল বগুড়া থেকে নগরবাড়ি পর্যন্ত, অন্যদল বগুড়া থেকে রংপুর সড়কের কাটাখালি ব্রিজ পর্যন্ত। নগরবাড়ি অংশের দায়িত্বে ছিলেন হাবিলদার দবিরউদ্দিন, ডিপু, আবু সুফিয়ান, ওয়ালেছ, কিছলু, নবেল, আলভী, বুলু, রশীদ প্রমুখ। অন্যদিকে কাটাখালি অংশের দায়িত্বে ছিলেন তারিকুল আলম, খাজা সামিয়াল, রহমত আলীসহ ইপিআর বাহিনী।[৪৩]

পাবনার এসপি জনাব সাঈদ ২ এপ্রিল বগুড়া এসেছিলেন। তিনি রাইফেলের কিছু গুলি নিয়ে যান। তবে জানিয়ে দেয়া হয় যেমন করেই হোক ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে মুক্তাঞ্চল বগুড়ায় নিয়ে আসতে। এরই মধ্যে ৩ এপ্রিল বগুড়ায় এসে পৌছালেন কেন্দ্রীয় নেতা জনাব কামরুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ। ডা. মফিজ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এদের ভারতে পাঠানো হয়।[৪৪] ৪ এপ্রিল তরিকুল আলম, ছামিয়াল, রহমান মালী, সামাদসহ কয়েকজন মিলে পাকবাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত চলাচল রোধকল্পে কাটাখালি ব্রিজ ধ্বংস করতে গেলে গ্রামবাসীর বাধার মুখে তারা ফিরে আসে। তারপর দিন রাতে ব্রিজের কিছুটা এরা ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। এদিনই বগুড়া পৌছান ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী। সঙ্গে ছিলেন পাবনার এমপি আবু সাঈদ। সেখান থেকে বিএসএফ-এর সহায়তায় ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে পাঠানো হয় ভারতে আশ্রয় নেয়া নেতা তাজউদ্দিন আহমদের কাছে।[৪৫] এ মাসের ৫ তারিখে মেজর নজমুল হক বগুড়া আসেন। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য জেলা প্রশাসকের বাসভবনে মিটিং বসে। সেই মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়, যদি রংপুর ক্যান্টনমেন্ট দখল করা যায়, তবে সমগ্র উত্তরাঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসবে। সেই লক্ষ্যে বিএসএফ-এর সহায়তা পাবার জন্য বগুড়ায় যুদ্ধ পরিচালনা কমিটির দুই সদস্য গাজীউল হক ও ডা. জাহেদুর রহমান হিলি সীমান্তে বিএসএফ-এর ব্রিগেডিয়ার চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে যান পরের দিন ৬ এপ্রিল। দুই পেটি রাইফেলের গুলি আর ১৬ এপ্রিল দেখা করার অনুমতি নিয়ে ৭ এপ্রিল বগুড়ায় ফিরে আসেন তারা।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ৯ এপ্রিল কলকাতা বেতারে বলা হয় পাকিস্তানি বাহিনী আরিচা-নগরবাড়ি-পাবনা হয়ে বগুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১০ এপ্রিল বগুড়ায় সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো জয়। ১১ এপ্রিল বগুড়া থেকে দুই ট্রাক ইপিআর ও পুলিশ পাবনা হয়ে নগরবাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে। সেখানে পাবনার বেড়া নামক স্থানে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয়।[৪৬] ১২ এপ্রিল নগরবাড়ি অপারেশনের উদ্দেশে একে শামসুল হকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি দল বগুড়া থেকে রওনা দেয়। এই দলে ছিলেন আবদুল জলিল, আতাউর রহমান, তোজাম্মেল হোসেন, ফেরদৌস জামান মুকুল, রাজু, বজলুর রহমান, নঈম, বুলবুল, বিমান, দুলু প্রমুখ। এরা ১৬ এপ্রিল বগুড়ায় ফিরে আসেন।[৪৭] এর আগেই ১৪ এপ্রিল খবর আসে আড়িয়াবাজার ক্যান্টনমেন্টে প্রাপ্ত অ্যামুনিশন নিয়ে হিলিতে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে দেখা করতে। সে মতে ১৬ এপ্রিল আসাদুজ্জামান, এম আর আখতার মুকুল, ডা. জাহেদুর রহমান, গাজীউল হক, এ.কে. মুজিবুর রহমান হিলি যান। সেখান থেকে তারা ১৯ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং বগুড়ার অবস্থা তাদের জানান। অন্যদিকে ১৮ এপ্রিল হাবিলদার একেএম সামছুল হকের নেতৃত্বে কাহালু থানার সমান্তহার গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেন। বগুড়ায় যুদ্ধ পরিচালনা কমিটির অনেকেই যখন ভারতে তখন বগুড়াস্থ স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের শাখা লুট হয়। এই ঘটনা নিয়ে এখনও মতবিরোধ আছে। কারও মতে এটা 'ব্যাংক-লুট' আবার কারও মতে এটা 'ব্যাংক আক্রমণ'। তবে জানা যায় এখানে প্রাপ্ত অর্থের অংশ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবাসী সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তবে তার সামান্যই সেখানে পৌঁছে। পথিমধ্যেই অধিকাংশ টাকা লুট হয়ে যায়।

অনেক অত্যাচারী বিহারির বাড়ি, দোকানপাট লুট হয় বগুড়া শহর, শান্তাহার, জয়পুরহাট এবং পাঁচবিবিতে। অনেক বিহারিকে বন্দি করে হত্যা করা হয়। পুকুরে ফেলে দেয়া হয়, শান্তাহারে কয়েকটা পুকুর আছে যেখানে শত শত বিহারিকে হত্যা করে ফেলে দেয়া হয়।[৪৮]

আবার অন্য একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : 'চূড়ান্ত বিজয় সমাসন্ন, এখন সকলকেই আরও বেশী হুশিয়ার থাকিতে হইবে। অনৈক্য, অরাজকতা, হিংসা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কোনমতেই বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া চলে না। [...] আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলেই দেশের মঙ্গল ও জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন। মুক্ত অঞ্চলসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যাহা করা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলেই সেদিকে নজর দিবেন।'[৪৯]

যুদ্ধের শুরুর দিকে এপ্রিল মাসেই এ ধরনের সংবাদ পরিবেশনে নিঃসন্দেহে দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বগুড়া থেকে বিতাড়িত পাকবাহিনী আত্মসম্মান রক্ষার স্বার্থে ২৩ এপ্রিল পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

ট্যাংক ও বিমানসহ আক্রমণ করে বগুড়া দখল করে নেয়। সেদিন থেকেই বগুড়ায় শুরু হয় পাকবাহিনীর অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, আর গণহত্যা।

লুণ্ঠন, হত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন থেকে দেশের মানুষকে এবং দেশকে রক্ষার জন্য সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে কাজ করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় সেই তৎপরতা লক্ষ করে পাকবাহিনী দেশব্যাপী নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল মাসের ১৯/২০ তারিখের দিকে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হাই কমান্ডের কাছ থেকে খবর আসে যে, পাকবাহিনী বগুড়ায় সাড়াশি আক্রমণ চালাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা যে যতটুকু পারে তাই নিয়ে ভারতে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। মুক্তিযোদ্ধারাও সে মতো প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। ২২ এপ্রিল শুক্রবার পাকবাহিনী বগুড়া দখল করে নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যায়। এরপরে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ কেউ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে, কেউ-বা একা আবার অনেকেই ২/৪ জন বন্ধু-বান্ধব মিলে ভারতে গিয়েছে। বগুড়া জেলার মুক্তিযোদ্ধারা সাধারণত দুই পথে ভারতে যেত। জয়পুরহাটের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে পায়ে হেঁটে অথবা গরুর গাড়িতে করে এবং সারিয়াকান্দি থানার হাটশেরপুর, আওলাকান্দি এসব এলাকা থেকে নৌকা যোগে মাইনকার চর হয়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনার জন্য আসামের মাইনকার চর এলাকায় এবং ভারতের বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকায় বেশ কিছু ইয়ুথ ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। পশ্চিম দিনাজপুরের চেঙ্গিসপুরে সর্বদলীয় উদ্যোগে প্রথমে স্থাপন করা হয় ইয়ুথ ক্যাম্প। এই ইয়ুথ ক্যাম্পে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করার পরপরই মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিত এবং প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। এছাড়াও পশ্চিম দিনাজপুরের কামারপাড়ার সন্নিকটে খোলা হয়েছিল আরেকটি ইয়ুথ ক্যাম্প সোবরা। এখানেও প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। প্রশিক্ষণ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হতো রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, শিলিগুড়ির পালিঘাটা প্রভৃতি স্থানে। এসকল স্থানে ২৮/২৯ দিনের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় ইয়ুথ ক্যাম্পে ফেরত আনা হত এবং এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠানো হতো ৭নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার তরঙ্গপুরে। তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় জয়পুরহাটের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা হয়ে এবং আসামের মাইনকার চর থেকে সারিয়াকান্দির হাটশেরপুর আওলাকান্দি হয়ে বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করতো।

ইয়ুথ ক্যাম্পে যাবার পর স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের শনাক্ত করা হতো। কোন এলাকার জনপ্রতিনিধি না-থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে শনাক্ত করা হতো। কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার এবং অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। ডা. জাহেদুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান ছিলেন এখানকার মেডিক্যাল ইনচার্জ। এছাড়া আসামের মরণটিলা ও এর আশেপাশেও কিছু ট্রানজিট ক্যাম্প বা ইয়ুথ ক্যাম্প ছিল। এই সকল ক্যাম্পগুলি ছিল প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং রিক্রুটমেন্টের জন্য। এখানে সকল দলমত নির্বিশেষে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে প্রথমে রিক্রুট করা হতো। কিছুদিন অর্থাৎ ১০ থেকে ১৫ দিন এখানে রাখা হতো। এরপর কেন্দ্রীয় নেতারা ছাত্রলীগের ছেলেদের বিএলএফ ট্রেনিং-এর জন্য হাফলং এবং দেরাদুনে পাঠিয়ে দিত। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ নেতারা ছাত্র ইউনিয়ন এবং বামধারার ছেলেদের বালুরঘাট ট্রেনিং সেন্টারে পাঠিয়ে দিত। অপর মুক্তিযোদ্ধাদের শিলিগুড়ির পানিঘাটা, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জে পাঠানো হতো।

শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে ছাত্রলীগের ছেলেদের রিক্রুট করে নিয়ে যেত জলপাইগুড়ির পাঙ্গায়। এখানে ব্রিটিশদের নির্মিত এয়ারপোর্টকে কেন্দ্র করে একটা মিলিটারি হাইও আউট ছিল। এটাকে মুজিব বাহিনীর ট্রানজিট ক্যাম্প বলা হতো। এই ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে দেরাদুন এবং হাফলংয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হতো। এখানে ট্রেনিং প্রাপ্তদের বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী বলা হতো। ট্রেনিং শেষে মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের পুনরায় পাঙ্গায় জমায়েত করা হতো। এখান থেকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হতো। আবার কেউ কেউ দেরাদুন কিংবা হাফলং-এর ট্রেনিং শেষ করে পুনরায় শিলিগুড়ির পানিঘাটায়ও ট্রেনিং নিয়েছিলো। মুজিব বাহিনীর ছেলেদেরকে গেরিলা ট্রেনিং-এর পাশাপাশি পলিটিক্যাল মোটিভেশনের ট্রেনিংও দেয়া হয়।[৫০]

অন্যদিকে ন্যাপের (মোজাফফর) উদ্যোগে কালুরঘাট মাহিপুর বিমান ঘাঁটির সন্নিকটে ভাঙ্গা বিজয়শ্রী স্কুলে স্থাপিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে মূলত ছাত্র ইউনিয়নসহ বামধারার মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। এখানে মূল ভূমিকা পালন করেন ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরী (বগুড়া জেলার ন্যাপ মোজাফফর সভাপতি) এবং মোখলেছার রহমান (সি.পি.বি নেতা বগুড়া)। সোহরাব হোসেন, সাদেক আলী, নূরুল ইসলাম প্রমুখ। দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইয়ুথ ক্যাম্প, ট্রানজিট ক্যাম্প খোলা হলেও অনেকসময় দেখা গিয়েছে যে কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেদের এসব ক্যাম্পে ভর্তি করা হচ্ছে না। তখন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আলাদা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে। অনেক মুক্তিযোদ্ধার জন্য তরঙ্গপুরের সেক্টর হেড কোয়ার্টারও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতে গমনের ক্ষেত্রে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দ উজ্জ্বল ভূমিকা রাখে। বগুড়ার

Dhaka University Institutional Repository

দেশপ্রেমিক এই কৃতিসন্তানগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করে যে-কর্ম ও উজ্জ্বলতার পরিচয় দিয়েছেন সে-কর্ম ও ত্যাগের ফলে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন—বাঙালির সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই অর্জন ও সাফল্য একদিকে আমাদেরকে আনন্দিত করে, আবেগাপ্লুত করে এবং সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে এর নেপথ্যের ত্যাগ, রক্তক্ষয়ী লড়াই, মা-বোনের ইজ্জত ও সম্পদের বিনষ্টি আমাদেরকে আক্রান্ত করে সমভাবে—আমরা আশান্বিত হই, হাজারো কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

পাকবাহিনীর অত্যাচার, পাকিস্তান সরকারের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণ ও নির্মমতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে ঝড় তোলে, সেই ঝড় অসহযোগের মধ্য দিয়ে প্রলয়ঙ্করী মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়—দেশের সর্বস্তরের জনগণ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যার হাতে যা ছিলো তাই নিয়ে অকুতোভয়ে সম্মুখ যুদ্ধে নেমে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাগণ পাকবাহিনীর নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্য বগুড়া সদর, শেরপুর, জয়পুরহাটসহ শহর, গ্রাম-গঞ্জ ও প্রত্যন্ত এলাকায় স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিংক্যাম্প স্থাপিত হয়। জয়পুরহাট বিশেষত, হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতের বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ হয়ে শিলিগুড়ি, হাফলং, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানে উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য এদেশের সাধারণ জনগণ, ছাত্র, যুবক গমন করেন এবং আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির অনেক নেতা-কর্মী বগুড়া হয়ে হিলি সীমান্ত দিয়ে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য নিয়ে ভারতে গমন করেন। তারা ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ার মানুষ, প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সকল উপাদানকে সহায়ক করে তুলেছিলেন বগুড়ার সচেতন, দেশপ্রেমিক জনগণ। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ার ভূমিকা উজ্জ্বলতার স্বাক্ষরবাহী।

একথা অনস্বীকার্য যে, মুক্তিযুদ্ধকালে প্রাথমিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বগুড়ার জনগণ ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছে। বগুড়ার মুক্তিকামী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের ফলে এপ্রিল মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত বগুড়া হানাদার মুক্ত থাকে। এই সুযোগে বগুড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিংক্যাম্প স্থাপন করে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তারা বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নগরবাড়ী ফেরিঘাটসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত পাকবাহিনীকে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। যার ফলে উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ জেলাগুলো প্রাথমিকভাবে হানাদার মুক্ত থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশল ও রণনীতিতে পাকবাহিনী বিভ্রান্ত এবং প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। এই ক্ষিপ্রতা পরবর্তীতে মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর বিভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা সংঘঠিত হতে থাকে—পরবর্তীকালে এই কৌশল যুদ্ধজয়ের জন্য ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. সাক্ষাৎকার, আমানউল্লাহ খান (সাবেক সংসদ সদস্য ও সাংবাদিক, বগুড়া), ২০ জুন ২০০৬।

২. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *দুই শতাব্দীর বুকে বগুড়া (বগুড়ার ইতিহাস)*, ১ম খণ্ড, ১৯৭৬, প্রজাবাহিনী প্রেস, বগুড়া, পৃ. ১৪৮।

৩. তৌফিক হাসান ময়না, '২৫ মার্চে প্রতিরোধের যুদ্ধে বগুড়া, *মুক্ত প্রাণের আভা*, বিজয় দিবস ২০০৭, জেলা প্রশাসন বগুড়া, পৃ. ৫৭-৬০।

৪. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৫. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট স্বপন গুহ রায়, সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, বগুড়া, ২৯ মার্চ ২০০৬। পিতা : শংকর গুহ রায়, চেলোপাড়া, বগুড়া। ব্যক্তিজীবনে আইন ব্যবসা করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন। দেশের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার জন্য কাজ করেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না-পারলেও অবকাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়নকল্পে বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধে তার নাম অগ্রগণ্য। ১৯৬৬-র ৬ দফা সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে বগুড়ার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অবদান সম্পর্কে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৬. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।

৭. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস জামান মুকুল, (সাবেক সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রনেতা) বগুড়া, ২৮ মার্চ ২০০৬। পিতা : আইনুদ্দিন মিঞা, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ধনকুনিষ্ঠ, চান্দাইকোনা, শেরপুর, বর্তমান ঠিকানা : জলেশ্বরীতলা, বগুড়া। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রলীগ নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ২০/২১ বছরের যুবক ফেরদৌস জামান মুকুল অসম সাহসিকতায় বগুড়ার প্রত্যন্ত এলাকায় এবং বগুড়া শহরে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কাজে লিপ্ত ছিলেন। ট্রেনিং নিয়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছেন, দেশের মুক্তির ব্যাপারে সবসময়ই আশাবাদী ছিলেন। ৬৬-র ৬ দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭১-র মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ ও বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়।

৮. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

৯. *দৈনিক করতোয়া*, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪।

১০. সাক্ষাৎকার, সুবল চন্দ্র দাস, ৭ জানুয়ারি ২০০৭। কলেজ রোড, শেরপুর, বগুড়া। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে বয়স ৫৪ বছর। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ১৮ বছরের যুবক ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সুবল চন্দ্র দাস ১৯৭১ সালে শেরপুর ডি.জে হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ২৫ মার্চের নৃশংসতার পর বাড়ি-ঘর-সম্পদহারা সুবল চন্দ্র দাস পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে আশ্রয় নেন। স্থানীয় সহপাঠী বা সাধারণ জনগণ সেই সময়ে শেরপুরের সমগ্র হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক লুটপাট ও হত্যা চালায়। এ-কাজে পাকবাহিনী ও বিহারিরা অগ্রহণী ভূমিকা রাখে। অগ্নিসংযোগ, ইজ্জত হরণসহ পৈশাচিকতার শিকার হন শেরপুরের প্রগতিশীল মানুষ ও হিন্দু পরিবারবর্গ। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে আন্দোলন করেছেন শেরপুরবাসী।
ভারতে গিয়ে শেলুনবাড়ি-তেজপুর হয়ে শিলিগুড়িতে ২৮ দিন ট্রেনিং গ্রহণ করেন। বুড়িমাড়ি সীমান্তে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারপর দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধ করেন। মহাস্থান যুদ্ধ তার জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায়।

১১. কাফেজ উদ্দীন আহমেদ, 'জয়পুরহাটে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা', *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, (আবুল কাশেম সম্পাদিত), জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট, ১৯৯৯, পৃ. ৩৪-৩৫।

১২. সাক্ষাৎকার, আমজাদ হোসেন, ১ মে ২০০৮। গ্রাম : হায়াইল, পোঃ+থানা+জেলা : জয়পুরহাট। পেশা : ব্যবসা। ১৯৭১ সালে বি.এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-এর মহকুমা সভাপতি থাকাবস্থায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হন। ৬৮-৬৯-এর আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। জয়পুরহাট এলাকা পূর্ব থেকেই একদিকে প্রগতিশীল ও অন্যদিকে প্রগতিবিমুখতায় খ্যাত ছিল। তেভাগা আন্দোলন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহসহ নানা বিদ্রোহ সংগ্রাম যেমন হয়েছে এই এলাকায় তেমনি জামাত-শিবির, রাজাকার-আলবদর নেতৃত্বও ছিল প্রবল। এই উভয়বিধ টানাপড়েনের মধ্যেই তাঁরা দেশের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন জীবন বাজি রেখে। সাক্ষাৎকার প্রদানকালে জনাব আমজাদ হোসেন বৃহত্তর বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত জানা না-জানা অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা, জীবনবাজি রেখে হানাদার বিরোধী যুদ্ধাভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কাজে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. এ্যাডভোকেট মোমিন আহমেদ চৌধুরী, 'দেশে বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা : প্রেক্ষিত জয়পুরহাট', *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, (আবুল কাশেম সম্পাদিত), জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট, ১৯৯৯, পৃ. ২৫।

১৪. সাক্ষাৎকার, মোঃ আমজাদ হোসেন, ১ মে ২০০৮।

১৫. সাক্ষাৎকার, একরামুল হক, ৩০ এপ্রিল ২০০৮।

১৬. সাক্ষাৎকার, মীর শহীদ মণ্ডল, মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

১৭. মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।

১৮. সাক্ষাৎকার, আমিনুল হক বাবুল, ১ মে ২০০৮। ১৯৭১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পশ্চিম দিনাজপুরের হিলি থানায় একাধিক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালির জাগরণের কথা উল্লেখ করে বলেন : দলমত নারী-পুরুষ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমান সকলেই সাধ্যমতো মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। স্বল্প সময়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার নেপথ্যে সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে বলেন : আধুনিক সমরাস্ত্র ও ট্রেনিং সজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের নেপথ্যে অসম সাহস ও সকলের সাহায্যই বিজয়ের দাবীদার। বর্তমানে তিনি জয়পুরহাট জেলায় পাঁচবিবি থানায় স্টেডিয়াম মোড়ে বাস করছেন।

১৯. সাক্ষাৎকার, মীর শহীদ মণ্ডল মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

২০. *দৈনিক করতোয়া*, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪।

২১. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস জামান মুকুল, *প্রাগুক্ত*।

২২. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫০।

২৩. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০-১৫১।

২৪. সাক্ষাৎকার, গাজীউল হক, ৬ জুলাই ২০০৫।
ভাষা সৈনিক গাজীউল হক, মুক্তিযুদ্ধকালীন বগুড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জনাব হক-এর দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থেকে মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

২৫. সাক্ষাৎকার, মিসবাহুল মিল্লাত নান্না, ৫ মে ২০০৮। বর্তমান পেশা ব্যবসা, মুক্তিযুদ্ধকালে মোটর মেকানিক নান্নার বর্তমান বয়স ৬৮। বগুড়া শহরে বসবাসরত এই মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বগুড়াবাসীর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ প্রসঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ২৫ মার্চ রাতের সেই ভয়াল নির্মমতার কথা স্মরণ করে নান্না বলেন : আমরা গাছ কেটে উত্তর দিক রংপুর থেকে পাকবাহিনীকে বগুড়া শহরে প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে প্রাথমিকভাবে বগুড়াবাসীকে রক্ষা করেছিলাম। পরবর্তী পর্যায়ে ১ মাস বগুড়া মুক্ত ছিল। এই মুক্ত থাকার পেছনে আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ বিরাট কাজে লেগেছে। বগুড়া ও বগুড়ার প্রত্যন্ত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত কথা বলেন।

২৬. সাক্ষাৎকার, এনামুল হক তপন, ১ এপ্রিল ২০০৬। বড়গোলা বগুড়া মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে তপন বলেন, বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিরোধ বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ট্রেনের মধ্যে পজিশন নিয়ে একটি রিভলবারের মাধ্যমে পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। মার্চ থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত বগুড়ার মুক্ত থাকা ও মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২৭. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস জামান মুকুল, *প্রাগুক্ত*।

২৮. গাজীউল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : নবম খণ্ড, সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩, পৃ. ৪৮৪।

২৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৪।

৩০. সাক্ষাৎকার, কমরেড মোখলেসুর রহমান, বগুড়া, ২৭ মার্চ ২০০৬। বাম-রাজনীতির একজন পুরোধা ব্যক্তি। ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরী, কমরেড সুবোধ লাহিড়ী, আব্দুল মতিনসহ অনেকের রাজনৈতিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বগুড়াসহ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাম-ধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শ্রমিক-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম, স্বাধীনতা প্রত্যাশা, ৬ দফা, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। শুধু আওয়ামী লীগ কিংবা ছাত্রলীগ নয়, তৎকালে বগুড়ায় বাম-ধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ হয়েছিল—সার্বজনীনতা পেয়েছিল। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন।

৩১. গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, দলিল, খণ্ড-৯, পৃ. ৪৮৬।

৩২. সাক্ষাৎকার, শোকরানা, ৫ এপ্রিল ২০০৬। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রনেতা, সরকারি আযিযুল হক কলেজের ইন্টারমেডিয়েট ক্লাসের ছাত্র, ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী শোকরানা বগুড়া শহরের ছিলিমপুরের জনাব আব্দুস সামাদের পুত্র। পাকসরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছাত্র-উইং-এ কাজ করার দায়িত্ব পড়ে তার উপর। ১৯৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না-করায় দেশব্যাপী জনমনে সন্দেহের দানা বাধে—পাকসরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব ক্রমশ প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের নির্দেশে বগুড়াতেও ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল নেতা ও কর্মীরা অসহযোগের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত বগুড়াকে সক্রিয় ছাত্র-জনতা মুক্ত রাখে। গান্ধা বন্দুক দিয়ে পাকবাহিনীকে ১ মাস আটকে রাখার অদম্য সাহসিকতা বগুড়াবাসী প্রদর্শন করে। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। আর শোকরানা ছিলেন বগুড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা। বগুড়ার যুদ্ধ, ভারতে ট্রেনিং গ্রহণসহ আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন শোকরানা।

৩৩. জেব-উন-নেসা জামাল, *আমার বাবা : স্মৃতি ১৯৭১*, (রশীদ হায়দার সম্পাদিত) ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৭১।

৩৪. গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, দলিল, খণ্ড-৯, পৃ. ৪৮৬।

৩৫. ঐ, পৃ. ৪৮৭।

৩৬. সত্যেন সেন 'বগুড়ার ছাত্রদের অভিনন্দন জানাই', *প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭১, পৃ. ৮৪।

৩৭. সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৮-৪৯।

৩৮. গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, দলিল, খণ্ড-৯, পৃ. ৪৮৮।

৩৯. এ.কে. মুজিবুর রহমান, *রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা*, বগুড়া, প্রকাশক : মিসেস মিনু রহমান, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ৫১।

৪০. গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, বগুড়া দলিল, খণ্ড-৯, পৃ. ৪৮৯।

৪১. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *উত্তর জনপদে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬।

৪২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, খণ্ড-৯, গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯০।

৪৩. এ. জে. এম. সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৪৪. দলিল, খণ্ড-৯, গাজীউল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯০।

৪৫. সাক্ষাৎকার, এ.কে. মুজিবুর রহমান, বগুড়া, ২ এপ্রিল ২০০৬।

৪৬. এ. জে. এম. সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

৪৭. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস জামান মুকুল, *প্রাগুক্ত*।

৪৮. সাক্ষাৎকার, মমতাজ উদ্দীন, ৫ মে ২০০৬।

৪৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, খণ্ড-৬, জয়বাংলা, ৯ম সংখ্যা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

৫০. সাক্ষাৎকার, মান্না, শফিকুল আলম, মোঃ আঃ হামিদ, শোকরানা প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা একই কথা বলেছেন, ৫ এপ্রিল ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বগুড়ায় পাকবাহিনীর নির্যাতন, গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর

আয়তন ও জনবসতির দিক থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে বগুড়া ছোট জেলাগুলোর অন্যতম। উত্তরাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-বাণিজ্যের পীঠস্থান হিসেবে বগুড়ার খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঢাকা ও সর্ব উত্তরের বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বগুড়া মুখ-সড়কের ভূমিকা রাখে। ফলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী বগুড়ায় একাধিকবার ব্যাপক নির্যাতন ও গণহত্যা চালানোর বাড়তি সুযোগ পায়। উপরন্তু বগুড়ায় মুক্তিকামী জনতার প্রবল প্রতিরোধ ছিল বলেই মার্চ থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত বগুড়া শত্রুমুক্ত থাকে, ফলে পাকবাহিনী ক্রোধান্বিত হয়—পাকবাহিনী তাদের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য নির্বিচারে জনগণকে হত্যা করে এবং তাদের বৈষয়িক সম্পদ ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে। পাকবাহিনী বগুড়ায় যে গণহত্যা, নিপীড়ণ, নির্যাতন, লুট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে সে ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা কোনো ঘটনা নয়, তবে অনেকাংশেই ক্ষয়-ক্ষতির দিক থেকে এর ব্যাপকতা ছিল মারাত্মক।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বগুড়া জেলা শহর ও শহর-সংলগ্ন এলাকা পাকবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে বেশি। এই আক্রান্ত হওয়ার নেপথ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকাংশেই যুক্ত। কারণ—ঢাকা-রংপুর মহাসড়কটি বগুড়া জেলা শহরের বুকচিরে চলে গেছে উত্তরে দিনাজপুর, পঞ্চগড়, তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। তৎসময়ে বগুড়ার দক্ষিণে পাবনা জেলা বর্তমানে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে রংপুর, বর্তমানে গাইবান্ধা জেলা এবং পশ্চিমে নাটোর পূর্বদিকে জামালপুর জেলা অবস্থিত। বগুড়া জেলার পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যমুনা নদী। এছাড়াও বাঙ্গালি, করতোয়া, আত্রাইসহ অনেক নদী প্রবাহিত হয়েছে বগুড়া জেলার উপর দিয়ে। সড়ক পথে, নদীপথে এবং আকাশপথে—এই তিন পথেই পাকবাহিনী বগুড়ার মানুষকে আক্রমণ করেছে। পাকবাহিনীকে এই নির্মম কাজে সাহায্য করেছে বিহারি অবাঙ্গালি এবং এদেশীয় রাজাকার, আল-বদর, আল-শাম্‌স।

বগুড়া শহর আক্রমণের মধ্য দিয়ে পাকবাহিনীর নির্মমতার যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বেই বগুড়া শহরের বৃন্দাবনপাড়া রেস্ট হাউজ এবং ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন শহর 'পুণ্ড্রনগরী' বর্তমানের 'মহাস্থান' নামক স্থানে পাকবাহিনী বগুড়ার উত্তরের রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে ছাউনি স্থাপন করে। এই সেনা-ছাউনি স্থাপনের ফলে বগুড়ার সর্বস্তরের জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পাকবাহিনীর ছাউনি বসানোতে বগুড়ার সচেতন সংগ্রামী মানুষজন আসন্ন ঝড়ের আভাস অনুমান

Dhaka University Institutional Repository

করতে পেরেছিলো। কিন্তু দেশের মুক্তির জন্য ছিল তাদের মনে আশঙ্কা মিশ্রিত উত্তেজনা। ছাত্র-জনতাসহ মুক্তিকামী মানুষজন ঢাকা শহরের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো—তারা প্রতীক্ষায় ছিলো স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ অথবা পরামর্শের জন্য। এ সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা থেকে জানা যায় :

> ২৪শে মার্চ জনাব মুস্তাফিজুর রহমান (পটল) ও জনাব মতিয়ার রহমান ঢাকা হইতে ফোনে ছাত্রনেতা আব্দুস সামাদকে জানান যে, শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে, আগামী কাল হইতে দেশের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। এই খবর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ডি.আই.বি ইন্সপেক্টর জনাব শাহ মকবুল হোসেন সাহেব ও থানা অফিসার জনাব নিজামুল হক সাহেবকে জ্ঞাত করান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মকবুল হোসেন সাহেব পুলিশ লাইনে গিয়া আর.আই হাতেম আলী খান সাহেবের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এই আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় যে, কোনোক্রমেই অস্ত্রাদি পাক সেনার হাতে সমর্পণ করা হইবে না।[১]

বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বব্যঞ্জক সাহসিকতা মুক্তিকামী বাঙালিদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিসহ দেশের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং পাকবাহিনীকে পরাস্ত করার শপথে উদ্দীপ্ত হয় বগুড়াবাসী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়াবাসীর এই সাহসিকতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত যুগোপযোগী হিসাবে চিহ্নিত হয়।

নির্যাতন

পাকবাহিনী বগুড়া শহর ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকা আক্রমণ ও দখল নেওয়ার উদ্দেশে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন স্তিমিত করার মানসে বগুড়ার উত্তরের জনপদ রংপুর থেকে 'মহাস্থান'-এ পূর্বেই যে সেনা-ছাউনি স্থাপন করেছিল সেই ছাউনি থেকে শহরের দিকে আসতে থাকে। ইতোমধ্যে ২৫শে মার্চ রাত ১টায় ঢাকা থেকে ফোনে আরো জানানো হয় যে, রাত ১১টার সময় ঢাকার পুলিশ লাইন রাজারবাগ ও ই পি আর হেড কোয়ার্টার পিলখানা পাক সৈন্যরা আক্রমণ করায় উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। আরও জানা যায় যে, বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার পুলিশ লাইন আক্রান্ত হয়েছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে বগুড়া থেকে '[...] রংপুরে ফোন করিয়া লাইন পাওয়া যায় না। পরে গোবিন্দগঞ্জ থানায় ফোন করিলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংবাদ দেন যে, ৩২টি সৈন্য ভর্তি ট্রাক গোলাপবাগের উপর দিয়া বগুড়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে।' পাকবাহিনীর বগুড়ার দিকে আসার পথে সাধারণ মানুষজন সমবেত হতে থাকে। জনসাধারণ প্রতিরোধ-দেওয়াল গড়ে তোলার প্রস্তুতি

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। বগুড়া শহর-সংলগ্ন ঠেঙ্গামারা নামক স্থানে প্রতিরোধকামী জনতার উপর আকস্মিকভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে উত্তর দিক থেকে আসা পাকবাহিনী। এ সময় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী প্রতিরোধকর্মী গাছ কাটায় রত তোতা মিয়া নামক একজন রিকসাচালক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ধারণা করা হয় তোতা মিয়াই বগুড়ার প্রথম শহীদ।[২] তোতা মিয়ার আত্মহত্যাগের মধ্যদিয়ে শুরু হয় সংগ্রামী জনতার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ এবং পাকবাহিনী হটাও যুদ্ধ। ২৫ মার্চের কালরাত্রির পর পরই পাকবাহিনী সারা বাংলায় তাদের পূর্ব-পরিকল্পিত আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পাকবাহিনীর নারকীয় অত্যাচারের হাত থেকে বগুড়ায় শিশু-কিশোর-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা থেকে শুরু করে কোনো শ্রেণী পেশার মানুষই রেহাই পায় নি। ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে তাদের বিছানায়, কসাই নিহত হয়েছে তার ছোট্ট দোকানটিতে, নারী ও শিশু ঘরের ভিতর জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী পূর্ব-পাকিস্তানিদের একসঙ্গে জড়ো করে মারা হয়েছে। বাড়িঘর, বাজার দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়ে এদেশের মানুষকে নিঃস্ব করে পরনির্ভরশীল ও অস্তিত্বহীন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে পাকবাহিনী।[৩] পাকবাহিনী বগুড়ায় যে নিষ্ঠুর বর্বরতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় :

> ক. বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই একইভাবে এরকম হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা সংগঠিত হয়; খ. হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের ধরন প্রায় সর্বত্রই একই ধরনের ছিল; গ. বগুড়ায় যে গণহত্যা সংগঠিত হয় তা ঠাণ্ডা মাথায় সু-পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়; ঘ. হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার মতো বগুড়াতেও তাদের এই হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতায় সহযোগিতার জন্য অবাঙ্গালিদের ব্যবহার করে এবং আলবদর ও রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলে; ঙ. বগুড়া হত্যা ও লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে প্রধানত আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদেরকেই মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়; কাফের নিধনের নামে হত্যাকাণ্ড ও অগ্নি-সংযোগ সংঘটিত হয়; অবশ্য সাধারণ বাঙালি নারী-পুরুষও এই বর্বরতা থেকে রেহাই পায় নি; 'দুষ্কৃতিকারী', 'ভারতীয় চর', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বা 'কাফের' এই সন্দেহ ও অজুহাতে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়; চ. বগুড়ায় অবাঙালিরা লুট, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যাকাণ্ডে বিশেষ জড়িত থাকে; ছ. হত্যাকাণ্ডে সহায়তার জন্য পাক প্রশাসন 'শান্তি-কমিটি'কে ব্যবহার করে।[৪]

সমগ্র বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বগুড়ায় পাকবাহিনীর বর্বরতা বিচার করা যায়। দেশব্যাপী মানুষের উপর নির্মমভাবে যে কায়দায় নির্যাতন চালায় পাকবাহিনী ঠিক সেই কায়দায় এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় বগুড়াতেও। পাকবাহিনীর সকল নিষ্ঠুরতার নেপথ্যে পূর্ব-পরিকল্পনা বিদ্যমান। বগুড়ায় আওয়ামী লীগ ও প্রগতিশীল মুক্তিকামী সচেতন মানুষকে টার্গেট করে হত্যা ও নির্যাতন চালানো হয়। ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষক-যুবক-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ কেউই পাকবাহিনীর নির্যাতনের রোষ থেকে বাদ পড়ে নি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে লাঞ্ছিত, ধর্ষিত ও নির্যাতিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ বাঙালি নারী। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন, বিকারগ্রস্ত, নিকৃষ্ট এবং নিষ্ঠুর পাক হায়েনারা মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী নারীদের উপর চালিয়েছে তাদের বিকৃত যৌন লালসার ভয়ঙ্কর তাণ্ডব। পাকবাহিনীর অমানবিক আচরণ ও ভোগলিপ্সা থেকে মুক্তি পায় নি বগুড়ার মা-বোন। উপরন্তু এই তাণ্ডব থেকে নিষ্কৃতি পায় নি শিশু থেকে শুরু করে কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া কেউই। তারা স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে, বাবার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। বর্বর পাক হানাদারেরা অনেক সময় মা, মেয়ে, শাশুড়ি, পুত্রবধূ সবাইকে এক সঙ্গে ধর্ষণ করেছে। পাকবাহিনী তাদের এদেশীয় দালাল-রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং বিহারিদের সহায়তায় বাঙালি মেয়েদের ধরে এনে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাতো। পাক-বর্বরেরা কত বিকৃত উপায়ে এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দেশব্যাপী বাঙালি মেয়েদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায় ড. মোহাম্মদ হাননানের লেখা থেকে :

> [...] উন্মত্ত নরপিশাচ পাকিস্তানি সেনাদল বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা মেয়েদের পাগলের মতো ধর্ষণ করতো, আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিতো। ওদের উদ্ধত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসতো, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমড়ের মাংস ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে যেতো।
>
> যে সকল বাঙালি যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করতো, তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবি সেনারা ওদের চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারাল ছুরি ঢুকিয়ে পবিত্র দেহটি ছিন্নভিন্ন করে দিতো। অনেক পশুসেনা ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দুপা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিত।
>
> উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররাও মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মত দুই হাত নাচাতে নাচাতে উলঙ্গ বালিকা, যুবতী মেয়েদের পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করতো। কাউকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয়নি, উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পরের দিন এসকল মেয়ের লাশ অন্যান্য জীবিত মেয়েদের সামনে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিতো। [...][৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন নারী। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকসেনা ও রাজাকার-আলবদর-আল্-শাম্স ও এদেশীয় নারীলোভী, অর্থলোভী, ক্ষমতালোভীদের দ্বারা শত সহস্র নারী ধর্ষিতা হয়েছেন, নির্যাতিতা হয়েছেন আবার স্ত্রী হিসেবে নারী হারিয়েছেন তার স্বামীকে, মা হিসেবে হারিয়েছেন তার পুত্র, বোন হিসেবে হারিয়েছেন ভাইকে, অসংখ্য নারী অভিভাবক হারিয়েছেন, হয়ে পড়েছেন নিঃস্ব, রিক্ত, অসহায়।

বৃহত্তর বগুড়া জেলাতেও পাকবাহিনী ব্যাপক নারী নির্যাতন চালিয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছে আড়াই হাজার নারী।[৬] পাকসেনারা ওয়াপদা রেস্ট হাউজ, এতিমখানা, মালগ্রাম, মুরইল, বৃন্দাবনপাড়া, ফুলবাড়ি প্রভৃতি স্থানে অগণিত বিবাহিত নারী ও কুমারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে।

বগুড়ার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ছিল পাকসেনাদের ক্যাম্প। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেয়েদের ধরে এনে পাশবিক নির্যাতন করা হতো। মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল বাকী ও আব্দুল জলিল জানান : 'যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বগুড়া মুক্ত হবার পূর্ব মুহূর্তে আমরা ঐ ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলে পাকবাহিনী পিছু হটে যায়। তখন পাকসেনাদের ছেড়ে যাওয়া বাঙ্কারগুলোতে বেয়নেট চার্জে নিহিত অনেক মেয়ের লাশ দেখতে পাই। লাশগুলো তখন বিবস্ত্র অবস্থায় ছিল। ফুলবাড়ির একটি বাঙ্কারে আমরা দশ পনের জন মেয়ের লাশ দেখি যাদেরকে পাকবাহিনী ধর্ষণের পর বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।'[৭] ফলে বগুড়ায় পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের নারী নির্যাতনের যে ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে উঠেছে সে চিত্রে দেখা যায় যে, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর নারীই হায়েনাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে : 'চন্দন বাইশা গ্রামের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীকে খান সেনারা জোর করে ধরতে গেলে স্বামী তার স্ত্রীর উপর অত্যাচারের ভাব দেখে সহ্য করতে না পেরে তাকে আঘাত করে। খান সেনা তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং মাটিতে চাপা দেয়।'[৮] এছাড়াও বগুড়া শহরের একটি মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের তিনজন যুবতীকে (এর মধ্যে দুইজন বিবাহিতা) পাকবাহিনী পাকড়াও করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে ধর্ষণের পর ২৪ ঘণ্টা পরে ছেড়ে দেয়। অপর একটি ঘটনা থেকে জানা যায় সিগতরা গ্রামের জনৈক বিবাহিতা যুবতীকে পাকসেনারা অপহরণ করে এবং বগুড়া ক্যাম্পে তিনদিন আটক রেখে অবিরত ধর্ষণ করে।[৯] সেই সময়ে এক কিশোরী এস.এস.সি পরীক্ষা দেবার জন্য বগুড়া শহরে আসার পথে পাকবাহিনী তাকে শিবিরে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির পর পরদিন মুমূর্ষু অবস্থায় ফেরত দেয়। বগুড়া শহরের সুলতানগঞ্জের কুখ্যাত দালাল লিয়াকত আলী মেরিনা নামের ১৭ বছরের এক যুবতীকে ধরে নিয়ে যায় এবং পাকসেনা শিবিরে তাকে সেলামী দেয়। দীর্ঘ দেড়মাস তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালাবার পর সৈন্যরা আবার তাকে লিয়াকতের কাছে ফিরিয়ে দেয়। এরপর দালাল লিয়াকত তার উপর কয়েক মাস পাশবিক নির্যাতন চালায়। পাকবাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসমর্পণ করলে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অত্যাচারে দারুণভাবে ক্লিষ্ট এই যুবতীকে উদ্ধার করেন। তাঁরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বিত যুবতীটি সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান। পাকবাহিনীর নির্যাতনের শিকার দুপচাচিয়ার ফটিক কুণ্ডু এবং তার পরিবারবর্গ। ফটিক কুণ্ডুর নাতনী ছাড়া পরিবারের সবাইকে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করে। যুবতী নাতনীটিকে এক অবাঙালি মুসলমান জোরপূর্বক বিয়ে করে।[১০] উল্লেখ্য যে, বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী লতিফাকে তাঁর কলেজ হোস্টেল থেকে ধরে নিয়ে অড়িয়া ক্যাম্পে আটক রেখে বিশ পঁচিশ দিন যাবৎ পাশবিক নির্যাতন চালায়। প্রথমদিকে তাঁকে কেবল অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য রাখা হলেও পরবর্তীতে সেপাইরাও তাঁর ওপর যখন তখন নির্যাতন চালাতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প আক্রমণ করে তাকে উদ্ধার করার সময় তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায়। উপর্যুপরি নির্যাতনের শিকার হয়ে লতিফা নাম্নী কলেজ ছাত্রী অজ্ঞান ছিলেন বলেও জানা যায়। তাঁর গণ্ডদেশ এবং স্তনে দংশনের অসংখ্য চিহ্ন ছিল। তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন।[১১]

পাকসেনারা ক্রমশ মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা নিত্যদিনের নির্যাতনের তালিকায় নারী নির্যাতনকে প্রাধান্য দিতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বগুড়া সার্কিট হাউসেও বর্বর পাকবাহিনী বিভিন্ন স্থান থেকে নারীদের ধরে নিয়ে এসে অত্যাচার করতে থাকে। এলাহী বক্সের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় : 'রাজশাহী ভার্সিটি থেকে ধরে আনা কয়েকজন ছাত্রী বসে বসে কাঁদছে। পাক সেনারা তাদের উপর অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার করে। তাদের সারা দেহে ধর্ষণের চিহ্ন বর্তমান।'[১২] নির্যাতনের পাশবিকতা সম্পর্কে ডাক্তার মোঃ হাবিবুর রহমান জানান : 'খান সেনারা গাবতলী তথা সুখানপুকুরের আশাপাশের সমস্ত জনগণের মনে ত্রাশ সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেক দিন তারা গ্রামাভ্যন্তরে ঢুকে মেয়েদেরকে জোর করে বা তাড়িয়ে ধরে পাশবিক অত্যাচার চালায়। কাউকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যেত। এদের প্রায়ই মার খেত।'[১৩]

বৃহত্তর বগুড়া জেলার জয়পুরহাটেও পাকবাহিনী ব্যাপক নারী নির্যাতন চালায়। জয়পুরহাট সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অনেক জেলার মানুষ এখান দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতে পালিয়ে যেত। পলায়নপর এসকল শরণার্থীকে ধরে পুরুষদের হত্যা করতো এবং নারীদেরকে বাঙ্কারে ধরে নিয়ে নির্যাতন করতো। প্রতিদিনই বিভিন্ন গ্রাম থেকে নারীদের ধরে আনত। তাদেরকে বিভিন্ন বাঙ্কারে আটকে রেখে দিনের পর দিন এদের উপর পাশবিক নির্যাতন করতো। পরবর্তীতে এসব মেয়েদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। স্বাধীনতার পর এসব বাঙ্কারের আশপাশ থেকে শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া গেছে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

পাকবাহিনীর নারী নির্যাতনের কাহিনী বাংলাদেশের মানুষকে আবেগাপ্লুত করে। শুধু আবেগ নয়, পাক-বর্বরতার কথা মনে হলে ঘৃণা, দ্রোহ, ক্লেদ ও গ্লানিতে ভরে ওঠে মন। এরকম একটি ঘটনা : মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা বগুড়ার শহর সংলগ্ন সাধল এলাকার টি.এন্ড.টি রেস্ট হাউজে ঢোকার পর দেখল যে ৫-৬ জন বন্দী যুবতী নারী। তালা ভেঙে তাদের কাছে যেতেই কান্নার শব্দে শিহরিত হয় চারদিক। বিবস্ত্র সেই যুবতী নারীগণ লজ্জায় মুখ ঢেকে বৃন্দাবন পাড়ার দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এছাড়াও রেস্ট হাউজ-সংলগ্ন বাংকারে মেয়েদের চুল, চুলের কাটা ও জমানো রক্ত। সারা রেস্ট হাউজ জুড়ে পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন বিদ্যমান।

পাকবাহিনীর সঙ্গে এসব পাশবিক কাজে সহযোগিতা করে এদেশীয় তাদের দোসর, রাজাকার, আল-বদর ও শান্তিকামীদের সদস্যরা। জয়পুরহাটের এদের হাতে নির্যাতিত নারীর কাহিনী আমাদের লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক করে। মনোয়ারা বেগম জলি নামের সদ্যবিবাহিতা বধূ থাকতেন জয়পুরহাটের বেলআমলা গ্রামে তার স্বামীর বাড়িতে। একদিন এলাকার রাজাকার মতিনের সহায়তায় তিনজন পাক-হানাদার জলির উপর চড়াও হয়—উপর্যুপরি ধর্ষণ করে আহত, রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে তারা চলে যায়। এই অপকর্মের সময় এদেশীয় রাজাকার মতিন ঘরের বাইরে পাহারা দেয়। মলি বলেন :

> যে তিন পাঞ্জাবী আর্মি আমার ওপর নির্যাতন চালায় তাদের কারও নাম জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া ঐ সময় আর্মিদের নাম কিভাবেই বা জানা সম্ভব? তবে আমাদের বাড়িতে আর্মিদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল এলাকার মতিন রাজাকার। আর্মিরা যখন আমার ওপর নির্যাতন করছিল তখন সে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে।[১৫]

পাকবাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালীন ৯ মাস জয়পুরহাটে ব্যাপক নারী নির্যাতন চালায়। লোকলজ্জা এবং মান-সম্মানের ভয়ে নির্যাতিত নারী ও তাদের পরিবারের কেউ মুখ খোলে না। আঞ্জুয়ারা বেগম ডলি নামের এক রমণীসহ অনেকেই নির্যাতিত হয়েছিলেন তথ্যানুসন্ধানে সে-কথার সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর

উপর্যুক্ত বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ অত্যন্ত সংঘবদ্ধ, জোরালো এবং কৌশলী পরিকল্পনায় সংঘটিত করে পাকবাহিনী। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে পাকবাহিনী বগুড়া জেলা শহরে স্থল পথে তিন দিক থেকে আক্রমণ চালায়—বগুড়া জেলার সর্ব দক্ষিণের থানা শেরপুর, পশ্চিম দিকের উল্লেখযোগ্য রেল জংশন শান্তাহার এবং উত্তর দিকে রংপুর হতে আক্রমণ পরিচালনা করে। উপরন্তু পাকবাহিনী আকাশ পথে বিমান থেকেও বগুড়া শহরের উপর আক্রমণ চালায়। এই চতুর্মুখী

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণে দিশেহারা হয়ে বগুড়ার জনগণ জান-মাল-ইজ্জত রক্ষার্থে পূর্বদিক দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদী সাঁতরিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পাকবাহিনী সমস্ত বগুড়া শহর ঘিরে ফেলে। কাজেই জনগণ পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাদের গুলি ও বেয়নেটের আঘাতে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর মতামত উল্লেখ্য :

> চেলো পাড়ায় যাবার সময় আমি যে দৃশ্য দেখেছি ইতিহাসে তার নজির বিরল। চার থেকে পাঁচ শতের মতো লোক মৃত অবস্থায় রক্তের মধ্যে ডুবে আছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তাদের মৃত দেহ পড়ে আছে। আর কুকুরে তাদের রক্ত পান করছে। পালিয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না আমার। [...] কয়েকজন পাঞ্জাবী আমাদের ধরে ফেলে। ধরার পরপরই একত্রে লাইন করে রাইফেল দিয়ে গুলি করে। গুলি করার সাথে সাথে দুইজন ঘটনা স্থলেই মারা যায়। অপর একজন বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ায় গর্তের ভিতর পড়ে যায়। একজন পাঞ্জাবী এসে বেয়নেট দিয়ে তার বুকটা চিরে দেয়। আমি সৌভাগ্যবশত গুলি না খেয়ে ঐ রক্তের মধ্যেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। একজন পাঞ্জাবী আমাকে পুনরায় দাঁড় করে পর পর দুইবার গুলি করে। প্রথম গুলিটা ফায়ার না হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার গুলি করে। ভাগ্যবশত গুলিটা আমার বাম হাতের পার্শ্ব দিয়ে চলে যায়। পাকসেনা কি যেন মনে করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলে যে, "তোম হেঁয়াছে ভাগ যাও বাঙালি।" বাসায় আসার সময় আমি দেখতে পাই শুধু মানুষের মৃতদেহ। শহরের সমস্ত রাস্তা যেন রক্তে লাল হয়ে আছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় ১০/১৫টি করে মৃত দেহ স্তূপীকৃত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কুকুর তাদের মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করছে। আমি দেখতে পেলাম যে, প্রথম দিনে খান দস্যুরা যে সমস্ত লোকজন হত্যা করেছিল সেগুলোকে শহরের রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করে ৭/৮ জন করে পুঁতে রেখেছে। তাদের কারো হাত বা মাথা দেখা যাচ্ছে।[১৬]

নারকীয় এই আক্রমণে পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় অবাঙালি বিহারিরাও। লুটপাটের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্মীয় স্থান কলুষিত ও বিধ্বস্ত করে। বগুড়ায় পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের করুণ-কৌশল বিবেকবান মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। কার্ফিউ উঠিয়ে দেবার পর জনসাধারণ যখন শহরে ফিরে আসতে থাকে তখন পাকসেনারা মেশিনগানের গুলিতে ৩/৪ শত লোক হত্যা করে। বর্বর পাকবাহিনীর হাত থেকে শুধু মুক্তিবাহিনী কিংবা আওয়ামী লীগের কর্মীই নয়, সাধারণ ব্যবসায়ী, কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী কেউই রক্ষা পায় নি। আত্মমর্যাদাশীল বাঙালি জাতি পাকবাহিনী কর্তৃক চরমভাবে নির্যাতিত হয়েও অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তারা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত প্রতিরোধ করেছে। বগুড়া শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ানো এক অন্ধ ভিক্ষুকের আত্মমর্যাদাশীল প্রতিরোধ আমাদের উজ্জীবিত করে। সেই অন্ধ ভিক্ষুক পাকসেনাদের ক্যাম্পের কাছ দিয়ে যাতায়াত করতো। একদিন তার সারা দিনের উপার্জিত কিছু চাল এবং পয়সা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাবার সময় পাকসেনারা সেগুলো কেড়ে নেয় ও তার উপর চালায় অকথ্য নির্যাতন—রাগে-ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে পড়লো সে তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপলো রাগে উত্তেজনায়। তারপর তাকে টেনে হিচড়ে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে সেই রাত্রেই নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়।[১৭]

বগুড়ায় পাকবাহিনীর নির্যাতন, গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার তীব্রতা বাংলাদেশের অনেক স্থানের চেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল। বগুড়া শহর প্রায় একমাস মুক্ত ছিল। এই পরাজয় বোধে আক্রান্ত পাকবাহিনী প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পাকবাহিনী বগুড়া শহর দখল করার পর যে হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ করেছে সে নির্যাতন শুধু বাংলাদেশই নয়, সমগ্র পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে জঘন্য ও অমানবিক। সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ এই নৃশংস ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। পাকবাহিনীর অত্যাচার নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাত্রা ছিল এরকম :

> [...] বর্বর পাক দখলদার বাহিনী ও তাদের অনুচরেরা বিগত ৯ মাসে বগুড়া জেলায় প্রায় ২৫ হাজার লোককে হত্যা করেছে ও একলাখ ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়েছে। তারা প্রায় ৫ লক্ষ লোককে গৃহহীন করে দিয়েছে বলে বেসরকারী হিসেবে জানা গেছে। এছাড়াও পাকবাহিনী এই জেলার সাড়ে তিনশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস করে দিয়েছে। পাক জল্লাদ বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর ও দালালরা থানা সদর ও থানার বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে সেখান থেকে চারিপাশের গ্রামগুলোতে নির্বিচার গণহত্যা, নির্যাতন, লুট ও অগ্নিসংযোগ চালিয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এই নরপশুর দল বিভিন্ন গ্রামে ভোর রাত্রে বাড়ি ঘিরে নারীদের উপর অত্যাচার করতো এবং যুবকদের ধরে এনে নির্মম অত্যাচার ও পরে তাদের হত্যা করতো। এরা বাড়ি বা গ্রাম ঘেরাও করার সময় যদি কেউ পালাতে চেষ্টা করতো সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে হত্যা করতো। এই জল্লাদ বাহিনী সুখান পুকুরে একটি গ্রাম ঘেরাও করে ১১০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়াও তারা কানুইল, ঘোনা, গোকুল, মাদলা প্রভৃতি গ্রামে বহু লোককে গ্রেফতার করে লাইন করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঘটনা স্থলেই গুলি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ১১ জনকে হত্যা করে বলতো 'লিজিয়ে এগার দফা' আবার ও ৬ জনকে হত্যা করে বলতো 'মুজিবকা ছে দফা লিজিয়ে [...]।[১৮]

একাত্তরের সেই বিভীষিকাময় দিনে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে যে, নরখাদক পাকসৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে গণহত্যার পর অকুস্থল ত্যাগ করলেও যথাযথ মর্যাদায় ধর্মীয় বিধিমতে সেইসব মৃতদেহের সৎকারও সমাহিত করার সুযোগ বা পরিবেশ পাওয়া যায় নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই একটিমাত্র কবর খুঁড়ে কোনোমতে একাধিক শহীদকে সমাহিত করতে হয়েছে। আবার কখনো কখনো

Dhaka University Institutional Repository

পাষণ্ড পাকসৈন্যরা বন্দি বাঙালিদের নির্যাতনের পর তাদের দিয়েই জোর করে কবর খুঁড়িয়ে নিয়ে সেই কবরের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে এবং একই কবরে একাধিক শহীদের শেষ ঠিকানা হয়েছে। এভাবেই সারাদেশে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গণকবর : 'পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী বগুড়া সদর থানার বেশ কয়েকটি স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে আশপাশের গ্রামগুলোতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী নির্যাতন ও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।'[১৯]

বগুড়া জেলার বিভিন্ন নির্যাতন ক্যাম্প, বধ্যভূমি ও গণহত্যার বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় মুক্তিযুদ্ধকালীন বর্বর পাকবাহিনীর ভয়ঙ্কর নির্যাতন ও পৈশাচিকতার বলি হয়েছে বগুড়ার হাজার হাজার নারী, পুরুষ, বৃদ্ধা ও শিশু। পাকবাহিনী বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে বাঙালির উপর নিপীড়ণ, নির্যাতন চালাত। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-এ গোটা বাংলাদেশই পরিণত হয়েছিল বিশাল এক নির্যাতন কেন্দ্রে। প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠুর পাকবাহিনী যখন যে এলাকা দখল করেছে তখন সেই এলাকায় নিজেদের নিরাপদ আস্তানা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে নিয়েছে নির্মম নির্যাতন কেন্দ্র। একই ছাদের তলে একদিকে শোনা গেছে ভোগলিপ্সু পাকবাহিনীর আনন্দ উল্লাস, অন্যদিকে গুমরে উঠেছে শান্তিপ্রিয় নির্যাতিত বাঙালির বুক ফাটা আর্তনাদ : '[...] বগুড়া জেলাতে বেশ কিছু গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সার্কিট হাউস, পুলিশ লাইন, রেলওয়ে মাঠ, ওয়াপদা, এতিমখানা, ভার্জিনিয়া টোবাকো কোম্পানি ইত্যাদি স্থানে অসংখ্য নর-নারীকে ধরে এনে অত্যাচারের পর হত্যা করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। এখনো বোধ হয় এসব স্থান খুঁড়লে মানুষের মাথার খুলি, হাত-পায়ের হাড়গোড় পাওয়া যাবে। এছাড়াও সান্তাহার, জয়পুরহাট, গাবতলী, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, ঘোনা, সুখানপুকুর প্রভৃতি স্থানে রয়েছে গণকবর ও বধ্যভূমি। [...]'[২০]

বগুড়া শহর-সংলগ্ন করতোয়া নদীর পূর্ব-তীরবর্তী চেলপাড়ার বধ্যভূমি সচেতন জনমনে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকবাহিনীর নিরীহ বাঙালিদের উপর অকথ্য, নারকীয় নির্যাতন বিষয়ে বেদনাদায়ক প্রশ্নের উদ্রেক করে, বুকে এঁকে দেয় ক্ষতচিহ্ন। ১৯৭১ সালের ২৩শে এপ্রিল পাকবাহিনী কর্তৃক অতর্কিতে বগুড়া শহর দখল হওয়ার ফলে শহরের লোকজন করতোয়া নদী পার হয়ে পার্শ্ববর্তী চেলপাড়া গ্রামে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ২৪ এপ্রিল তারিখেই এই চেলপাড়ায় পরিচালিত হয় এক নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড। বগুড়ার পতনের সময় লোকজন অনেকেই সেদিন শহর থেকে বের হতে পারে নাই। যারা ভাগ্যক্রমে বের হয়েছিল তারাও নিকটবর্তী গ্রামেই সেদিন আশ্রয় নিয়েছিল। চেলপাড়া এবং তদ্‌সংলগ্ন লোকজন সেদিন দস্যুদের নৃশংসতার ভয়াবহতা বুঝতে না পেরে অধিকাংশই বাড়িতে ছিল। সকাল হতেই সবাই পরবর্তী খবর জানার জন্য ব্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। কিন্তু সেইদিনই গ্রামের পর গ্রামে হানা দিতে শুরু করে পাক বর্বরেরা। চেলপাড়া, নারুলি, ইছাইদহ, আকাশতারা প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাক-পশুরা বাঙালিদের ধরে আনতে শুরু করলো। যখন সংখ্যায় দাঁড়িয়েছিলো প্রায় একশত ত্রিশের কাছাকাছি তখন সব বাঙালিদের চেলপাড়া 'শান্তি নার্সারি'র নিকট আনা হল। তাদের সবার হাত বেঁধে দাঁড় করিয়েছিল পাক দস্যুরা। এরপরই শুরু হলো বর্বরদের হত্যাযজ্ঞ। গুলির পর গুলি খেয়ে চীৎকার করতে করতে একটা একটা করে বাঙালি লুটিয়ে পড়ল :

> [...] গ্রামের লোকদের ধারণা বহু জীবিত বাঙালিদের আহত অবস্থায় ওরা গর্তে পুঁতে রেখেছে। 'শান্তি নার্সারি'র পশ্চিম দিকে আজো দুটি গর্ত আছে। এখানেই বাঙালিদের হত্যা করে পুঁতে রাখা হয়েছে। [...] বর্বর পাক দস্যুরা এরপর প্রায় প্রতিদিনই বাঙালিদের ধরে এনে চেলপাড়ার কুয়ার পার্শ্বে জবাই করতো। গ্রাম থেকে যারা শহরের দিকে যেত তারাই এই হত্যাযজ্ঞের শিকার হতো। এছাড়া টাউন থেকে বাঙালিদের ধরে এনেও এখানে জবাই করা হতো। এই এলাকায় প্রায় ৪/৫টা বধ্যকূপ আছে। আজো এই কূপের মাঝে গলিত লাশ আর কঙ্কাল দেখা যায়। চেলপাড়া আদর্শ নার্সারির এবং তার আশেপাশের সুবিধামত জায়গায় হত্যা করে বাঙালিদের এইসব কুয়োতে ফেলা হতো।[২১]

বগুড়া শহর, শহর-সংলগ্ন চেলপাড়া ছাড়াও দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ গাঙ্গুলি বাগান হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নির্যাতনের দিক থেকে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বগুড়ার শহরতলী সেউজ গাড়ির শেষ মাথায় ঐতিহাসিক তিনটি বাগান এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বদিকে গণমঙ্গল, পশ্চিমে আনন্দ আশ্রম, মাঝখানে গাঙ্গুলী বাগান। গণমঙ্গল ১৯৩০-৪০-এর দিকে ছিল কংগ্রেসের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই বাগানে গান্ধীজী এবং বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আগমন ঘটেছিল। পশ্চিমের বাগানটা আনন্দ আশ্রম, তাপস বাবাজী আনন্দ এখানে এসেছিলেন প্রায় শত বছর আগে। এই দুই ঐতিহাসিক বাগানের মাঝে গাঙ্গুলীর বাগান। এ বাগানে নির্যাতনের হাত থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া সাধুবাবা যুগল কিশোর গোস্বামীর কাছ থেকে জানা যায় : হানাদার পাকবাহিনী বগুড়া দখল করার পরও আশ্রমে চারজন সাধু ও তিনজন মাতা ছিলেন। পাকবাহিনী তিনজন সাধুকে বগুড়া রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজ সড়কের পার্শ্বে গুলি করে হত্যা করে। এদের ভিতর ছিলেন সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু এবং স্থানীয় বাদুরতলার একজন বৃদ্ধ মুনেন্দ্রনাথ সরকার।[২২] এ বধ্যভূমির নারকীয় বীভৎসতা সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ভাষ্য ছিল এরকম : 'গাঙ্গুলী বাগান বগুড়া শহরের অন্যতম বধ্যভূমি। প্রত্যহ রাত দিন দখলদার পাকসেনা আর তাদের সহযোগিদের নরহত্যার বলির মঞ্চ। এখানে বাগানের পশ্চিমের ঘরগুলোর দেয়ালে ছিটকে ওঠা রক্তের ছাপ।

Dhaka University Institutional Repository

আনারস ক্ষেতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রক্ত মাখা চাদর, লুঙ্গী, ধূতি। একটি অগভীর বাঁধানো কূপভর্তি মানুষের মৃতদেহগুলো পচে পচে আবহাওয়াকে করেছে বিষাক্ত। এখানের আবহাওয়ায় আজ মৃত্যুর শীতলতা।'[২৩] পাকবাহিনী গাঙ্গুলি বাগানে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। নির্মম অত্যাচারের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী কেউ কেউ প্রকাশ করেছে পরবর্তীকালে। এমনকি এই পাশবিক অত্যাচার থেকে বেঁচে যাওয়া এক সাধুবাবার বর্ণনা থেকে এর বীভৎসতা সম্পর্কে জানা যায় : '[...] ঐ যে ওখানে একটা বদ্ধ কূপ আছে। প্রায় প্রতিদিনই করুণ কান্নার আওয়াজ আমি শুনেছি। একদিন এক ছোট শিশু বাবা-মা বাঁচাও করে চিৎকার করছিল। ঐ ছেলেটাকে জবাই করে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমি প্রায় প্রতিদিনই এরকম চিৎকার শুনেছি। সাধুবাবার অনুরোধে আমি বদ্ধকূপে হিংস্রতার অনেক চিত্র দেখেছি। আজো এই বাগানের একটি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মানুষের রক্ত লেগে আছে। কূপে নরকঙ্কাল আর মাথার খুলিগুলো এখনো দেখা যায়। [...]'[২৪]

গাঙ্গুলি বাগান ছাড়ও বগুড়া শহরের খ্যাতনামা জামিল গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিল চত্বরে পাকবাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের শিল্পনগরী হিসেবে বগুড়ার খ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ। এখানে অবাঙালি-বিহার পরিচালিত জামিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ অন্যতম। এই জামিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল বিহারী এবং স্বল্প সংখ্যক বাঙালি। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনীসহ রাজাকার, আলবদর, আলশামসের সহযোগিতায় ফ্যাক্টরির বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারী ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ নারী পুরুষকে ধরে এনে এখানে নির্বিচারে হত্যা করে এবং তাদেরকে মিলের অভ্যন্তরে গণকবর দেয়া হয়। এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় :

> [...] নিহতদের মধ্যে পরিচিত দু'জনের মধ্যে একজন মিলের মসজিদের ইমাম। তাঁকে বয়লারে পুড়িয়ে ও অপরজন কাটনারপাড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক বাবুল মিয়াকে মিলের ভেতরে অবস্থিত সা'মিলের করাতে কেটে হত্যা করা হয়। তাদের কবর দুটি পাকা করে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। [...] মুক্তিযুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে, বাঙালি শ্রমিকরা মিলে ফিরতে শুরু করলে বিহারী শ্রমিকরা তাদের পর্যায়ক্রমে হত্যা করে। ওই সময়ে মিলের ভেতর কোনো বাঙালি প্রবেশ করলে সে আর বের হতে পারতো না। বিহারীরা তাদের হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলতো। গুম করা এ লাশের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যাবে। তবে নিহতদের মধ্যে মিল শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ জন। বাকিদের বাইরে থেকে এনে হত্যা করা হয়েছে।
>
> বয়োবৃদ্ধ মাজেদ আলী জানান, ভার্জিনিয়া টোব্যাকো কোম্পানির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সোপ ফ্যাক্টরির পূর্ব দক্ষিণ কোণে, পাওয়ার সেকশন সংলগ্ন গুদামের সামনে ও বয়লার সংলগ্ন স্থানে এসব গণকবর রয়েছে।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ওই মিলের মসজিদের মোয়াজ্জিন বৃদ্ধ মাজেদ আলীর কাছ থেকে এ সম্পর্কে জানা যায়। যুদ্ধকালীন ভয়াবহতার চিত্র বর্ণনা এবং এই নির্মমতার সঙ্গে যুক্ত এদেশীয় রাজাকারদের প্রকাশ্য স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে মর্মাহত মাজেদ আলীর ক্ষোভ, ঘৃণা প্রকাশের মধ্য দিয়ে একজন দেশপ্রেমিক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়।

বগুড়া শহরের মধ্যে বগুড়া-নাটোর রোড সংলগ্ন বাবুর পুকুর একটি পরিচিত স্থান। পাকবাহিনী এই পুকুরে মানুষজন ধরে এনে অকাতরে হত্যা করেছিল। এজন্য মুক্তিযুদ্ধে বাবুর পুকুর উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে বিবেচ্য। ১৩ ডিসেম্বর বগুড়া মুক্ত দিবস। পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর মরণপণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে '৭১ এর এই দিনে বগুড়া দখলমুক্ত হয়। পাকবাহিনীকে পরাস্ত করে বীর মুক্তিবাহিনী বগুড়া শহর ও ক্যান্টনমেন্ট হানাদার মুক্ত করে। উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরির সংগ্রহশালা থেকে জানা যায় যে, বাবুর পুকুরে একজন নারী মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৪ জন শহীদ হন। তারা হলেন : মান্নান, হান্নান, জামাল, ভোলা, মন্টু, সাইদুল, আলতাফ, বাদশা, বাচ্চু, নূরজাহান, ফজলু, আবুল, টুকু।[২৬] বগুড়া দখল মুক্ত করতে ৪ দিনের এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কমপক্ষে ১০ জন শহীদ হন। বগুড়া দখলমুক্ত করতে ১১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা দল শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। রাজাকার আলবদল বাহিনী শহরে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা দলের প্রবেশের খবর বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে পাকবাহিনীকে জানায়। পাকবাহিনী খবর পেয়ে ১১ নভেম্বর রাতে অভিযান চালিয়ে ঠনঠনিয়া শহীদনগর এলাকা থেকে ১১ জন গেরিলাকে ধরে নিয়ে বগুড়া শহরের তিন কিলোমিটার দূরে বগুড়া নাটোর মহাসড়কের পাশে বাবুর পুকুরে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। বাবুর পুকুরে ১১ মুক্তিবাহিনীর কবরসহ অসংখ্য শহীদের গণকবর আজও অবহেলা ও অযত্নে পড়ে আছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বগুড়া প্রেসক্লাব বাবুর পুকুরে ১১ গেরিলার গণকবর চিহ্নিত করে।[২৭] সেদিনের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মমতাজ উদ্দিন, এডভোকেট রেজাউল বাকী, এডভোকেট রেজাউল করিম মন্টু, মাহবুবুর রহমান রাজাসহ বেঁচে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বগুড়া জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা শহরের চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর মূল লক্ষ্যস্থল ছিল পাকিস্তানিদের ক্যান্টনমেন্ট। শহরের উত্তরাঞ্চল মহাসড়ক সংলগ্ন ঠেঙ্গামারা এলাকা দিয়ে বগুড়া অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী। খবর পেয়ে পাকবাহিনী বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর অবস্থানের উপর শেল ও ভারী অস্ত্র থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা জবাব দেয়। পাকবাহিনীর গোলায় নিরীহ জনগণ ছাড়াও মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর ১০ জন শহীদ হন। যুদ্ধে পাকবাহিনীর বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হলে পিছু হটে যায় তারা এবং ১৩ ডিসেম্বর সকালে যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। পাকবাহিনীর সেদিনের সেই

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসমর্পণের স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ। যেখানে গাঁথা আছে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের নাম।[২৮] এছাড়াও বগুড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন রেল কলোনীর পুকুর পাড়ে পাকবাহিনী নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটায়। তারা ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে। নিহতরা হলেন : আব্দুস সাত্তার (বি.এ এল এল বি), আব্দুল কাদের (আলীম), আব্দুস সালাম (আইকন), আবদুল গনি (রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট অডিটর কো-অপারেটিভ), মোঃ মতিন সুজা। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় বর্বরতম কাহিনীর সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় বগুড়ার ধুনট থানায় গণহত্যার। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ বিশ্লেষণে ধুনট গণহত্যা অন্যতম বিশ্লেষ্য বিষয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ৪ নভেম্বর ধুনটের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং হৃদয়বিদারক গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকবাহিনীর বুলেটের আঘাতে বগুড়ার ধুনট উপজেলার ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ধুনট সদরের অফিস পাড়ায় স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ সময় অযত্ন, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শহীদদের গণকবরটি আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। গণকবরে যারা ঘুমিয়ে আছেন তারা হলেন ধুনট অফিস পাড়ার জহির উদ্দিন, কান্তনগর গ্রামের নয়া মিয়া, চন্দার পাড়ার আব্দুল লতিফ, শিয়ালী গ্রামের পর্বত আলী, নূরুল ইসলাম এবং একই পরিবারের সহোদর দুই ভাই জিল্লুর রহমান ও ফরহাদ আলী। এছাড়া নাম না জানা আরও ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা সেদিন পাকবাহিনীর হাতে শহীদ হন।[২৯] পাকবাহিনীর নির্মমতার দিক থেকে বগুড়ার নারুলি হত্যাকাণ্ড বিশিষ্টতার দাবিদার। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বগুড়া সদর থানার অন্তর্গত সাবগ্রাম ইউনিয়নের নারুলি গ্রামের ৪নং রেলঘুমটির পার্শ্বে নয়নজুলিতে পাকবাহিনী একসঙ্গে ৩৫ জনকে গুলি করে হত্যা করে নয়নজুলিতে পুঁতে রাখে। তাদের মধ্যে ১৭ জন শহীদের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন : নারুলি গ্রামের সিরাজউদ্দিন, মহিরউদ্দিন, আব্দুস সামাদ সরকার, হাবিবর রহমান, গোফফার প্রাং, বুলু প্রাং, শরীফ প্রাং, বিল্লাত আলী সরকার, সরাফত জামান, ছফে জুমাল শেখ, মোকাম প্রাং, কালা শেখ, ইস্রাফিল খন্দকার, জসিম উদ্দিন প্রাং এবং আকাশ তারা গ্রামের শুকুর আলী, শেখ পাড়া গ্রামের শরিফ উদ্দিন সাহিত্যিক চেলোপাড়ার তবিবর রহমান। আলিম উদ্দিন নামক একব্যক্তি লাশের স্তুপ থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যায়।[৩০]

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকেই বগুড়ার শেরপুরের রাজনীতিবিদ, ছাত্র, তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা আমানউল্লাহ খানের নেতৃত্বে সকলে সংগঠিত হয় এবং সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ন্যাপ নেতা সিদ্দিক হোসেনকে সংগ্রাম পরিষদের প্রধান করা হয়। শেরপুর ডিজে হাইস্কুল মাঠে কাঠের ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। থানার তৎকালীন হাবিলদার আব্দুল হালিম প্রশিক্ষণ দিতেন।[৩১] ২৪ এপ্রিল পাকবাহিনী শেরপুরে প্রবেশ করে। এরপর শুরু হয় গণহত্যা। পাকবাহিনী চান্দাইকোনা হয়ে সুঘাট ইউনিয়নে প্রবেশ করে

Dhaka University Institutional Repository

এতদঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক আমানউল্লাহ খানের জয়লা জুয়ানস্থ গ্রামের বাড়িতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এরপর তারা কল্যাণী হিন্দুপাড়া জ্বালিয়ে দেয়। ২৬ এপ্রিল পাকবাহিনী মির্জাপুরের দড়িমুকুন্দ গ্রামে প্রবেশ করে গ্রামবাসীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ২৬ জনকে হত্যা করে।

বগুড়া জেলার সর্ব দক্ষিণের থানা শেরপুর। ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়ক শেরপুর থানার বুকচিড়ে বেরিয়ে গেছে এজন্য এই থানার সড়ক যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ায় পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আল-বদর, আল-শামস স্বল্প সময়ে তাৎক্ষণিক নির্যাতন চালানোর অনুকূল পরিবেশ পায়। ফলে মুক্তিযুদ্ধে শেরপুরের বেশ কয়েকটি স্থানে তারা পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬ এপ্রিল সোমবার সকালে শেরপুর থানার মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের দড়িমুকুন্দ গ্রামে হানাদার বাহিনী লুটপাট ও অগ্নি-সংযোগ করে। তারা ২৬ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে ধরে এনে ফাঁকা মাঠে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। এদের মধ্য থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া ডা. মোখলেছার রহমান বুলু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শিউরে উঠেন : 'ঐ দিন আমরা সকালে গ্রামের লোকজন মিলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ সময় পাক হানাদার বাহিনী ও দেশীয় দোসররা নির্বিচারে গ্রামবাসীর উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়।'[৩২]

দেশ স্বাধীন হলে গ্রামবাসী সকলে মিলে নিহত ২৬ জনের স্মৃতিস্বরূপ গণকবর নির্মাণ করে। শহীদ গ্রামবাসীগণ : আজহার আলী ফকির, ওসমান গনি, একরামুল হক, আজিজুর রহমান, সজীব উদ্দিন, সেকেন্দার আলী, বুলমাজন, রমজান আলী, মোখলেছার রহমান, উজির উদ্দিন, দলিল উদ্দিন, ফকির হাসেন আলী, আয়েন উদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, সুইয়া প্রাং, হায়দার আলী, অজিম উদ্দিন, নেওয়াজ উদ্দিন, ইসহাক আলী, আফজাল হোসেন, আবেদ আলী, আমেজ উদ্দিন, এন্তাজ উদ্দিন। এছাড়াও ২৫শে এপ্রিল শেরপুর থানার বাগড়া গ্রামে পাক হানাদারদের হাতে ২৫ জন এবং ২৬শে এপ্রিল সীমাবাড়ি ইউনিয়নের ঘোগা ব্রীজের কাছে প্রায় ৩০০ জন গ্রামবাসী নির্মমভাবে নিহত হয়। এসব গণকবর অযত্নে, অবহেলায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এলাকাবাসী মনে করেন এবং এই মর্মে দাবী জানান যে, স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরেও এই গণকবরগুলো সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নাই।[৩৩]

শেরপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ডিসেম্বর মাসে ফিরে আসে। ১৪ ডিসেম্বর আকরাম হোসেন খানের নেতৃত্বে থানা দখলের মাধ্যমে শেরপুর শত্রু মুক্ত হয়। ১৫ ডিসেম্বর পার্ক মাঠে (বর্তমানে মহিলা কলেজ) স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন আমানউল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

খান। উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে দড়িমুকুন্দ গ্রামে গণকবর এবং পৌরসভার অর্থায়নে শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।[৩৪]

পাকবাহিনীর নির্মম নিপীড়ন, নির্যাতন ও অত্যাচারের বলি হয়েছে বগুড়ার শহর, বন্দর, গ্রাম-গঞ্জের অসংখ্য মানুষ। পাকবাহিনী তাদের অত্যাচারের ধারাবাহিকতায় সুখানপুকুরের একটি গ্রাম ঘিরে সেখানকার ১১০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়াও তারা কানুইল, ঘোনা, গোকুল, মাদলা প্রভৃতি গ্রামের বহু লোককে হত্যা করে। এছাড়াও বগুড়া শহরের ফুলবাড়ি উত্তরপাড়া আযীবুল হক কলেজের পেছনে ২৯ জনের একটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।[৩৫]

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অধিকাংশ পীর মাশায়েখদের এক প্রকার অন্ধ-ধর্মবিশ্বাস-এর ফলে যে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান ছিল সেই অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বগুড়ার রাম শহরের পীরবাড়ি ব্যতিক্রমী এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের গৌরবময় অবস্থান তুলে ধরেছেন। বগুড়া শহর থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরের একটি গ্রাম রাম শহর পীরবাড়ির তিন টগবগে তাজা তরুণ জিল্লুর রহমান, মাকসুদুর রহমান এবং তোফাজ্জল হোসেন জিন্নাহ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ায় নভেম্বর মাসের ভোর রাতে সেহরি খাওয়ারত অবস্থায় পাকবাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় পীরবাড়িতে প্রবেশ করে ব্রাশ ফায়ারে পীরবাড়ির সাত সদস্যকে হত্যা করে। এছাড়াও গ্রামের আরো চার ব্যক্তিকে ধরে এনে পীরবাড়িতে হত্যা করে।[৩৬] এছাড়াও বগুড়া জেলার সর্ব পূর্ব-উত্তরের থানা সারিয়াকান্দি (গাইবান্ধা সংলগ্ন) থেকে বহু লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে গাইবান্ধার ভরতখালির পুরাতন ফুলছড়ি ঘাট ও নয়া ঘাটের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয়েছে।

২৮শে এপ্রিল ১৯৭১ সাল, সোমবার সন্ধ্যায় পাকবাহিনী প্রথম দুপচাঁচিয়ায় প্রবেশ করে। ভীত সন্ত্রস্ত জনগণ দুপচাঁচিয়া থানা সদর থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে অন্যত্র যায়। প্রত্যক্ষদর্শী নিমাই চৌধুরী, শংকর, তপন কুণ্ডুসহ এলাকার অনেকে জানান যে, স্বাধীনতার কয়েকদিন পূর্বে বগুড়া শহরের কালিতলা নিবাসী মন্মথকুণ্ডু তার পরিবার পরিজন নিয়ে দুপচাঁচিয়ায় আসেন ২৮ তারিখে। ২৯ শে এপ্রিল সকালে এলাকার কুখ্যাত রাজাকার আব্দুল মজিদ অস্ত্রশস্ত্রে সু-সজ্জিত হয়ে এসে মন্মথকুণ্ডুর অষ্টাদশী সুন্দরী কন্যা তৃপ্তিরাণী কুণ্ডুকে তার হাতে তুলে দিতে বলে। এই কু-প্রস্তাবে তৃপ্তি কুণ্ডুর পিতা মন্মথ রাজি না-হলে রাজাকার মজিদ চলে যায়। পরে রাজাকার মজিদ ও রাজাকার মজিবর মাস্টার পাক হানাদারদের সঙ্গে করে নিয়ে চৌধুরী বাড়িতে ঢুকে এলোপাথারী গুলি ও নির্যাতন চালায়। এখানে শহীদ হন মন্মথ কুণ্ডু, তার স্ত্রী দুর্গা কুণ্ডু, পুত্রবধূ ও ছোট ৮ বছরের মেয়ে কাকলী। রক্ত পিপাসু হানাদাররা আহত অবস্থায় অষ্টাদশী তৃপ্তি কুণ্ডুকে ধরে নিয়ে যায়। চৌধুরী বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা দোকানপাটসহ সমস্ত বসতবাড়ি ভস্মীভূত করে। এখানে তারা আরও হত্যা করে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষিতিশ চৌধুরী, অক্ষয় কুণ্ডু, মণীন্দ্র কুণ্ডু ও অমরকে। পাক হানাদাররা চলে যাবার পর স্বল্প সময়ে এলাকাবাসী প্রায় ১১টি লাশ চৌধুরী বাড়ির পেছনে মজা পুকুরের পূর্ব পাড়ে একই জায়গা পুঁতে রাখে। দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিবাহিনী মজিদ রাজাকারের বাড়ি থেকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তৃপ্তি কুণ্ডুকে উদ্ধার করে। দামাল সাহসী মুক্তিবাহিনী হত্যা করে মজিদ রাজাকারকে।[৩৭]

পাকবাহিনীর নির্মম, নিষ্ঠুর, নৃশংসতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বগুড়া জেলার তালোড়ার কলাবাগান পুকুর, দুর্গাদহের পদ্মপুকুর, কৎপিতলাপুর পুকুর প্রভৃতি স্থানে। রেল স্টেশন থাকায় তালোড়ার সঙ্গে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা ভাল ছিলো। উপরন্তু ধান-চালের আড়ত ব্যবসার সুবাদে তালোড়া একটি বাণিজ্য বন্দরে রূপ লাভ করেছিল সেই সময়ে। মফস্বলে বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ার সুবাদে এখানে সব সময়েই জন মানুষের আনাগোনা ছিল। ফলে পাকবাহিনী প্রথমে সাধারণ জনগণকে রক্ষাকারী হিসেবে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে তাদের অপতৎপরতা ও হিংস্রতা সম্পর্কে জনগণ অবহিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে তালোড়া স্কুল ঘরে জনগণকে ধরে এনে নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করে :

> ওরা মানুষ খুন করার জন্য দুর্গাদহ নদীর ধারে খাঁচা বানিয়েছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক ধরে নিয়ে এসে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করা হত, কোন কোন সময় হাত পা বেঁধে জীবন্ত মানুষকে পানির মধ্যে ফেলে দেওয়া হত।
>
> তালোরার পদ্মপুকুরে জল্লাদ বাহিনী একদিন এক সঙ্গে পিতা-পুত্রসহ মোট ১৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে।
>
> তালোরায় যাদের হত্যা করা হয়, তাদের সবাইকে আদমদিঘী, নশরৎপুর, চামরুল প্রভৃতি এলাকা থেকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করা হতো।[৩৮]

বগুড়া সদর ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও মহকুমা শহর জয়পুরহাট এবং জয়পুরহাটের বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনী ব্যাপক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। নির্যাতনের ব্যাপকতায় লিপিবদ্ধ স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পাগলা দেওয়ান। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার ফলে সাধারণ জনগণ এখানে আক্রান্ত হয়েছে বেশি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত-সংলগ্ন জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি থানা ছিল পাকবাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যা কেন্দ্র। সীমান্ত-সংলগ্ন হওয়ায় বগুড়া জেলা ছাড়াও আরও বহু জেলার অধিবাসীরা এই অঞ্চল দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করত বলে এখানে অসংখ্য মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিল। প্রাণভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ দলে দলে ভারতে আশ্রয় নিতে যাবার কালে সীমান্তের সন্নিকটে ওৎ পেতে থাকা পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়তো। স্থানীয় অধিবাসীদের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে হানাদারেরা যুদ্ধকালে হত্যা করেছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে। জয়পুরহাটের পাগলা দেওয়ানে পাকসেনা ও তাদের সহযোগিরা চার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা

Dhaka University Institutional Repository

করেছে, এক হাজার নারীর সম্ভ্রম হরণ এবং অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস করেছে। শুধু পাগলা দেওয়ানই নয়, তার আশপাশ চরবরকত, নামুজানিধি, পাওনন্দা, খাস পাওননন্দা, ছিট পাওনন্দা, নওপাড়া, চিরলা, রূপনারায়ণপুর, জগদীশপুর, ভুটিয়াপাড়া, মল্লিকপুরসহ অসংখ্য গ্রামে পাক-নৃশংসতার চিহ্ন বর্তমান। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানগণ পাগল দেওয়ানের মাজারকে ভক্তি শ্রদ্ধা করলেও বর্বরেরা মাজারের চারদিকে বাঙ্কার নির্মাণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। মাজারের প্রায় পঁচিশ হাত দূরে একটি বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে পুতে রাখা হয় বলে জানা গেছে। মাজারের পশ্চিম দিকে বাঁধানো কূপটি মৃতদেহে ঠাসা ছিল। পাগলা দেওয়ানের মাদ্রাসাটিও পাকসেনারা ভেঙ্গে দিয়েছে। সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাওয়ার সময়ে এদের (পাকসেনা) হাতে ধরা পড়ে শত শত বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে। পাগলা দেওয়ানের নির্যাতনের চিত্রকেও হার মানায় কড়ইকান্দিপুরের ঘটনা। তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বৃহত্তর বগুড়া জেলার জয়পুরহাট মহকুমার (বর্তমানে জয়পুরহাট জেলা) কড়ই কান্দিপুর গ্রামটি ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর ভয়ঙ্কর নির্যাতনের মূর্ত প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা যে ব্যাপক গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায় তা আজও এই এলাকার মানুষকে ভয়ার্ত করে তোলে। গ্রামের মানুষদের বন্দুকের মুখে একত্র করে দু'হাত মাটিতে রেখে উপুর করে ব্রাশফায়ার চালিয়ে পাকিস্তানি হানাদারেরা ৩৬১ জনকে নির্মমভাবে এখানে হত্যা করেছে। তারা এমনই পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল যে কড়ই কান্দিপুর গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত পালপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কেউই জীবিত ছিলেন না। শূন্য বিরান জনপদ। ৩৬১ জনকে হত্যার পর ভোমপুকুরের মাটিতে মাটিচাপা দেয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় জানা যায় যে, ৩৬১ জনের সঙ্গে আরও ১০জন নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল পাকবাহিনী। সর্বমোট ৩৭১ জনকে হত্যা করা হয়। ক্যাদারপুকুর পাড়ের আখের গুড় তৈরির বিরাট চুল্লিতেও মাটিচাপা দেয়া হয় বহু লাশ—এরকম ঘটনা শোনা যায় :

> সেদিন ছিল সোমবার, ১৯শে এপ্রিল ১৯৭১ (৫ই বৈশাখ, ১৩৭৮)। সকাল প্রায় ১১টা। কর্মব্যস্ত গ্রামবাসী হঠাৎ চমকে উঠে কড়ই গ্রামের পশ্চিম কোণায় ঘরবাড়িতে আগুন এবং বন্দুকের গুলির আকস্মিক শব্দে। তখন এই অঞ্চলে অসহযোগ এবং প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল, বিভিন্ন গ্রামে পাকিস্তানি হানাদারদের হামলার কথাও শোনা যাচ্ছিল। এসব খবর এই গ্রামের মানুষেরও কমবেশি জানা ছিল। তাই গুলির শব্দ ও আগুনের শিখা দেখে আতঙ্কিত নরনারী প্রাণভয়ে দৌড়ে বাড়ির বাইরে বেরুতে গিয়ে দেখে, ছোট্টগ্রামটিকে ততক্ষণে পাকিস্তানি সৈন্য আর অবাঙালি বিহারী রাজাকাররা ঘিরে ফেলেছে। সেদিনের সেই মর্মান্তিক নৃশংসতার শিকার যারা হলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

[...] ব্যাভা, ক্যাঁচা, শিবেন, বাণীকান্ত, সন্তোষ, হ্যাদরা, তরমুজা, কৃষ্ণ, প্রভু, বিষ্ট, মন্টু, হরিবল পাল, সুরেন, রানু, রঘু, খগেন, কমল, ক্ষিতিশ, সতীশ, সুরেশ, গোপীনাথ, হবুল্লা, গুটি, মহাদেবসহ ৩৬১ জনকে হত্যার পর ভোম পুকুরের ভাতিতে মাটি চাপা দেয়া হয়। আরো কয়েকজন সাক্ষী বৃদ্ধ আবু সাইদ, যোগেন পাল (৪২), নাছির (৩৫), আব্দুর রশিদ (৭০) সহ আরো কয়েকজন। এছাড়া ক্যাদার পুকুর পাড়ের আখের গুড় তৈরির বিরাট চুল্লিতেও মাটি চাপা দেয়া হয় বহু লাশ। সেই সময়ের ১০/১২ বছরের কিশোর ছানোয়ারও (৩৪) দেখেছে দূর থেকে এই বর্বর হত্যাযজ্ঞ। সেই স্মৃতি এখনো ভাসে সবার মনে।[৩৮]

আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত শক্তিশালী এবং উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যৎসামান্য অস্ত্র ও কৌশল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার বীরসন্তানরা। অদম্য সাহস ও শক্তি, দেশপ্রেম এবং আবেগকে আত্মস্থ করে বাঙালিরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল—বিনিময়ে খোয়াতে হয়েছে জীবন, ইজ্জত ও নানাবিধ সম্পদ। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও কৌশলে উন্মত্ত-পাগলপ্রায় পাকবাহিনীর পাশবিকতা আরও প্রবল হয়—কাউকেই রেহাই দেয় নি নির্যাতন হত্যা থেকে। ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী বগুড়ায় প্রবেশকালে ঠেঙ্গামারা নামক স্থানে প্রথম প্রতিরোধের মুখে পড়ে। প্রতিরোধকামী জনতা তাদের কৌশলী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধা ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতিরোধের মুখে প্রায় একমাস বগুড়া শহর পাক-হানাদার মুক্ত ছিল। এই ক্ষোভ ও ঈর্ষা এপ্রিল '৭১ পরবর্তী সময়ে পাকবাহিনীকে নির্যাতন, হত্যা ও অগ্নিসংযোগে অতি উৎসাহী করে তোলে। উন্মত্ত দিশেহারা পাকবাহিনী পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা-ধর্ষণ শুরু করে। ক্ষতিগ্রস্থ হয় বগুড়ার আপামর জনগণ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বগুড়ার নারীরা—ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করাসহ হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত থেকেছে পাকবাহিনী। পাকবাহিনীকে এই জঘন্য কাজে সাহায্য করেছে অবাঙালি-বিহারীরা এবং রাজাকার আলশামস; আলবদর।

বগুড়া শহর, শহর-সংলগ্ন চেলপাড়া, বাবুরপুকুর, গাঙ্গুলি বাগান, রামশহর-পীরবাড়ি, ধুনট, শেরপুর, তালোড়া, জয়পুরহাটের কড়ই কান্দিপুর, ইছাইদহ, পাগলা দেওয়ানসহ অনেক স্থানে আবিস্কৃত বধ্যভূমি ও গণকবর পাকবাহিনীর নির্যাতনের স্বাক্ষর বহন করছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। হানাদার কবলিত সমগ্র বাংলাদেশের একটি জেলায় এই কৃতিত্ব বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অর্জন ও সাফল্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের আনন্দ ও বেদনার অশ্রুতে নিমজ্জিত পরবর্তী প্রজন্ম। এই সাফল্যের নেপথ্যে পাকবাহিনীর ব্যাপক নির্যাতনের রক্তাক্ত ক্রন্দন মিশে আছে। উন্মত্ত, পাহালপ্রায় দিশেহারা

Dhaka University Institutional Repository

পাকবাহিনী প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার গ্লানিতে পুরে খাক হয়ে ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। বগুড়ার সেই বর্বর হত্যাযজ্ঞের দালিলিক ইতিহাস বধ্যভূমি ও গণকবর। নিপীড়ন, নির্যাতন, লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণসহ অমানবিক ও পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ বগুড়া তথা সমগ্র বাংলার বিবেকবান মানুষকে বেদনার সাগরে নিমজ্জিত করে।

তথ্যসূত্র

১. এ. জে. এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *দুই শতাব্দীর বুকে (বগুড়ার ইতিহাস)*, ১ম খণ্ড, বগুড়া, প্রজাবাহিনী প্রেস, ১৯৭৬, পৃ. ১৫১।
২. *ঐ*, পৃ. ১৫৪।
৩. তপন কুমার দে, *গণহত্যা '৭১*, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬৬।
৪. তাইবুল হাসান খান, 'মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া', *The Jhangirnagar Reviw*, Part-c, Vol-5, ১৯৯১, পৃ. ৭১-৭২।
৫. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) মুক্তিযুদ্ধ পর্ব*, ঢাকা, গ্রন্থলোক, ১৯৯১, পৃ. ৩১৮।
৬. *দৈনিক আজাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
৭. ডা. এম. এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি, ২০০২, পৃ. ২৪৪।
৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাঃ) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড*, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৩, পৃ. ১৩১।
৯. *দৈনিক আজাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
১০. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
১১. ডা. এম.এ হাসান, *প্রাগুক্ত*।
১২. দলিলপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।
১৩. *ঐ*, পৃ. ১৩৯।
১৪. মেজর (অবঃ) হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম, পিএসসি, 'মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া', *দৈনিক করতোয়া*, ১৬ মার্চ ২০০৪।
১৫. ডা. এম. এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, ওয়ার ক্রাইমস্ ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্টাডিজ সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ১৭৪-১৭৫।
১৬. সাক্ষাৎকার, এলাহী বক্স, দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র*, অষ্টম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩, পৃ. ১২২-১২৩।
১৭. *দৈনিক আজাদ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
১৮. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৪ মার্চ ১৯৭২।
১৯. ডা. এম.এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ঢাকা ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্ট্যাডিজ সেন্টার, ২০০১, পৃ.।
২০. সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১০০।
২১. মোঃ তাইবুল হাসান, *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
২২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র*, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫২৭।
২৩. রফিকুল হাসান, *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
২৪. আমিনুল হক বাবুল, *দৈনিক সংবাদ*, ৫ এপ্রিল ১৯৯৫।
২৫. মিলন রহমান, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪।
২৬. হস্তলেখা পাণ্ডুলিপি, *মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা*, উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, বগুড়া।
২৭. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট রেজাউল বাকী, বার কাউন্সিল ভবন, জজকোর্ট, বগুড়া, ১০ জানুয়ারি ২০০৬।
মোঃ রেজাউল বাকী, পিতা মোঃ আবুদল জলিল, স্থায়ী ঠিকানা : কালীবাড়ি, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া। পেশা : আইন ব্যবসা, জজকোর্ট, বগুড়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া আযিযুল হক কলেজে ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্র ছিলেন। সেই সময়ে ১৮/১৯ বছর বয়সেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ায় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন এবং প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন—দুটি দায়িত্ব সমানভাবে পালন করে নেতৃত্বের শিক্ষ থেকে সামনের কাতারে আসতে পেরেছিলেন। ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকবাহিনী এসে বগুড়ায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশ করার চেষ্টা করলে বগুড়ার সর্বস্তরের জনগণ ও ছাত্র-যুবক মিলে তা প্রতিরোধ করে। তোতা মিয়া প্রথম শহীদ হন। বগুড়ার পার্শ্ববর্তী নওগাঁ, জয়পুরহাট থেকে ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ এসে প্রতিরোধকামী জনতার সঙ্গে যোগ দেয়াসহ সেই সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক বর্ণনা পাওয়া যায় অ্যাডভোকেট রেজাউল বাকীর সাক্ষাৎকার থেকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে তাঁর বয়স ৫৪/৫৫ বছর।

২৮. সাক্ষাৎকার, এম. এ আজিজ, গ্রাম : বড় টেংরা, বগুড়া সদর, ১২ জানুয়ারি ২০০৬।
এম.এ আজিজ, পিতা : মেহের আলী মণ্ডল, গ্রাম : বড়টেংরা, থানা ও জেলা : বগুড়া সদর। এফ.এফ নং-৩৭৫৮, সামরিক সনদ নং-ম ৪৪৩১৫, স্মারক : ৩/৩৩/২০০২/১২৫১। বর্তমান বয়স ৬০ বছর। মুক্তিযুদ্ধকালে বয়স ছিল ২৪ বছর। ১৯৭১ সালে একটি ব্যাংকের পিয়ন ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। ১৯৭১ সালে বগুড়ার মহাস্থান এলাকায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারাদেশের মানুষ অসহযোগে যোগ দিলে তিনিও যোগ দেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে বালুরঘাটের কামারপাড়ায় প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণের পর পাতিরানপুর ক্যাম্প; অবশেষে উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য শিলিগুড়ির পাথরঘাটার পাহাড়ি এলাকায় গমন, ট্রেনিং গ্রহণ—তারপর তরঙ্গপুর হেড কোয়ার্টারে ২৮ দিন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ৭ নম্বর সেক্টরের হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দিনাজপুর, হিলি, বিরল, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি প্রভৃতি সীমান্তবর্তী এলাকায় তিনি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রামশহর-পীরবাড়ির কয়েকজনের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের কথা বললেন তিনি। পীরবাড়ির শহীদদের কথা স্মরণ করে তার এলাকায় নারীদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। রান্না, সংবাদ আদান-প্রদান এবং পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কের ভান করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ধরিয়ে দেওয়া থেকে তাদের আত্মবিসর্জন ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন তিনি তার সাক্ষাৎকারে।

২৯. সাক্ষাৎকার, মতিউর রহমান, অফিসপাড়া, ধুনট, বগুড়া, তাং ২১ মার্চ ২০০৬।

৩০. হস্তলেখা পাণ্ডুলিপি, *মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা*, উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, বগুড়া।

৩১. সাক্ষাৎকার, সুবল চন্দ্র দাস, কলেজ, রোড, শেরপুর, বগুড়া, তাং ৭ জানুয়ারি ২০০৭।

৩২. সাক্ষাৎকার, ডা. মোখলেছার রহমান বুলু, বাসস্ট্যান্ড, শেরপুর, বগুড়া, ১৫ জানুয়ারি ২০০৬।

৩৩. নিমাই ঘোষ, *দৈনিক করতোয়া*, ১২ ডিসেম্বর ২০০০।

৩৪. সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল জলিল, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শেরপুর কলোনীপাড়া, বগুড়া, তাং ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬।
মোঃ আব্দুল জলিল, গ্রাম : বিলনোথার, ইউনিয়ন : খামারকান্দি, থানা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া। বর্তমান : ঠিকানা : কলোনীপাড়া, বাসস্ট্যান্ড, শেরপুর, বগুড়া। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব আব্দুল জলিল ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে বগুড়ার পূর্বাঞ্চল বিশেষত, সারিয়াকান্দি হয়ে ধুনট এবং শেরপুর এলাকায় প্রবেশ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শেরপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর কমান্ডার ছিলেন। পরবর্তীকালে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জনাব আকরাম হোসেন খানের নেতৃত্বে শেরপুর মুক্ত হলে ১৫ ডিসেম্বর শেরপুরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন জনাব আমাউল্লাহ খান। সাক্ষাৎকার প্রদানকালে জনাব আব্দুল জলিল শেরপুর শহর, দড়িমুকুন্দ, ঘোগাব্রীজ প্রভৃতি স্থানে পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে শেরপুরের রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধীদের কথা তুলে ধরেন। বিহারীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কুখ্যাত মান্নান বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করেন। জনাব গাজীউর রহমান, অধ্যক্ষ রোস্তম আলী প্রমুখের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপ তুলে ধরেন।

৩৫. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২-৪২৩।

৩৬. মিলন রহমান, *প্রাগুক্ত*।

৩৭. স্বপন কুমার প্রামাণিক, *দৈনিক করতোয়া*, ১৫ ডিসেম্বর ২০০০।

৩৮. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৬ মার্চ ১৯৭২।

৩৯. আমিনুল হক বাবুল, *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বগুড়ার রণাঙ্গন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে পাকবাহিনী নিরপরাধ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির উপর যে পৈশাচিক হামলা চালায় তাতে ঢাকাসহ দেশের অনেক এলাকা আক্রান্ত হলেও ব্যতিক্রম ছিল বগুড়া। এইদিন বগুড়ার মুক্তিকামী জনতার তীব্র প্রতিরোধ পাকবাহিনীর আগমন রোধ করে দিলে বগুড়া মুক্ত থাকে এপ্রিলের ২১ তারিখ পর্যন্ত। ২২ এপ্রিল পাকবাহিনী বগুড়ায় প্রবেশ করে এবং ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন ও গণহত্যা শুরু করে। তারা বগুড়ার বিভিন্ন থানা সদরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে। পাকবাহিনীর লক্ষ্য ছিল (ক) মুক্তিবাহিনী যাতে জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে এবং (খ) মুক্তিবাহিনী যাতে কোনোভাবেই রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস করতে না পারে। সে উদ্দেশ্যে তারা জেলা শহরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিটি ব্রিজ, কালভার্ট এবং পুলে পাহারার ব্যবস্থা করে।

মুক্তিযোদ্ধারা এপ্রিল মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই অনেকে দেশ ছাড়া শুরু করে। ভারতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আবার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম গ্রুপটি গ্রুপ হিসাবে খ্যাত আবু সুফিয়ান এবং খোকন পাইকারদের গ্রুপটি জয়পুরহাটে পাকবাহিনীর হাতে মারা পড়ে। এরপর থেকেই বিভিন্ন গ্রুপ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থান ও ব্রিজ, কালভার্টে গেরিলা হামলা শুরু করে। তিন ধরনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল—(ক) গেরিলা যোদ্ধা, (খ) এফ.এফ বা সম্মুখ যোদ্ধা এবং (গ) বি.এল.এফ বা মুজিব বাহিনীর যোদ্ধা। এদের মধ্যে মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের মূল কাজ ছিল সংগঠিত করা। যে সকল মুক্তিকামী মানুষ ভারতে যেতে পারে নি কিন্তু যুদ্ধ করতে চায় তাদের ট্রেনিং দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে জনমত গঠন করাসহ নানাবিধ যুদ্ধ সহায়ক কাজ তারা সম্পন্ন করতো। তবে মুজিববাহিনী সর্বস্তরের জনসাধারণকে সংগঠিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন গেরিলা এবং সম্মুখ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছে গেরিলা বাহিনী সমগ্র বগুড়ায় বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করেছে। বগুড়ার অভ্যন্তরে সংঘটিত অধিকাংশ হামলা/আক্রমণ গেরিলা যোদ্ধারাই করেছে। অপরদিকে এ.এফ বা সম্মুখ যোদ্ধারা মুলত ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছে।

রণকৌশলগত দিক থেকে যুদ্ধের সময় বগুড়া দুইটি জোনে বিভক্ত ছিল। পূর্ব বগুড়া এবং পশ্চিম বগুড়া করতোয়া নদীর পূর্ব পাশের থানাগুলো যেমন সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, গাবতলী, ধুনট, শেরপুর থানার একাংশ—এই এলাকাগুলো ছিল পূর্ব-বগুড়ার মধ্যে। অপরদিকে দুপচাচিয়া, নন্দীগ্রাম,

Dhaka University Institutional Repository

কাহালু, আদমদীঘি, জয়পুরহাট, আক্কেলপুর, পাঁচবিবি এলাকাগুলো ছিল পশ্চিম বগুড়ার অন্তর্গত। বগুড়া সদর এবং তার আশপাশের এলাকাগুলোতে পূর্ব বগুড়ায় অবস্থানরত মুক্তি যোদ্ধারাই বেশি আক্রমণ পরিচালনা করেছে। এফ.এফ ট্রেনিং যারা নিয়েছিল বগুড়ার ভেতরে এরা কমই ছিল। অধিকাংশ বলতে গেলে ৯৫% মুক্তিযোদ্ধাই ছিল গেরিলা ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং বগুড়ার ভেতরে ২/৪টা ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ যুদ্ধই হয়েছে গেরিলা যুদ্ধ। বি.এল.এফ বা মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাও ছিল অনেক। বি.এল.এফ যোদ্ধারা বগুড়াকে দুইটা জোনে বিভক্ত করে নিয়েছিল। সমগ্র বগুড়ায় বি.এল.এফ এর কমান্ডার ছিলেন এ.বি.এম শাহজাহান। তবে ভেতরে ঢোকার পর তিনি নিজে পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্ব পালন করেন এবং নজিবুর রহমানকে দায়িত্ব দেন সদরসহ সমগ্র পূর্ব-বগুড়ায়।[১] গেরিলা বাহিনীর প্রধান কৌশল ছিল হিট এন্ড রান। অর্থাৎ আঘাত করো এবং নিজেকে রক্ষা করো। যতটা সম্ভব শত্রুর ক্ষতি সাধন করে নিজেকে রক্ষা করাই ছিল গেরিলা যুদ্ধের মূলমন্ত্র। এছাড়াও পাকবাহিনীর প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম—অর্থাৎ সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম প্রধান কাজ। যে কারণে ট্রেনিং সমাপ্ত করে যখন মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন তারা ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের সেতু যেমন—রেল সেতু, সড়ক সেতু, কালভার্ট এগুলো ধ্বংস করে একের পর এক বিভিন্ন গেরিলা দল। এছাড়াও বগুড়া জেলার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ট্রেন উঁড়িয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন থানা আক্রমণ করেছে, পাকবাহিনী ও রাজাকারদের চলতি পথে আক্রমণ করেছে—এরকম বহুমুখী আক্রমণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রাখতো। এ সম্পর্কে একজন মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য ছিল এরকম : "আমাদের উদ্দেশ্য ছিল লোকজনদেরকে জানান দেয়া যে মুক্তিযোদ্ধারা আছে ভেতরে, তোমরা ভয় পেয়ো না আর শত্রুপক্ষকেও বোঝানো যে, আমরা যেখানে সেখানে যখন তখন আক্রমণ করবো, তোমাদেরকে নির্বিঘ্নে সব কিছু করতে দেবো না।"[২]

বগুড়া জেলার অধিকাংশ যুদ্ধ-পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে পূর্ব-বগুড়াতে। কারণ পূর্ব বগুড়ার ৯০% লোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। রাজাকার, আলবদর দালাল এসবও ছিল কিন্তু তা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ফলে পূর্ব-বগুড়াতে মুক্তিযোদ্ধারা যত সহজে বিচরণ করতে পারত পশ্চিম বগুড়াতে অত সহজে তা পারত না। কারণ পশ্চিম-বগুড়ায় মুসলিম লীগ ও জামাতের প্রভাব বেশি ছিল যার ফলস্বরূপ ঐ এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আল-শামস ও দালালের সংখ্যা বেশি ছিল। পাকবাহিনীর দোসর বিহারীরা রেলশ্রমিক এবং শিল্পশ্রমিক হিসেবে বগুড়া সদর, সান্তাহার, শেরপুরের ঘোলাগাড়ী, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করে। সমতল ভূমি হওয়ায় ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পশ্চিমে অবস্থিত বগুড়ার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল তুলনামূলকভাবে পূর্ব বগুড়ার করতোয়া, বাঙালি, যমুনা বিধৌত পলল এলাকা থেকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাকবাহিনীর জন্য অধিক উপযোগী বা সহজ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস সমগ্র বাংলাদেশে তথা বগুড়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটেছিল। এই বৃষ্টিপাতের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা যত সহজে অপারেশন চালাতে পারত বিশেষ করে আক্রমণ ও প্রতিরোধ—পাকবাহিনী সহজেই এই পন্থা অবলম্বন করতে পারত না। উপরন্তু জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান, রাজাকার আব্দুল আলীমসহ যে কয়জন প্রভাবশালী স্বাধীনতা বিরোধী সেই সময় বগুড়ায় ছিল তাদের আবাসস্থলও ছিল পশ্চিম বগুড়ায়। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং নেতৃত্ব—এই ত্রিবিধ কারণেই বগুড়ায় সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব-বগুড়া এবং পশ্চিম-বগুড়ায় দুইভাবে বিস্তার লাভ করে। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি যে স্বতঃস্ফূর্ততায় পাকিস্তানি আবেগ ও ধ্বজাধারী ধর্মীয় মৌলবাণী প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে বগুড়ার পশ্চিমাঞ্চলের কিছু সংখ্যক মানুষকে আপ্লুত করতে পেরেছিল তার কারণ হিসেবে অশিক্ষা ও কুশিক্ষাকে দায়ি করা যায়। অন্যদিকে পূর্ব-বগুড়ার নদী বিধৌত এলাকার মানুষ—বিশেষত সারিয়াকান্দি, গাবতলী, সোনাতলা, ধুনট এবং শেরপুরের পূর্বপাশের মানুষজন প্রাকৃতিক কারণে পূর্ব থেকেই তুলনামূলকভাবে সাহসী, শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল ছিল। এজন্য তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণসহ সম্ভবপর সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

পূর্ব-বগুড়া : গাবতলী, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, ধুনট ও বগুড়া সদর এলাকায় সংঘটিত যুদ্ধ সমূহ

চক চকে ব্রিজ ধ্বংস : এক্সপ্লোসিভ অপারেশন

জুলাই মাসের দিকে গেরিলা বাহিনীর দুইটা গ্রুপ ভেলুরপাড়া রেল-স্টেশনের দক্ষিণে চক চকে ব্রিজটি ধ্বংস করে। এই অপারেশনে খাজা নাজিম উদ্দিনের গ্রুপ এবং শহিদুল ইসলাম ভেল্কুর গ্রুপের ১৫/২০ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজটি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রাত ১টা থেকে ২টার দিকে যায়। গ্রামের মানুষ ব্রিজটি পাহারায় ছিল। তারা অস্ত্রের মুখে চলে যেতে বাধ্য হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ২০ কেজি এক্সপ্লোসিভকে ৪ ভাগে ভাগ করে ব্রিজটির ৪ কোণায় বাঁধে। এক্সপ্লোসিভ বাধার কাজ করে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা। এরপর মাইন চার্জ করা হয়। মাইন চার্জ করার পর ব্রিজটির উভয় অংশই উড়ে যায়। এই অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেল যোগাযোগ ব্যাহত করা। উল্লেখযোগ্য যে সকল মুক্তিযোদ্ধা এই অপারেশনে অংশ নেয় তারা হলো—খাজা নাজিম উদ্দিন, হুমায়ুন আলম, শহীদুল ইসলাম ভেল্কু, মতিউর রহমান টুকু, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দি থানার দারোগা হত্যা : গ্রেনেড চার্জ

জুন মাসের ঘটনা। সারিয়াকান্দি থানায় একজন স্বাধীনতা বিরোধী অত্যাচারী দারোগা ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে রিপোর্ট আসল যে এই দারোগাকে হত্যা করতে পারলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এলাকাটা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হবে। জুলাই এর শেষ অথবা আগস্টের প্রথম দিকে একদিন ঐ দারোগা টম টমে করে বগুড়ায় আসছিল। আব্দুর রাজ্জাক খোকনের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা টিকি'র নেতৃত্বে কয়েকজন গেরিলা গ্রেনেড চার্জ করে ঐ দারোগাকে হত্যা করে।[৪]

হাট ফুলবাড়ির কাঠের ব্রিজ ধ্বংস

হাট ফুলবাড়ির ওখানে একটা কাঠের ব্রিজ ছিল। ঐ ব্রিজের উপর দিয়ে পাকসৈন্যরা যাতে যাওয়া-আসা না করতে পারে সেজন্য শফিকুল আলমের নেতৃত্বে ৮/১০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ১৪ আগস্ট বিকেলে লোহাগাড়া গ্রামের শেল্টার থেকে বের হয়। রাতের বেলা গেরিলা দলটি ব্রিজের আধা কিলোমিটার দূরে একটা কলাবাগানে শেল্টার নেয়। ওখান থেকে বাকা ও সুফী নামে দুজন যায় রেকী করতে। তারা খবর দেয় যে ওখানে ৪ জন লোক হারিকেন হাতে এ ব্রীজ থেকে ঐ ব্রীজ পর্যন্ত পাহারা দিচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে একটা বস্তার মধ্যে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল—২টা পিকস কিছু গ্রেনেড এবং স্টেনগান। শফিকুল আলম তাঁর দলসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে নিয়ে ব্রিজের নিচ দিয়ে প্রবাহিত খাল পার হয়ে ব্রিজের নিচে অবস্থান নেয়। ৩/৪ জনকে নিচে রেখে অন্যদেরকে পাহারায় পাঠায়। বাকা, সুফীসহ আরো দুজনে মিলে পিলারে পিক্স লাগিয়ে দেয়। এই পিক্সকে বাস্ট করতে হলে ব্রিজের উপরে ফিউজ লাগাতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল কডেক্স ও ডেটোনেটর দিয়ে সংযোগ করে ব্রীজের উপরে ফিউজ লাগিয়ে সব কাজ শেষ করে দেখে খাল পার হওয়ার সময় সঙ্গে থাকা ম্যাচটি ভিজে গেছে। তখন তারা উপায়ন্তর না দেখে একটা বুদ্ধি বের করল। পাশেই জেলেরা মাছ ধরছিল। তারা মাছ ধরে এসে ব্রিজ থেকে বাম দিকে একটা রাস্তা সারিয়াকান্দির দিকে গ্রামের দিকে গেছে সেখানে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, বিড়ি খাচ্ছিল। তখন একটা ছেলেকে বিড়ি ধরিয়ে আনার জন্য পাঠানো হয় এবং ঐ বিড়ির আগুন থেকে ফিউজে আগুন ধরানো হয়। তারপর দলটি দৌড়ে কালভার্ট পার হয়ে যখন ধান ক্ষেতে নামে তখন ব্রিম করে ডেটোনেটর বার্স্ট হয়ে ব্রিজটি উড়ে যায়। তারপর মুক্তিযোদ্ধা দলটি কলার বাগানের শেল্টারে গিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে হেঁটে হেঁটে বেপারীর ছদ্মবেশে গল্প করতে করতে সকাল ১০টার সময় লোহাগাড়া শেল্টারে ফেরত আসে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

ভেলুরপাড়া ট্রেন অপারেশন : এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন অপারেশন

১৫ আগস্ট কমান্ডার আব্দুর রাজ্জাক খোকনের নেতৃত্বে ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌকাযোগে এসে রেললাইনের কাছে একটা পাকুড় গাছতলায় অবস্থান নেয়। এটি ছিল বাংলাদেশের ১ম ও সর্ব বৃহৎ ট্রেন অপারেশন। এই অপারেশনে টুআইসি ছিল মুকুল। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরে ছিলেন—শফিকুল আলম, মিনু, বাঁকা, তাজু, ইজান আলী প্রমুখ। গ্রুপ কমান্ডার খোকন এবং শফিকুল—এই দুজন ছিল যথাক্রমে প্রকৌশল ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলের ছাত্র। এরা প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী ট্রেন উড়ানোর কাজটা করে। মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল এই ট্রেন অপারেশনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

যে সিস্টেমে অপারেশন করা হয়েছিলো ঐ সিস্টেমটা কিন্তু কেউ জানত না। প্রেশার মাইন অর্থাৎ এ্যান্টি ট্যাংকমাইন প্রেশারে বার্স্ট করা হল। কারণ ট্রেন উপরে উঠলে প্রেশার হবে, প্রেশার হয়ে তারপরে বার্স্ট করবে আমাদের টার্গেট তা ছিল না। আমাদের টার্গেট হলো ট্রেনের ইঞ্জিনসহ পেছনের বগি আমরা বার্স্ট করবো। ট্রেনের সামনে সব সময় খালি বগি জুড়ে থাকতো। ঐ বগিতে যদি মাইন বার্স্ট হয় তাহলে তো পাকবাহিনীর কোনো ক্ষতি হবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই তারা একটা বুদ্ধি বের করলো। তাদের কাছে যে ডেটোনেটর ছিল তা ছিল ইলেকট্রিক ডেটোনেটর। তো তারা মাইনের মধ্যে ফিউজটা না দিয়ে ঐ জায়গায় পিক্স ভরে তার ভিতর ইলেকট্রিক ডেটোনেটর ভরলো এবং তার পর কভেক্স দিয়ে কানেকশন দিল। ১০ হাত দূরত্বে তারা দুইটা মাইন বসিয়ে মাইনকে কানেক্টেড করলো কভেক্স দিয়ে। ইলেকট্রিক ডেটোনেটর দিয়ে তারা দুইটা মাইনের মধ্যে ফ্লুইড সিস্টেম করে দিল। এই তারটা নিয়ে তারা চলে গেল প্রায় ১৫০ গজ দূরে। ব্যাটারি দিয়ে এ কানেকশনটা করা হয়। আমরা ৮টা টর্চের ব্যাটারি একটা বাক্সের মধ্যে তুলে নিয়েছিল। ওটাকেই তারা ব্যাটারি বানিয়েছিল। নেগেটিভ-পজেটিভ বানিয়ে নিয়ে একটা কানেকশন দিয়ে রেখেছিল আর একটা হাতে ধরেছিল। টাচ করলেই বার্স্ট হবে এই সিস্টেম করেছিল। তারপর তারা দেখল যে একটা ট্রেন আসছে সোনাতলার দিক থেকে। তাদের সবকিছু রেডি আছে। তারা শুধু ব্যাটারি নিয়ে বসে আছে ১০০ হাত দূরে সংযোগ দেয়ার জন্য। সংযোগা দিলেই ওই মাইন দুটো বিস্ফোরিত হবে। ৮টার সময় একটা ট্রেন সোনাতলার দিক থেকে আসছে। ট্রেনটা যখন তাদের কাছাকাছি আসলো তখন দেখতে পেল সামনে দুইটা এনটি বগি আর পেছনে ইঞ্জিন তার পরে দুইটা কম্পার্টমেন্ট। তাদের টার্গেট ইঞ্জিনের পিছনভাগ যেখানে কয়লা থাকে ওখান থেকে দুইটা বগি। ট্রেনটা যখন তাদের মাইনের উপর আসছে অর্থাৎ একটি বগি পার হয়ে গেছে ইঞ্জিনের প্রথম ভাগে আসছে তখন যে লোকটাকে তার কানেকশনের জন্য রেখেছিল সে তার কানেকশন করে কিন্তু থাকে

Dhaka University Institutional Repository

না—ঠিক মতো লাগাতে পারে না। তখন আরেকজন গিয়ে সেটাকে সংযোগ দেয়। সংযোগ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বগি ড্রিম করে বিকট শব্দে মাইন দুটি বিস্ফোরিত হয়। ইঞ্জিনের পিছনের অংশসহ দুইটা বগি উঁড়ে গেল—উঁড়ে যাওয়ার পর তাদের অপজিটে শিকারপাড়া গ্রামের দিকে ফায়ার শুরু করল। অপারেশনকারীরা জিনিসত্র গুটিয়ে নিয়ে পানির ভিতর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে নৌকায় গিয়ে উঠল। যাই হোক পরে তারা তো আর নিজেরা দেখে যেতে পার নাই তবে শুনেছি যেসব মিলিটারী গাড়ি-টারি এসে ওখানে হুলস্থুল পড়ে গেছে। পরে শুনেছি ওখানে ৩ জন অফিসারসহ ৫০/৬০ জন আর্মি মারা যায়। অনেকের হাত ছিঁড়ে গিয়ে ১০ গজ দূরে পড়ে আছে পা ছিঁড়ে গেছে।[৬]

সারিয়াকান্দি থানা প্রথম আক্রমণ : গেরিলা অপারেশন

জুন মাসের প্রথমার্ধে গেরিলা কমান্ডার আহসান হাবিব ওয়ালেছ-এর নেতৃত্বে ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা নোবেল, ফজলু, দুলাল, সাইফুল প্রমুখ সারিয়াকান্দি থানা আক্রমণ করে। গেরিলারা থানাকে টার্গেট করে রাইফেল গ্রেনেড নিক্ষেপ করে কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আম গাছে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আমগাছের মোটা একটা ডাল ভেঙ্গে বিকট শব্দে থানার চালের উপর পড়লে থানার অভ্যন্তরে থাকা ৫/৭ জন বাঙালি পুলিশ ও ৮/১০ জন রাজাকার সারেন্ডার করে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট প্রাণভিক্ষা চায়। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ছেড়ে দেয়। সারিয়াকান্দি থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। অপারেশন সফল হয়।[৭]

সাবগ্রামের রাস্তায় বিস্ফোরণ : মাইন অপারেশন

পাকবাহিনীর পূর্ব বগুড়ায় ঢোকার প্রবেশ পথ ছিল দুইটি—একটি রেল রাস্তা আরেকটি গাবতলী রোড। গেরিলা কমান্ডার আহসান হাবিব ওয়ালেছ ও তার গ্রুপ পাকিস্তানিদের পূর্ব বগুড়ায় প্রবেশ বন্ধ করতে বগুড়ার যত কাছাকাছি সম্ভব রাস্তায় ও রেললাইনে মাইন পুঁতে রাখার উদ্দেশ্যে সাবগ্রামের কাছাকাছি এক গ্রামে শেল্টার নেয়। ওখান থেকে ৬ আগস্ট রাতের বেলা সাবগ্রামের সামনে রেল লাইনের নিচে একটা মাইন পুঁতে রাখে। পাশে সড়ক যোগাযোগের যে কাঁচা রাস্তা সেখানেও তারা দুটো মাইন পুঁতে রাখে। কিন্তু ট্রেন লাইনের নিচে পোঁতা মাইনটি বিস্ফোরিত হয় না। তবে রাস্তায় পুঁতে রাখা মাইন দুটির একটি ফেটে একটা আর্মির জীপগাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানে আর্মির ২জন অফিসার, ২ জন সৈন্য এবং একজন সিভিলিয়ানসহ ৫ জন মারা যায়। জীপ গাড়িটি প্রায় ৫০/৬০ হাত উপরে উঠে আছরে পড়ে। কয়েক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় গ্রেনেডটি ফেটে একটি রেসকিউ ট্রেন

Dhaka University Institutional Repository

বিধ্বস্ত হয়। এখানেও কয়েকজন পাকসৈন্য হতাহত হয়। এই অপারেশনে অন্যান্য গেরিলা যোদ্ধারা ছিল, নোবেল, বুলু, ওয়ালেছ।[৮]

ওয়াপদা পাওয়ার হাউস সাব সেকশন উড়াবার চেষ্টা : জীবন-মরণ প্রচেষ্টা

বগুড়া শহরের ওয়াপদা পাওয়ার হাউস সাব সেকশন উড়িয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে নোবেল, সাইফুল এবং আরশাদ তিনজন গেরিলা ১১ আগস্ট থেকে সন্ধ্যার পর মঙ্গলার ঘাট পার হয়। একটা কাঠের বাক্সে করে প্ল্যাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নিয়ে তার ভিতরে ডেটোনেটর, সেফটি ফিউজ, কডেক্সসহ সব কিছু ফিক্সড করে নেয়। এগুলোর সঙ্গে কয়েকটি গ্রেনেড নিয়ে তারা রওনা হয়। বনানীতে শেরপুর রোডে উঠে পরিকল্পিতভাবে রানীর হাট হয়ে ছিলিমপুরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় গ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে খান্দারের কাছে এক বড় পুকুরের পাড় দিয়ে যাবার সময় একদল রাজাকার, বিহারী ও ঐ এলাকার লোকজন দলটিকে ঘিরে ধরে ফেলে বেঁধে রাখে। এরা নবেলের গলায় দড়ি বাধে এবং একটা উঁচু টিবির মত জায়গায় বসায় এবং কাঠের বাক্স এবং তাদের গন্তব্য সম্পর্কে নানান রকম প্রশ্ন করতে থাকে—নিজেদের কাঠমিস্ত্রি হিসেবে পরিচয় দেবার পরও ওরা আর্মিদেরকে খবর দেয়। এমন সময়ে নবেল একটা দুঃসাহসিক কাজ করল একটা গ্রেনেডের পিন খুলে ওর লিভারের উপর চাপ দিয়ে বসল। গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবেল সাইফুল আর আরশাদকে গুতা দিয়ে ওকে ধরে রাখা লোকটাকে নিয়ে পাশের ডোবার ভিতর পড়ল। ডোবায় ঢুকে লোকটাকে দুটো ঘুষি দিয়ে ফেলে দিল। তারপর দিল দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে গলা থেকে দড়িটা খুলে ফেলল। সাইফুলকে সে রাতে ওরা ধরে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক অত্যাচার করে হত্যা করে। আরশাদ পালাতে পেরেছিল। নবেল মঙ্গলা ঘাট পার হয়ে পুরানো শেল্টারে ফেরত আসে।[৯]

আওলাকান্দির চরে অপারেশন : পাকবাহিনীর লঞ্চ ধ্বংস

আহসান হাবিব ওয়ালেস-এর দলের সমস্ত এ্যামুনেশন ছিল আওলাকান্দির একটা চরের ভেতরে। সাইফুল ধরা পড়ার পর প্রচণ্ড নির্যাতনের কারণে এ্যামুনেশনের কথা আর্মিদের বলে দেয়। তখন ওরা দু'টি লঞ্চ নিয়ে আওলাকান্দির চরের দিকে যায়। কিন্তু পাকিস্তানিরা পৌঁছানোর আগেই নবেলসহ আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মিলে এ্যামুনেশনগুলো সরিয়ে ফেলে। নবেলের গ্রুপটা লঞ্চটাকে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আক্রমণ করে। তারা চরের চ্যানেলের মধ্যে লঞ্চটাকে ঢুকতে বাধ্য করে কারণ ওখানে পানি কম ছিল। তারপর তারা প্রথমে ফায়ার করে এরপর রাইফেল, গ্রেনেড এবং রকেট লাঞ্চার চার্জ করে। এতে করে লঞ্চটি বিধ্বস্ত হয়। এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করে নবেল, বুলু,

Dhaka University Institutional Repository

ফজলু ও আওলাকান্দির দুজন ছেলে। এ্যামুনেশনগুলো হাট বারনজাতে ফজলুর বাড়িতে রাখা হয়। গ্রামের লোকজন নৌকা দিয়ে সহযোগিতা করে।[১০]

সারিয়াকান্দির যুদ্ধ : পশ্চাদপসারণ

রমজান মাসের ১ তারিখে সারিয়াকান্দি থানায় নারচীর আগে বাঙালি নদীর তীরে এই যুদ্ধটা হয়। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের দুইটা গ্রুপ ছিল। শোকরানা (রানা)-র গ্রুপ এবং মিজানুর রহমান রতনের গ্রুপ। সব মিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ২৪/২৬ জন অপরদিকে পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল ১৩/১৪ জন। পাকবাহিনীর সদস্যরা লাইন ধরে বাঙালি নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে মার্চ করতে করতে আসছিল এবং অকথ্য ভাষায় বাঙালিদের গালি দিচ্ছিল। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা লাইন ধরে রাস্তার পাশে এ্যাম্বুশ নিয়েছিল। পাকবাহিনীর সদস্যরা তাদের ভারী অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে প্রচুর গোলাগুলি করছিল অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারাও রীতিমতো গোলাগুলি করছিল। অবশেষে পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর ৩ জন যোদ্ধা শহীদ হয়। পাকবাহিনীর ৫/৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়।[১১]

রামচন্দ্রপুর গ্রামের অপারেশন

১৬ আগস্ট সৈয়দ ফজলুল আহসান দিপুর দল সারিয়াকান্দি থানার নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে পাকবাহিনীর সাথে এক ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রচুর গোলাগুলির পর ময়নুল হক নামে সারিয়াকান্দি থানার এক দারোগা, ৫ জন পাকসৈন্য ও কয়েকজন রাজাকার নিহত হয়।[১২]

লাঠিমারঘোন গ্রামের নিকটবর্তী ব্রিজ ধ্বংস : মাইন অপসারণ এবং ব্যাপক নির্যাতন

আগস্ট মাসের মধ্যভাগে একদিন রাত তিনটার সময় মিসবাহুল মিল্লাত নান্নার নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা কালাইহাটা শেল্টার থেকে এসে লাঠিমারঘোন গ্রামের নিকটবর্তী ব্রিজটি ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দেয় এবং ব্রিজের দুই ধারে ৫০/৬০ গজ দূরে দুটি মাইন মাটির নিচে পুঁতে রেখে তারা চলে যায়। খবর পেয়ে পরেরদিন সকালে পাকসেনারা পশ্চিম দিকের মাইনটি তুলে নিয়ে যায় কিন্তু পূর্ব দিকের মাইনটির সন্ধান তারা পায় নাই। তার পরের দিন খুব ভোরে কয়েকটি গরুর গাড়ি পাট নিয়ে গাযতলী বন্দর যাচ্ছিল একটি গরুর গাড়ির চাকা মাইনের উপর পড়লে মাইনটির বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে গাড়িটি পিছন ভিন্ন হয়ে উড়ে যায়। একজন গাড়োয়ানের মৃত্যু হয় অপর জন মারাত্মক আহত হয়। পরের দিন সারিয়াকান্দি ক্যাম্প থেকে পাকসেনারা এসে লাঠিমারঘোন গ্রামসহ আশেপাশে ব্যাপক নির্যাতন চালায়।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ঠনঠনিয়া রেলওয়ে ব্রিজ এবং ঠনঠনিয়া ব্রিজ : সফল অপারেশন

গেরিলা কমান্ডার মিসবাহুল মিল্লাত নান্নার গ্রুপ বগুড়ায় প্রবেশ করার পর প্রথম অপারেশন করে ঠনঠনিয়া রেলওয়ে ব্রিজ এবং ঠনঠনিয়া ব্রিজে। এই গেরিলা দলটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকবাহিনীর পূর্ব বগুড়ায় প্রবেশ পথে বাধা সৃষ্টি করা। একই দিনে তারা গাবতলী থানা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলেও পরবর্তীতে সময় স্বল্পতার কারণে গাবতলী থানা আক্রমণ করতে পারে নাই। এই গেরিলা দলটি শেল্টার নিয়েছিল কালাইহাটা গ্রামে। ওখান থেকে নৌকাযোগে অপারেশনে আসতে হতো আর মাঝি মাল্লারা যে সময়টা দিত সেই সময়টা ২ ঘন্টার ব্যবধান হতো। এই অপারেশনে অংশ নেয় মিসবাহুল মিল্লাত নান্না ও জহুরুল ইসলাম। নান্না প্রথমে রেলওয়ে ব্রিজের এক সাইডে কাটিং চার্জ লাগিয়ে দিয়ে জহুরুলকে অন্য প্রান্তে কার্টি চার্জ লাগাতে বলে। আর নান্না চলে যায় রাস্তার উপরের ব্রিজটা ড্যামেজ করার জন্য। ওখানে এক্সপ্লোসিভ, জেটেন চার্জ, কাটিং চার্জ লাগানোর পর নান্না সিগনাল দিলে জহুরুল এক্সপ্লোসিভে ফায়ার করে দেয়। দুইটি ব্রিজ উড়ানোর শব্দ পেয়ে গ্রামের লোকজন সব পূর্ব দিকে দৌড়ায়। এর ভিতরে জহুরুল আসলে নান্না ও জহুরুল তাদের আর.বি পয়েন্ট দাল মাদ্রাসার ওখানে রাখা নৌকায় করে কালাই হাটায় ফেরত যায়। এই অপারেশনে দুইটা ব্রিজই ড্যামেজ হয়ে যায়।[১৪]

ধুনট থানা দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ : রকেট লাঞ্চার প্রয়োগ

দ্বিতীয় দফায় মিসবাহুল মিল্লাত নান্নার গ্রুপের ৩২ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে ধুনট থানা আক্রমণ করে। এই আক্রমণে টুআইসি ছিল ফারুক। ডা. মতিয়ার রহমানসহ ৩/৪ জন লোক বিভিন্নভাবে ধুনট থানা রেকী করে শত্রুর সংখ্যা, অবস্থান এসব তথ্য সংগ্রহ করে জানানোর পর গেরিলা দলটি রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ধুনট থানায় আক্রমণ করে। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল রকেট লাঞ্চারটি গিয়ে থানার দরজায় লাগে ঘরের ভেতরে ঢুকবে এবং এটা বাস্ট হওয়ার সাথে সাথে থানার ভেতরে অবস্থান গ্রহণকারীরা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু রকেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণে ওরা থানার ভিতর থেকে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। এরই মধ্যে টেলিফোনের তার কেটে দেয় মুক্তিযোদ্ধারা। প্রায় ১ ঘন্টাব্যাপী গোলাগুলি বিনিময়ের সময় জহুরুলের পায়ে গুলি লাগে। তখন পঞ্চম বর্ষ মেডিকেলের ছাত্র মতিয়ার রহমান জহুরুলকে নিয়ে চলে যায়। গ্রুপ কমান্ডার নান্না তাঁর হাতের স্টেনগানটির Magazine load করে তিনটা Magazine হতে নিয়ে থানার ব্যারাকের দিকে অগ্রসর হয়। তখন বাজে সকাল ৮টা কিংবা সাড়ে আটটা। একজন মুক্তিযোদ্ধা নান্নার সাথে এসে দরজা জানালায় আঘাত করে এ সময় অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও চলে আসে। তখন বাইরে থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ভেতরে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থানরতদের প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালে ওরা তাতে সাড়া দেয়। অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে প্রায় ২৩ জনের মত বের হয়। থানার সেকেন্ড অফিসার পালিয়ে যায়। পরে এদেরকে বেধে ফেলে মুক্তিযোদ্ধারা ওখানে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে দেয়। থানার সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রসহ রাজাকারদের ১টা বিস্কিট ফ্যাক্টরি চালের ওপর পাওয়া যায়। ফেলে যাওয়া দুইটা রাইফেলও পাওয়া যায়। ওদেরকে সকাল সাড়ে ৯টা ফল ডাউন করিয়ে সাড়ে ১০টার সময় যখন মুক্তিযোদ্ধারা ফেরত আসছিল তখন ৪/৫ শ'র মত লোক থানার সামনে জড়ো হয়ে বলে যে : আপনারা তো এখনই চলে যাবেন। একটু পরেই তো আর্মিরা আসবে। আমরা তো কোনো কিছুই নিতে পারবো না। আমাদের অন্তত দুইটা ঘণ্টা সময় দেন আমরা আমাদের ধন-সম্পদ, মা-বোনদের সরিয়ে ফেলি। এলাকার মানুষের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা দলটি বিকেল পর্যন্ত ঐ এলাকায় অবস্থান করে এবং বথুয়াবাড়ি ঘটে রকেট লাঞ্চার নিয়ে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা আজাদ, ইদ্রিসসহ দুইজনকে পাহারায় বসানো হয়। ওখানে একটা ছোট ব্রিজ ছিল সেটাকে ধ্বংস করতে গেলে গ্রামবাসীর অসম্মতির কারণে ব্রিজটির দু'পাশ কেটে জলমগ্ন করে দেয়া হয় গ্রামবাসীর সহায়তায়। সন্ধ্যার সময় গ্রুপটি তাদের কালাই হস্টা শেল্টারে ফেরত আসে।[১৫]

রানীরপাড়ায় বাঙালি নদীতে স্পীডবোট উল্টানো : চোরাগোপ্তা হামলা-সাফল্য

বাঙালি নদী মহিমাগঞ্জ থেকে সোনাতলার ভিতর দিয়ে সারিয়াকান্দি এসে পৌঁছেছে। এই বেল্টে পাক আর্মি স্পীডবোট দিয়ে টহল দিত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জানা গিয়েছিল যে পাকিস্তানিরা সাঁতার জানে না। আগস্ট মাসের দিকে একদিন রানীরপাড়া প্রাইমারী স্কুলে ওঠে পাকবাহিনীর কনভয়। এমন সময়ে আরও খবর পাওয়া গেল যে স্পীডবোট নিয়েও আর্মিরা আসছে। রানীরপাড়া গ্রামটি বাঙালি নদীর পূর্ব পার্শ্বে। পশ্চিম পার্শ্বে ছিল কাবিলপুর গ্রাম। পাকিস্তানি আর্মিদের নিয়ে যখন একটি স্পীডবোট পূর্ব পার্শ্বে থামে অর্থাৎ স্পীডবোট থেকে নামার পূর্ব মুহূর্তে কাবিলপুর থেকে আগত কয়েক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে চোরাগোপ্তাভাবে ডুব সাঁতার দিয়ে স্পীডবোটটি উল্টে দেয়। এর ফলে তৎক্ষণাৎ ৪ জন পাকসেনার সলিল সমাধি ঘটে। তখন ছিল আগস্ট মাস এবং বৃষ্টির দিন। স্রোতের তোড়ে ভেসে যাওয়া পাকিস্তানিদের আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এরকম দুঃসাহসিক এবং চোরাগোপ্তা হামলার সম্মুখিন হতে হয়েছে পাকবাহিনীকে প্রতিনিয়তই।[১৬]

সুখানপুকুর রেল স্টেশন আক্রমণ

পাকবাহিনীর পূর্ব বগুড়ায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে অবস্থানগত কারণে সুখান পুকুর স্টেশনটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্টেশনটা গাবতলী এবং সোনাতলার মাঝখানে অবস্থিত। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারাও

Dhaka University Institutional Repository

চাচ্ছিল তাদের উপস্থিতি এবং কর্মতৎপরতা সম্পর্কে পাকবাহিনীকে জানান দিতে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আহসান হাবিব ওয়ালেছ তার গ্রুপের অপর ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নবেল, ফরহাদ, ফজলু এবং বুলুকে নিয়ে হাট-করমজা থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে সুখানপুকুর বন্দরে যায়। পূর্বেই রেকী করে জানা গিয়েছিল যে ওখানে ৪০/৫০ জন রাজাকার ও মিলিশিয়া আছে এবং ঘুমটি ঘরের মধ্যে ৫টি রাইফেল আছে। ওখান থেকে রাজাকার-আল্-বদরের সহযোগিতায় বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে অপারেশন করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্ল্যান ছিল এদের আস্তানাটা ভেঙ্গে দেয়া এবং লোকজনকে জানান দেয়া যে, মুক্তিযোদ্ধা আছে ভেতরে এবং শত্রুপক্ষকেও বোঝানো যে, এরা যখন তখন যেখানে সেখানে আক্রমণ করবে। মুক্তিযোদ্ধা দলটি গ্রামের মানুষের ছদ্মবেশে কয়েকটি গ্রেনেড এবং থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের গুলি সঙ্গে নিয়েছিল। তাঁদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না কারণ তাদের পরিকল্পনা ছিল শত্রুর অস্ত্র দখল করে ওগুলো দিয়েই তাদেরকে ঘায়েল করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী নবেল ও বুলু যে ঘুমটি ঘরের দরজার সামনে গ্রেনেড মারল। বুলুরটা ফাটল কিন্তু নবেলেরটা ফাটল না। তখন নবেল আরেকটা গ্রেনেড মারল। রাজাকার মিলিশিয়ারা দৌড়ে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। নবেল জীবনের রিস্ক নিয়ে পিনখোলা তাজা গ্রেনেডটার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে ঘুমটি ঘরে প্রবেশ করে রাইফেল নিল। তবে রাইফেলের ভেতর চেম্বারে কোনো গুলি না থাকায় তিনি অত্যন্ত দ্রুত নিজের কাছে থাকা গুলি ভরে একটা ফায়ার করল। অতঃপর ওখানে থাকা ৪/৫টা রাইফেল নিয়ে দৌড়ে পাট ক্ষেতের ভেতরে প্রবেশ করে। এবং ৪টা রাইফেল ক্ষেতের একপাশে রেখে দৌড়াল। কিছুক্ষণ পর রাজাকার মিলিশিয়ারা পাট ক্ষেত লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করলে তিনিও পাল্টা গুলি করেন। একটা গুলি একজনের গায়ে লাগে এবং আরেকটা আরেক জনের পায়ে লাগে। দৌড়ে বন্দরের ভেতরে প্রবেশ করলে ফরহাদ এবং ওয়ালেছ এসে অস্ত্রের অবস্থান জেনে নিয়ে সেই অস্ত্র দিয়ে স্টেশনঘর দখল করে। স্থানীয় একজন দোকানদার তার দোকান থেকে কেরোসিন দিলে সেই কেরোসিন দিয়ে স্টেশন ঘরটা পুড়িয়ে দেয়। বিকেল চারটা-সাড়ে চারটার দিকে তাঁরা হাট-করমজার দিকে চলে আসে। পথিমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, পাকবাহিনী আসছে একদম ব্রাশ-ফায়ার করতে করতে। এর পর তারা আশেপাশের কিছু গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়।[১৭]

মাদলা আক্রমণ : রাজাকার বনাম মুক্তিযোদ্ধা

বগুড়া শহরের ১০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে মাদলা ইউনিয়নে পাকবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল যেখানে রাজাকার-আলবদরদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ৭১-এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে রেজাউল বাকীর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পটির উত্তর এবং পশ্চিম দিকে অবস্থান নেয়। বেলা ১১টার

Dhaka University Institutional Repository

সময় মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার শুরু করে। রাজাকাররাও পাল্টা ফায়ার করে। এভাবে ২টা পর্যন্ত চলার পর রাজাকাররা পূর্ব দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা এখান থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করে।[১৮]

পশু ডাক্তারখানার ট্রান্সমিটার ধ্বংস : পাকবাহিনীকে চাপে ফেলার রণকৌশল

বগুড়া পশু ডাক্তারখানার নিকটস্থ ট্রান্সমিটারটি ধ্বংস করার কাজে নিয়োগ করা হয় ১২/১৪ বছরের এক কিশোরকে। কারণ তখন জেলার অন্যান্য স্থানে আক্রমণ হলেও শহরের ভেতরে তেমন কোনো অপারেশন হচ্ছিল না। তাই রামেশ্বরপুরে ছাত্রলীগ সভাপতি মমতাজ উদ্দিনের বাড়িতে শেল্টারে থাকা আব্দুর রাজ্জাক খোকনের গ্রুপের গেরিলারা সেখান থেকে কয়েকজন কিশোরকে জোগাড় করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী কিশোরকে পাঠানো হয় পশু ডাক্তারখানার নিকটস্থ ট্রান্সমিটারটি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। এক্সপ্লোসিভের সাথে তার লাগানো ফিউজে আগুন দেয়া এসব শিখিয়ে দেয় খুব ভালভাবে। ফিউজে আগুন লাগিয়েই ছেলেটি দৌড়ে দূরে চলে যায়। ট্রান্সফরমারটি বার্স্ট হয়ে যা। এভাবে এক কিশোর ছেলের দুর্দান্ত সাহসিকতার ফলে সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকায় গিয়েও পাকবাহিনীকে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে মুক্তিযোদ্ধারা বসে নেই। তারা তোমাদের যে কোনো জায়গায় আক্রমণ করতে সক্ষম।[১৯]

নারচী ও গণকপাড়ার যুদ্ধ

সারিয়াকান্দি থানার নারচী ইউনিয়নের নারচী ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম গণকপাড়ায় পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২০ অক্টোবর নারচী ও পার্শ্ববর্তী গণকপাড়া গ্রামে পাকবাহিনীর সঙ্গে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সৈন্যদের চারটি দলের এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ সকাল ৭টা হতে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা স্থায়িত্ব লাভ করে। এই সব দলের মধ্যে তোফাজ্জল হোসেন মকবুল (চাহরিনা), সৈয়দ ফজলুল আহসান দিপু, শোকরানা (রানা), আব্দুস সালাম (বুলবুল) রেজাউল বাকী, গোলাম মোস্তফা (গাবতলী) কামাল পাশা (বৃন্দাবন পাড়া) রিজাউল হক মঞ্জু (ধাওয়া), স্বপন এবং (হুয়াকুয়ার) রেজাউল করিম মন্টু, আখতার হোসেন (বুলু), আতোয়ার হোসেন (গামা), আব্দুর রাজ্জাক (হানজু), আব্দুল বারী ও অন্যান্য গেরিলাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ হয়, সেই সময় গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবনের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। তখন এলোপাথারি গুলি চলতে থাকে। পাকসেনার দল দিপুর দলকে ঘিরে ফেলে। উপায়ান্তর না দেখে দিপুর দল গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। তৎপর

Dhaka University Institutional Repository

গণকপাড়া ঈদগাহ মাঠে গেরিলা বাহিনী পজিশন নিয়ে তুমুল গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে। পাকসৈন্যরা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা প্রবল আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে গেরিলা বাহিনী টিকতে না পেরে অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় পাকবাহিনী গণকপাড়া গ্রামের কতিপয় মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর গণকপাড়া গ্রামের বহু বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এদিকে শোকরানার দল ও অন্যান্য দলের ৫০/৬০ জন গেরিলা যোদ্ধা উত্তরপাড়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে পজিশন নেয়। হানাদার বাহিনীর সঙ্গে গেরিলা বাহিনীর পাল্টা গোলাগুলি চলতে থাকে। ঐ সময় হানাদার বাহিনী টিওরপাড়া গ্রামের ১২ জন গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। গেরিলা বাহিনীর গোলাগুলিতে পাকবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ৯ জন পাকসেনা নিহত হয়। তারপর সারা রাত পাকবাহিনীর সঙ্গে গেরিলা বাহিনীর বাশগাড়ি ও নারচীতে প্রবল গোলাগুলি চলার পর ভোরবেলা পাকবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এই ঘটনার দুই দিন পর তিনদিক থেকে পাকসেনা নারচী গ্রামে প্রবেশ করে গ্রামের বহু বাড়িঘর পুড়ে ভস্মিভূত করে।[২০]

জয়ভোগা গ্রামের নিকট সারিয়াকান্দি রোডে মাইন বিস্ফোরণ

গাবতলী থেকে ৪/৫ কিলোমিটার পূর্বে জয়ভোগা গ্রামের পাশে সারিয়াকান্দি রোডে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আব্দুল আজিজ রঞ্জুর গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা একটি এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে রাখে। রাস্তাটি ছিল মাটির—মাটি সরিয়ে ওখানে এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পজিশন মতো প্লেস করে দিয়ে খুব হালকাভাবে মাটি দিয়ে তার উপর ময়লা দিয়ে ঢেকে দেয় আব্দুল আজিজ রঞ্জু এবং জহির। তারপর আব্দুল আজিজ রঞ্জু তার পুরো গ্রুপ নিয়ে দেড়-দুই কি. মি. দূরে চলে যায়। ইতিমধ্যে ৫ জন আর্মি নিয়ে একটি গাড়ি মাইনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় মাইনটি বিস্ফোরিত হয়। গাড়িটি উড়ে গিয়ে রাস্তার নিচে পড়ে। এখানে ৩ জন খান সেনা মারা যায়। ২ জন আহত হয়।[২১]

হাট-ফুলবাড়ী অপারেশন

আব্দুল আজিজ রঞ্জুর গ্রুপ সারিয়াকান্দির হাট-ফুলবাড়ীতে একটা খাদ্যবাহী গরুর গাড়িতে আক্রমণ করে। ফুলবাড়ী খেয়াঘাট পার হয়ে ২ জন রাজাকার এগুলো নিয়ে যাচ্ছিল পাকবাহিনীর জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের কালে ২ জন রাজাকারই নিহত হয়। গাড়োয়ান আহত হয় এবং গাড়ীটা জ্যাম্প হয়ে যায়।[২২]

ফুলবাড়ী খেয়াঘাট এ্যাম্বুশ

পাকবাহিনী, পুলিশ, রাজাকার, আলবদররা প্রতিদিন ফুলবাড়ী খেয়াঘাট পার হয়ে গাবতলী সারিয়াকান্দির দিকে যেত। ৪ অক্টোবর সকালে পাকিস্তানি পুলিশের একটি দল বগুড়ায় যায় খাদ্য

Dhaka University Institutional Repository

আনার জন্য। মুক্তিবাহিনীর নিকট খবর পৌঁছে যায় যে ওরা এই রাস্তা দিয়েই ফিরবে এবং ওদেরকে খেয়া পার হতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুজিব বাহিনীর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এবং গেরিলা বাহিনীর সৈয়দ আহসান হাবিব দিপুর দল ফুলবাড়ী খেয়াঘাটে এ্যাম্বুশ করে থাকে। ৬ জন পাকিস্তানি পুলিশের দলটি খাদ্য নিয়ে সারিয়াকান্দি ফেরার পথে যখন ফুলবাড়ী ঘাটে খেয়া নৌকায় উঠে মাঝ নদীতে পৌঁছে তখন মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল ও মেশিনগান দ্বারা গুলি বর্ষণ করতে থাকে, ফলে দুই জন পুলিশ নিহত হয়। একজন ধরা পড়ে এবং ২/৩ জন পালিয়ে যায়। পাক পুলিশের ৬টি রাইফেল ও কিছু খাদ্য সামগ্রী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আসে। এই অপারেশনে অংশ নেয় মুজিব বাহিনীর মোফাজ্জল হোসেন, গোলাম জাকারিয়া রেজা, রেজাউল করিম মন্টু, সাইদুল ইসলাম এবং সৈয়দ আহসান হাবিব দিপুর দল।[২৩]

ভেলুরপাড়া ও সুখানপুকুরের মাঝখানে প্রথম ট্রেন অপারেশন

গেরিলা কমান্ডার শাহ্ মোখলেছুর রহমান দুলুর গ্রুপ মহিমাগঞ্জ থেকে সোনাতলা ভেলুর পাড়া এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অপারেশনে অংশগ্রহণ করে। এ সময় তাঁরা ট্রেনই অপারেশন করে তিনবার। একবার ব্যর্থ হলেও পরবর্তী দুইবার সফল ট্রেন অপারেশন চালায়। এ সময়ে এই গেরিলা বাহিনীকে পাকবাহিনীর ট্রেনের আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করত অনেক স্টেশন মাস্টার এবং স্টেশনের লোকজন। এদের মাধ্যমেই অক্টোবরের প্রথম দিকে দুলুর গ্রুপ জানতে পারে যে সৈয়দপুর থেকে বোনারপাড়া জংশন হয়ে একটি সৈন্যবাহী ট্রেন এই এলাকায় আসবে। সেই ট্রেনটি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধারা সরকার বাড়ির পেছনের রেললাইনে মাইন পুঁতে রাখে। কিন্তু ট্রেন আসার ১৫ মিনিট পূর্বেই মাইন বিস্ফোরিত হয়ে গেলে সেদিন আর ট্রেনটি আসে না।

পরের দিন রাতের বেলা ট্রেনটি আসার সংবাদ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যায়। পুনরায় অপারেশনের প্রস্তুতি নেয়। হামিদ ও মানিক দুপুর ২টার সময় রেকী করে সব ক্লিয়ার দেখে আসে। রাতের বেলা ২৫/৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা দুলুর নেতৃত্বে অপারেশনে যায়। এখানে আইজি ছিল ইস্রাফিল হোসেন। বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পাথর সরানোর কাজ করে। এ্যান্টি-ট্যাংক মাইনের সাহায্যে ট্রেনটি উড়ানো হয়। এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাপ সৃষ্টি করে গ্যাপে গ্যাপে ৮/১০টা মাইন পোঁতা হয়। এখানে মাটি ও পাথর সরানোর কাজে কিছু স্থানীয় লোকেরও সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এরপর প্রতিটা মাইনের সাথে তার সেট করতে করতে যাদেরটা সেট করে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ১০০ গজ দূরত্বে নিরাপদ অবস্থানে চলে যায়। অতপর ট্রেন আসার পরে ফিউজ লাগানো হয়। ফিউজে আগুন দেয়ার পর পরই মাইন বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণে ট্রেনটার শেষের দিকের ১টা বগি ছাড়া সব বগি ধ্বংসপ্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ফলে ৪ জন পাক ইঞ্জিনিয়ারসহ ১৪৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। এই অপারেশনটা ছিল খুবই ফলপ্রসূ। এখানে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিল আঃ হামিদ, মানিক, মোখলেছুর রহমান, ওমর ফারুকসহ প্রায় ২৫/৩০ জন।[২৬]

ওয়াপদা পাওয়ার হাউস আক্রমণ

প্রথমবার ওয়াপদা পাওয়ার হাউস আক্রমণ করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়া এবং সঙ্গী সাইফুলকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেল তাঁর গ্রুপ কমান্ডার আহসান হাবিব ওয়ালেছ-এর নেতৃত্বে পুনরায় ওয়াপদাতে আক্রমণ করে। কৈচর থেকে রওয়ানা হয়ে ওয়াপদাতে আসে এবং ওয়াপদার ভেতরে প্রচণ্ড গোলাগুলি করে। গ্রেনেড চার্জ করে। ওয়াপদার বাইরে দিয়ে যে লাইনটা গিয়েছিল সেখানটায় দুইটা পোলের সাথে সংযুক্ত ট্রান্সফরমারটিতে ব্রাশ ফায়ার করে ফলে ওখানে আগুন লেগে যায়। ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরস্থ সব তেল বের হয়ে যায়। এখানে ৬ জন খানসেনা ও ১০ জন রাজাকার নিহত হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে এই অপারেশনটা করা হয়েছিল।[২৫]

সূত্রাপুরের ট্রান্সফারমার উড়ানো

অক্টোবর মাসের দিকে নবেল এবং দুদু দুজনে মিলে পাকবাহিনীকে বগুড়া শহরের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানান দেয়ার উদ্দেশ্যে সূত্রাপুরের ট্রান্সফরমারটাকে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বাস্ট করে রাস্তায় ফেলে দেয়।[২৬]

নারুয়ামালা হাটে ট্রেনে এ্যাম্বুশ এবং জয়ভোগা গ্রামের রেলওয়ে ব্রিজ আক্রমণ : পাকবাহিনীর পিছু হটা শুরু

গাবতলী থানার নারুয়ামালা হাটের ওখানে বি.এল.এফ, এফ.এফ মিলিয়ে কয়েকটা গ্রুপ যুদ্ধের শেষের দিকে ২৫ নভেম্বর একটি পাকিস্তানি ট্রেনে এ্যাম্বুশ করে আঘাত হানে। একেকটা গ্রুপকে একেক জায়গায় দায়িত্ব দেয়া হয়। গাবতলীর নিকটস্থ জয়ভোগা গ্রামের রেলওয়ে ব্রিজ পাহারায় ছিল বেশ কিছু পাকবাহিনীর সদস্য ও রাজাকার। একদল মুক্তিযোদ্ধা এই ব্রিজ দখল করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলে পাকসৈন্যরা গাবতলী থানাস্থ ক্যাম্পের দিকে পালিয়ে যায়। দুই ঘণ্টা পর পাকসৈন্য বোঝাই একটি ট্রেন গাবতলী স্টেশনে আসে এবং সৈন্যরা জয়ভোগা ও বহুগুণী গ্রামের ভিতরে গুলি বর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হয়। ফলে বাইগুলি গ্রামের আবুল হোসেনসহ কয়েকজন গ্রামবাসী নিহত

Dhaka University Institutional Repository

হন। এমতাবস্থায় নেপালতলী গ্রামের দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটি দল এসে পাল্টা আক্রমণ চালালে পাকসৈন্যরা গাবতলী ক্যাম্পে ফিরে যায়।[২৭]

মোকামতলা ও সোনাতলায় মধ্যবর্তী সড়ক-সেতু ধ্বংস : পাকবাহিনীর ক্যাম্প অপসারণ

গেরিলা যোদ্ধাদের কাজই ছিল মূলত কমিউনিকেশন নষ্ট করে দেয়া। যুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছুদিন আগে গোলাম জাকারিয়া খান রেজা তার গ্রুপের ২০/২৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে মোকামতলা থেকে সোনাতলায় যাওয়ার সড়ক-সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকবাহিনীর সড়ক যোগাযোগ ধ্বংস করে দেয়া। যাতে করে সোনাতলাকে আগে মুক্ত করা যায়। কারণ এর পর ওদের কমিউনিকেশন বলতে থাকবে রেল পথ। মুক্তিযোদ্ধারা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্রিজটাকে ধ্বংস করে। ডেটোনেটর দিয়ে পুরো ব্রিজটাকে জড়িয়ে দেয় রেজা, ফিরোজ এবং আশরাফসহ আরো তিনজন আর বাকীরা ছিল এ্যালার্ট পজিশনে। ব্রিজটা উড়িয়ে দেয়ার পর পাকিস্তানিরা সোনাতলা থেকে তাদের ক্যাম্প উঠিয়ে নিয়ে যায়।[২৮]

তেলুরপাড়া ও সুখানপুকুরের মাঝখানে দ্বিতীয় ট্রেন অপারেশন : শতাধিক পাকসেনার মৃত্যু, স্বাধীনতায় আশাবাদী মুক্তিবাহিনী

বর্তমান কলেজ স্টেশন এবং সুখানপুকুরের মাঝখানে নভেম্বরের ১৩ তারিখে শাহ্ মোখলেছুর রহমান দুলুর নেতৃত্বে তার গ্রুপ সকাল ১০টার সময় পাকসৈন্যবাহী একটা স্পেশাল ট্রেন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড ব্যবহার করে। এখানে হায়োর ট্রেনিং প্রাপ্ত ১০ জন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে লোকাল পুলিশ, ই.পি.আর, আর্মিসহ ১২/১৪ জন এবং স্থানীয় জনগণ ১৫/২০ জন মিলিয়ে মোটামুটি ৩০/৩২ জনের একটা গ্রুপ এই অপারেশন চালায়। এক্সপ্লোসিভ বাধার কাজ করে হয়ার ট্রেনিং প্রাপ্ত ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা অন্যরা পাথর সরানোসহ আনুসঙ্গিক কাজে সহযোগিতা করে। এই ট্রেন উড়ানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ববর্তী রাত থেকেই অপেক্ষা করছিল। প্রথমে তাঁদের কাছে তথ্য ছিল যে আর্মি ট্রেনটা আসবে রাত ১২টায় এবং সেই অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা মাইন সেট করে বসে ছিল। কিন্তু রাত ১২টার পরিবর্তে ট্রেনটি আসে পরের দিন সকাল ১০টায়। এর মাঝখানে ২টা পাবলিক ট্রেন এবং একটা মালগাড়ি এই এলাকা অতিক্রম করে। ট্রেন সম্পর্কিত তথ্যগুলো মুক্তিযোদ্ধারা পাচ্ছিল আর্মিদের সঙ্গে থাকা বাঙালিদের কাছ থেকে যারা আর্মিদের সঙ্গে থাকলেও কাজ করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। এই ট্রেনটা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়। এখানে প্রায় দেড়শ পাকসেনা মৃত্যু বরণ করে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা হলো—টুআইসি ইস্রাফিল

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, আঃ হামিদ, বাবলু, খালেক, খলিল, নুরুল, শুকুর, মিনু, জগলু, হাল্লু, লিটু সহ আরো অনেকে।[২৯] ১৫ নভেম্বর গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে সুখানপুকুর রেল স্টেশনে শত্রুদের খাদ্যবাহী একটি ট্রেন মাইন বিস্ফোরণের সাহায্যে ধ্বংস করা হয়।[৩০]

সারিয়াকান্দি থানা আক্রমণ

বগুড়ায় সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মধ্যে সারিয়াকান্দির যুদ্ধ ছিল ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী। কৌশলগত কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সারিয়াকান্দি থানা মুক্ত করার কাজটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সারিয়াকিন্দ থানায় পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি মুক্ত করতে পারলে সমগ্র পূর্ব বগুড়াতে পাকবাহিনীর অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে অত্র অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ-সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ নভেম্বর মাসের শেষের দিকে সারিয়াকান্দি থানা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় ২৬ নভেম্বর রাতেই আব্দুল আজিজ রঞ্জুর গ্রুপ এবং নারচীর আবুল হাশিম বাবলুর গ্রুপ রামচন্দ্রপুর গ্রামে বসে পরিকল্পনা করে ঐ রাতেই সারিয়াকান্দি থানা আক্রমণ করে। আব্দুল আজিজ রঞ্জুর গ্রুপ সারিয়াকান্দি থানার উত্তর পাশে যমুনা নদীর ধারে ডিফেন্স নেয় এবং আবুল হাশিম বাবলুর গ্রুপ পশ্চিম পাশে বাঙালি নদীর ধারে ডিফেন্স নেয়। সারারাত গোলাগুলি করার পর সকালবেলা দেখা গেল যে পাকবাহিনী পশ্চিম দিকে বাঙালি নদীর ওদিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করছে। তখন রঞ্জুর গ্রুপ নিজেদের সেভ করার জন্য ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পিছিয়ে আসে। বাবলুর গ্রুপে মেশিনগান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই এই গ্রুপটি নিজেদের উইথড্র করে নেয়। এভাবে ২৬ নভেম্বর রাতের আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর এই গ্রুপ দুটি আশেপাশের গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করে। ১০/১২টা গ্রুপ মিলে রাতেই মিটিং করে যার যার পজিশন/অবস্থান ঠিক করে নেয়। ২৭ নভেম্বর রাত ১২টার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স নেয়। পশ্চিম ধারে চরের মধ্যে ডিফেন্স নেয় আব্দুল আজিজ রঞ্জুর গ্রুপ, দক্ষিণ দিকে অবস্থান নেয় মমতাজ উদ্দিন এবং আলমগীর শাহজাহানদের গ্রুপ, আব্দুস সবুর সওদাগরের গ্রুপ ডিফেন্স নেয় নেপালতলী ব্রিজের কাছে। ওখানে মুক্তার হোসেনের গ্রুপ অবস্থান নেয় থানার পূর্ব পাশে পোস্ট অফিসের ভিতরে থানা থেকে মাত্র ২০ গজ দূরত্বে। এভাবে বিভিন্ন গ্রুপ চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে থানা আক্রমণ করে। থানার ভেতরে প্রায় ৩০/৩৫ জন আর্মিসহ ১৫/২০ জন রাজাকার ছিল। রাত তিনটা সাড়ে তিনটা থেকে পরেরদিন বিকেল পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর ১৯ জন সৈন্য নিহত হয়। আত্মসমর্পণ করে ১০/১২ জন পাকিস্তানিসহ প্রায় ২৫ জন রাজাকার। এই যুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর এক গ্রুপ কমান্ডার মমতাজ উদ্দীনসহ ৪/৫ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। তাঁরা হচ্ছেন— মোজাম্মেল হক,

Dhaka University Institutional Repository

মদন কুমার, ওসমান গনি, নজরুল ইসলাম, ওয়াহেদ প্রমুখ। এই যুদ্ধে সারিয়াকান্দি থানা দখল হয়। গেরিলা বাহিনী ১১৮টি রাইফেল ৪০টি এল.এম.জি ১টি রিভলবার, ১টি গ্রেনেডও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করে। বিকেলের দিকে দুইটা প্লেন এসে সারিয়াকান্দিতে দুই চক্কর দিয়ে চলে যায়। বিভিন্ন গ্রুপের তিনশ সাড়ে তিনশ ছেলে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই যুদ্ধ যে সকল কমান্ডারদের অধীনে পরিচালিত হয় তারা হলেন—আব্দুল আজিজ রঞ্জু, আবুল হাশেম বাবলু, শাহজাহান, আলমগীর, খাজা নাজিমউদ্দিন, মুক্তার হোসেন, আব্দুস সবুর সওদাগর, আব্দুর রশিদ তোফাজ্জল হোসেন মকবুল, আব্দুর রেজ্জাক, মহসিন, সরুজান প্রমুখ। আত্মসমর্পণকৃত ও ধৃত পাকবাহিনীর সদস্যদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন নিয়ে গিয়ে নাইনকার চরে ভারতীয়দের কাছে জমা দেন।[৩১]

নেপালতলী ব্রিজ-যুদ্ধ

গাবতলী থেকে প্রায় ৪ কি.মি. পূর্বে নেপালতলী ব্রিজটি অবস্থিত। নভেম্বর মাসে ২৭ তারিখে সারিয়াকান্দিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধরত বিপন্ন পাকবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বগুড়া থেকে কিংবা গাবতলী থেকে পাকবাহিনী যাতে সারিয়াকান্দিতে না যেতে পারে সেজন্য আব্দুস সবুজ সওদাগরের নেতৃত্বে তার প্লাটুনের ২১ জন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে স্থানীয় কিছু ছেলে যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করত এরাসহ সব মিলিয়ে প্রায় ৩০/৩৫ জনের একটি দল নেপালতলী ব্রিজের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থান নেয়। সকাল ১১টা সাড়ে ১১টার দিকে পাকবাহিনী গাবতলী থেকে মার্চ করে আসছিল মুক্তিযোদ্ধারা গুলি বর্ষণ শুরু করলে পাকবাহিনী বাঙালি নদীর অপর পারে যে গ্রাম সেখানে অবস্থান নিয়ে বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা থেমে থেমে গুলি করছিল। বিকেল ৪টার পর পাকবাহিনীর গোলাগুলি একটু কমে আসে। সাড়ে ৪টার দিকে ওই গ্রামের একটা বাড়িতে ওরা আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। এভাবে প্রায় ১৫/১৬ দিন মুক্তিযোদ্ধারা নেপালতলী ব্রিজে অবস্থান করে। প্রতিদিন পাকবাহিনী ১১টা সাড়ে ১১টায় এসে বিকেলে চলে যেত। এর পরে দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা এল.এম.জি, এস.এল.আর রাইফেল, স্টেনগান ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার করে। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়। মোখলেছুর রহমান বাবলু এই গ্রুপের টুআইসি ছিলেন। নেপালতলী ব্রিজের যুদ্ধে তিনি আহত হন।[৩২]

ভেলুর পাড়ার যুদ্ধ : রেল লাইনের মূলোৎপাটন

ভেলুরপাড়া রেল স্টেশনটি সোনাতলা থেকে ১৪ কি. মি. দক্ষিণে এবং বগুড়া সদর থেকে ১৬ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত। কৌশলগত অবস্থানের কারণেই স্টেশনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্টেশন থেকে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরে সোনাতলা হয়ে শান্তাহার-কাউনিয়া-তিস্তা-লালমনিরহাট-বোনারপাড়া পর্যন্ত রেলপথ ছিল। এই অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম রেলপথ হওয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যরা এ-সকল অঞ্চলে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে এই রেলপথ ব্যবহার করত। ভেলুরপাড়া রেল স্টেশনেও পাকবাহিনীর অবস্থান ছিল। তারা আশপাশের গ্রামগুলোতে ব্যাপক অত্যাচার চালাতো, নারী নির্যাতন করতো। অতঃপর স্থানীয় জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা মিলে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ভেলুরপাড়ায় অবস্থানরত পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করা হবে। এখানে যুদ্ধ পরিকল্পনায় ছিল খাজা নাজিম উদ্দিনের গ্রুপ, আব্দুল ওয়াহেদ-এর গ্রুপসহ আরও দুয়েকটি গ্রুপ। পরিকল্পনা মাফিক ১০ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা রাত ২টায় নিমেরপাড়ায় সমবেত হয় এবং নিমেরপাড়াতে কভারিং পার্টি রেখে এ্যাকশন পার্টি দু'দলে বিভক্ত হয়ে শিচারপাড়া গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব দিকে অবস্থান নেয়। অপরদিকে কাট অব পার্টি ১, ২ ও রিজার্ভ পার্টি পর্যায়ক্রমে চকচকিয়া ব্রিজ রোড বেন্ড এবং শিচারপাড়া গ্রামে অবস্থান নেয়। রাত আনুমানিক আড়াইটায় শুরু হয় তুমুল আক্রমণ। কিন্তু পাকবাহিনী রাতের বেলা তেমন কোনো পাল্টা আক্রমণ না করলেও ভোর হতেই তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনী আক্রমণে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ-সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধাই পাকবাহিনীর সঙ্গে টিকতে না পেরে পিছিয়ে যায়। তবে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে পাকবাহিনীর উপর গুলি বর্ষণ অব্যাহত রাখে। বগুড়া থেকে আরও আর্মি এসে পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। স্থানীয় জনগণ তাদের লাঠি, বল্লম, সরকী, বাঁশ যার যা আছে তাই নিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং আস্ত আস্ত বাঁশ সারিবদ্ধ করে রাখে যাতে পাকিস্তানিরা মনে করে ওগুলোও কোন অস্ত্র। এভাবে পাকিস্তানিদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ করে। দুপুরের দিকে কাট অব পার্টি ১ এর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহেদ বাঙ্কার থেকে মাথা বের করলে তৎক্ষণাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তখন ঐ গ্রুপটি তাদের স্থান ত্যাগ করে পিছিয়ে আসলে পাকবাহিনী সুযোগ বুঝে রেল লাইন ধরে দক্ষিণ দিকে ভবানীগঞ্জ তিলকপুরের দিকে চলে যায়। যুদ্ধে ১ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয় ও একজন ধরা পড়ে। তাকে পরে মাইনকার চরে পাঠানো হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় সোনাতলা থেকে শুরু করে বগুড়া পর্যন্ত রেল লাইন তুলে ফেলে রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং বিদ্যুতের তার নষ্ট করে ফেলে। এর ৪/৫ দিন পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছেন—খাজা নাজিম উদ্দিন, আব্দুল ওয়াহেদ, শাহনেওয়াজ, ঠান্ডু মাস্টার, সেকান্দার, খলিল, মোসলেম উদ্দিনসহ আরো অনেকে।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

ভেলুরপাড়া যুদ্ধ : চকচকে ব্রিজ ধ্বংস

ভেলুপাড়া যুদ্ধেরই একটা অংশ ছিল চকচকে ব্রিজ ধ্বংস করা। কিন্তু চকচকে ব্রিজের ওখানে অবস্থানরত পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা পেরে উঠছিল না। চকচকে ব্রিজ পূর্বেই দুই বার মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল গেরিলারা ফলে এখানে আর্মি এবং রাজাকারদের অবস্থান এই ব্রিজে ছিল শক্র। চকচকে রেল-ব্রিজটি ভেলুরপাড়া থেকে দক্ষিণে ১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেবার পর আর্মিরা এটাকে কাঠের স্লিপার দিয়ে একদম নিচের দিক থেকে একটার পর একটা কাঠ গেঁথে উপরের দিকে তুলে ওটাতে ট্রেন চালাত। ওখানে অবস্থানরত পাকবাহিনী বাঙ্কারের ভেতরের অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে গুলি করছিল অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল সমতল জায়গায়—বন্যার কারণে লাইনের দুপাশে ৯ ইঞ্চির মত পানি ছিল। লাইনের স্লিপিংটা পরিষ্কার থাকলেও ওখান দিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না। ওরা বাঙ্কার থেকে গুলি করছিল। এ-সকল নানাবিধ কারণে চকচকে ব্রিজের কাছাকাছি অবস্থানে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের উইড্র করে নিচ্ছিল। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থানরত একটা গ্রুপ দূর থেকে এল.এম.জি দিয়ে ওদের দিকে ফায়ার করছিল। এমতাবস্থায় রেজাউল করিম মন্টু তার ছোট ভাই আতাউর রহমান গ্যাদা ভগ্নিপতি রাজা এবং ৩ জন চাচাত ভাই যারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা এদের নিয়ে চকচকে ব্রিজের উত্তর পাশ দিয়ে পানি পার হয়ে লাইনে ওঠে। লাইনে উঠার পর পরিকল্পনা করে ৩ জন ৩ জন করে ২টা গ্রুপ করে নেয়। পশ্চিম ধারের স্লপিংয়ে থাকে মন্টু গ্যাদা ও আরেকজন এবং পূর্ব ধারের স্লপিংয়ে থাকে তার ভগ্নিপতি রাজা দুইজন চাচাত ভাইসহ। এরপর তারা দুইজন দুইজন করে ক্রলিং করে আগায় এবং একজন আর্মস নিয়ে রেডি থাকে এভাবে পাক অবস্থানের প্রায় একশ গজ কাছে যাবার পর একজন আর্মি বাঙ্কার থেকে রাইফেলসহ জাম্প দিয়ে উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রেজাউল করিম মন্টু তার হাতের এস.এল. আর দিয়ে গুলি করলে লোকটি ইয়া আলী বলে পড়ে যায়। ভুল তথ্যের কারণে তারা ওখান থেকে ফিরে আসে। অতঃপর পেছন থেকে আর্মি আসছে এমন একটা ভুল তথ্যের কারণে তারা একটু পিছিয়ে পশ্চিম দিকে লোহাগড়া গ্রামে আসে। এরপর পুনরায় তিনি ব্রিজের দক্ষিণ দিকের গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘুরে উত্তর দিক দিয়ে ব্রিজ আক্রমণের উদ্দেশ্যে লাইনের উপর উঠে গুলি করতে করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পাকবাহিনীর কাছ থেকে কোনো রেসপন্স না পেয়ে কাছে গিয়ে দেখেন যে পাকিস্তানিরা পালিয়েছে। তারপর মুক্তিযোদ্ধারা কেরোসিন তেল ঢেলে কাঠের ব্রিজটি পুড়িয়ে দেয়। এরপরে সোনাতলা থেকে বগুড়া পর্যন্ত রেল লাইন তুলে ফেলার ফলে এই এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

ধুনট থানায় সর্বশেষ আক্রমণ : পাকবাহিনীর পলায়ন

ধুনট থানার সুলতান আটা গ্রামের মোজাম চেয়ারম্যানের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটা গ্রুপ শেল্টারে ছিল। গোলাম মোস্তফা ঠাণ্ডুর গ্রুপ, ফটিকের গ্রুপ এবং খসরুর গ্রুপ। ধুনট থানা থেকে আর্মিরা বের হয়ে এসে রাতের বেলা খাতে পাড়া মহল্লায় আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য এই গ্রুপগুলো রাতের বেলা পাহারা দিত দিনরাত কালেরপাড়া ও রক্তিপাড়ার মাঝখানের ব্রিজ পাহারা দিত। ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে সকালবেলা পাহারাদার গ্রুপটি পাশেই একটা বাড়িতে সকালের খাবার খেতে গেলে আর্মিরা কালেরপাড়ার দিকে অগ্রসর হয়। খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রক্তিপাড়ায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং খানসেনা ও রাজাকারদের সাথে চরম গোলাগুলি শুরু করে। সকাল ১০টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোলাগুলি চলে। সন্ধ্যার পর মুক্তিযোদ্ধারা একটু পিছিয়ে আসে সেই সময় পাকবাহিনীও একটু পিছিয়ে থানার দিকে গেল। তখন মুক্তিযোদ্ধারাও থানার দিকে এগোতে থাকে এবং থানার দক্ষিণাংশ বাদে সব দিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা থানাকে ঘিরে ফেলে। পরবর্তীতে এখানে সারিয়াকান্দি থেকে খোকন নামে একজনের গ্রুপও এসে যোগ দেয়। এই চারটা গ্রুপ থানা আক্রমণ করলে পাকবাহিনীও থানার উত্তর দিকে সেদিক থেকে মেশিনগানের গুলি আসছিল সেদিক লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল, এভাবে রাত ১০টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল একটানা। ১০টার দিকে থানা থেকে গোলাগুলি কমে আসতে লাগল। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের অবস্থানেই ছিল পালাক্রমে মুক্তিযোদ্ধারা খাওয়া-দাওয়া এবং খুনের কাজটাও সেরে নিয়েছিল। সকাল বেলা দেখা গেল যে আর্মিরা থানা ছেড়ে বগুড়ায় পালিয়ে গেছে। এভাবে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিনই ধুনট থানা মুক্ত হয়ে যায়।[৩৫]

মাঝিড়ার অভিযান অ্যাঙ্কুশ

মাঝিড়া বগুড়া শহর থেকে ৮/৯ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত। মাঝিড়ার উপর দিয়ে চলে যাওয়া ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কটি পাকবাহিনীর প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। পাকবাহিনী বিভিন্ন সময় এই রাস্তা দিয়ে উত্তরবঙ্গে তাদের বিভিন্ন রকমের রসদ সরবরাহ করতো। মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীর এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সংকটময় করার জন্য এই অভিযানের পরিকল্পনা করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ডিসেম্বরের ২ তারিখে সকাল ৯টার দিকে বগুড়া সদর থেকে পাকবাহিনীর একটি পর্যবেক্ষণ টহল পায়ে হেঁটে মাঝিড়ার দিকে আসছিল। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে মোঃ জহুরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপ যারা দুবলাগাড়ি হাটের উত্তরে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিল তারা পাকবাহিনীর আগমন সংবাদ পায়। এরপর কমান্ডার জহুরুল ইসলাম ১০/১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের পূর্ব-পার্শ্বে মাঝিড়া বাজারের প্রায় ৮০০ গজ উত্তরে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান নেন। পাকসেনারা ২০০ গজের মধ্যে এসে পড়লে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি বর্ষণ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা পশ্চিম দিকে দৌড়ে পালাতে শুরু করলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে ৯ জন পাকসেনা নিহত হয়। পরের দিন ৩ ডিসেম্বর আনুমানিক বেলা ১০টার সময় একই স্থানে বগুড়া থেকে ঢাকাগামী পাকসেনা বহনকারী একটা গাড়ির উপর জনাব নজীবর রহমান, জহুরুল ইসলাম ও এ.এফ.এম ফজলের নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনীর ৩টি দল অ্যাম্বুশ পাতে। গাড়িটি অ্যাম্বুশ এলাকায় প্রবেশ করলে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি বর্ষণ করে। ফলে অজ্ঞাত সংখ্যক পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনাদের গুলিতে শ্রী ধীরেন কুমার নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।[৩৬]

সাজাপুরের অভিযান

বগুড়া সদর থানার সাজাপুরে অবস্থিত সাজাপুর মাদ্রাসাটি যুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর ১টি অস্থায়ী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই ক্যাম্প থেকে আশেপাশের জনগণের ওপর অত্যাচার চালানো হতো। বিশেষত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সন্দেহ ভাজনদের অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের এই অত্যাচারের কাহিনী শোনার পর এই ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই উদ্দেশ্যে ৮ ডিসেম্বর ভোর বেলায় প্রায় ৫০/৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়ে সাজাপুর মাদ্রাসা অভিমুখে রওয়ানা হয়। উপদলগুলোর নেতৃত্ব দেন আব্দুস সবুর, জহুরুল ইসলাম, সাবেরী, আবুল ফজল ও নজীবুর রহমান। মুক্তিযোদ্ধারা সকাল ৭টার সময় মাদ্রাসায় পৌঁছে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান গ্রহণ করে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ শুরু করে। হতবিহ্বল রাজাকাররা পালানোর চেষ্টা করলে তাদের ২০/২২ জন সদস্য নিহত হয়।[৩৭]

447508

পশ্চিম বগুড়া : আদনদীঘি, দুপচাচিয়া, কাহালু, শিবগঞ্জ ও নন্দীগ্রাম এলাকায় সংঘটিত যুদ্ধ

তালোড়া রেল স্টেশন আক্রমণ : স্টেশন ঘর ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস

কাহালু থেকে শান্তাহারের দিকে যেতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন ও বন্দর তালোড়া। তালোড়া রেল স্টেশনে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের একটা ক্যাম্প ছিল। বগুড়া জেলার মুজিব বাহিনীর প্রধান এ.বি.এম শাহজাহান এবং তার গ্রুপ তালোড়া রেল স্টেশন আক্রমণ করে ওখানকার আর্মস এ্যামুনেশন দখল, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ট্রান্সফরমার উড়ানো এবং এক্সচেঞ্জ উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা মাফিক প্রথমে রেকী করার জন্য ভারত থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত বাবলু নামের কম বয়সী ছেলেটিকে কাজে লাগানো হয়। দেখলে বোঝার কোনো উপায় ছিল না যে সে মুক্তিবাহিনীর সাহায্যকারী। এরপর হাট বাজার করতে আসা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে খোঁজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নেন এবং পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে হোসেন আলী আরেকজনকে দিয়ে রেকী করেন। এরপর তাঁরা পরিকল্পনা মাফিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেশন এবং ট্রান্সফরমার এই তিনটি জায়গায় এক্সপ্লোসিভ সেট করে উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। এর আগে অবশ্য মুক্তিযোদ্ধারা স্টেশনে প্রবেশ করে গোলাগুলি শুরু করেন। কিন্তু স্টেশনে অবস্থানরত রাজাকার ও পাকবাহিনীর কাছ থেকে পাল্টা আক্রমণ না হওয়ায় তাদেরকে ট্রেস করতে পারেন নাই। ওরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পেছনের ডোবা পুকুরে আশ্রয় নেয়। এখানে দুই জায়গায় এক্সপ্লোসিভ এক্সপ্লোর করে স্টেশন ঘর এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উড়ে যায়। এক্সপ্লোসিভ এক্সপ্লোর না করায় ট্রান্সফরমারটি উড়ানো যায় নি। এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করে—এ.বি.এম শাহজাহান কমান্ডার, হোসেন আলি ডেপুটি কমান্ডার, আসমত, করিম উদ্দিন, হবিবর রহমান দেলোয়ার, আবুল কাশেম, দুলাল প্রমুখ।[৩৮]

বালুকচড়া স্কুল আক্রমণ

শান্তাহারের কাছাকাছি বালুকচড়া নামে একটা গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে শেল্টার নিয়েছিল এ.বি.এম শাহজাহানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা গ্রুপ। রাতের বেলা খবর পাওয়া গেল যে এখানকার স্কুলে রাজাকাররা অনেক লুটকরা জিনিসপত্র এনে রেখেছে। সকালে মহিষের গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। রাতের বেলায় মুক্তিযোদ্ধারা গিয়ে স্কুলটির ভেতরে এবং বাইরে অবস্থান নেয়। স্কুল মাঠে শতাধিক লুটের মাল বোঝাই মহিষের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ফজরের আযানের পর মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে। এখানে ৬/৭ জন রাজাকার নিহত হয়। পরে হিন্দুরা মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশে নিজেদের জিনিস নিয়ে যায়। এই অপারেশনে শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, হোসেন আলীসহ ৭-১০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সকাল ১০টার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ঐ এলাকা ছেড়ে পূর্বের শেল্টারে চলে যায়। দুপুরের পর পাকবাহিনী এসে মুক্তিযোদ্ধাদের শেল্টার লক্ষ্য করে সেলিং করতে থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা এস.এল.আর রাইফেল দিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তবে ওদের ভারী অস্ত্রের সঙ্গে টিকতে না পেরে পিছিয়ে আসে। পরে পাকবাহিনী গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।[৩৯]

করিবামুজায় যুদ্ধ

কাহালু থানা উত্তর-দক্ষিণে রেল লাইন দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর দিকের বীর কাতার ইউনিয়নে রাজাকার সৃষ্টি হয় নাই কারণ এখানকার অধিকাংশ লোক ছিল আওয়ামী লীগের। সে কারণে মুক্তিযোদ্ধারা ঐ ইউনিয়নের করিবামুজা গ্রামে শেল্টার নিয়েছিল আনুমানিক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের দিকে। একদিন দুপুরবেলা গোসল সেরে ভাত খাবার প্রস্তুতি নেয়ার সময় খবর এলো যে

Dhaka University Institutional Repository

পাকবাহিনীর সদস্যরা কাহালুতে ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে এই গ্রামের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পজিশন নিয়ে নেয়। এখানে প্রায় ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি শক্তিশালী দল ছিল। এখানে ইপিআর এর ট্যাংক রেজিমেন্টের এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য ছিল। করিবানুজায় পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ১ ঘন্টারও বেশি সময়ব্যাপী যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানিরা ট্রেনে করে আরো বেশি সৈন্য নিয়ে আসলে মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে আসে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু পাকবাহিনীর আনুমানিক ৩/৪ জন মারা যায়। এই যুদ্ধে কমান্ডার ছিলেন এ.বি.এম শাহজাহান, ডেপুটি হোসেন আলী। পরবর্তীতে পাকিস্তানিরা গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।[৪০]

হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক পোল উড়ানো

আব্দুর রাজ্জাক খোকনের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা বড় দরগাহাটের উত্তর পাশে অবস্থিত একটা চোরের গ্রামে শেল্টার নিয়েছিলো। সেখানে বসে মুক্তিযোদ্ধারা কাহালুর দিকে যেতে পশ্চিমে অবস্থিত একটা হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই ইলেকট্রিক পোল উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে। ওয়াপদা থেকে এই পোলের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়ার সাপ্লাই হতো। গেরিলারা ঐ পোল পিক্স দিয়ে জয়েন্ট করে ফিউজ লাগিয়ে আগুন দিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। বিকট শব্দ করে চতুর্দিকে পার্কিং পোলটি ভেঙ্গে পড়ে। সব তার এক জায়গায় জড়ো হয়ে যায়। চতুর্দিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে মুক্তিযোদ্ধারা একটি সফল গেরিলা হামলা চালায়।[৪১]

কাহালু স্টেশনের পূর্ব পাশের ব্রিজ আক্রমণ

এ.বি.এম শাহজাহানের গ্রুপ একদিন কাহালু স্টেশনের পূর্ব পাশের ব্রিজে আক্রমণ চালায়। পর্যাপ্ত এক্সপ্লোসিভের অভাবে ব্রিজটি ধ্বংস করতে না পারায় পাকবাহিনী সাময়িকভাবে ব্রিজের ওখান থেকে পলায়ন করে। মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে আসার সময় পাকবাহিনী তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকে। ঘন কুয়াশার কারণে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানিদের উপস্থিতি টের পায় নি। মুক্তিযোদ্ধাদের শেল্টার ছিল পাইকড় ইউনিয়নের শিকড় গ্রামে। প্রায় ১৫/২০ জন মুক্তিযোদ্ধা অপারেশনে গিয়েছিল বাকী ৩০/৪০ জন শেল্টারে বিশ্রামে ছিল। এমতাবস্থায় পাকিস্তানিরা এসে মর্টার শেলিং শুরু করলে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছিয়ে আসে। পাকিস্তানিদের শক্তিশালী অস্ত্রের মুখে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে পারে নি।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

গুনাহার যুদ্ধ

গুনাহার গ্রামটি দুপচাচিয়া থানা থেকে প্রায় ৬ কি. মি. পশ্চিমে দুপচাচিয়া-গোপিনাথপুর প্রধান সড়কের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে দুপচাচিয়া থানা সদরে অবস্থিত পাকবাহিনীর ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন আরিফের নেতৃত্বে পাকসেনা ও রাজাকারসহ আনুমানিক ১০০ জনের একটি দল গুনাহার ইউনিয়নের অর্জুনগাড়ী গ্রামের চারপার্শ্বে অবস্থান নেয়। তাদের কাছে অর্জুনগাড়ী গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের অবস্থানের তথ্য ছিল। অর্জুনগাড়ী গ্রামে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান (মুকুল) তাঁর দল নিয়ে পাকিস্তানিরা আসার পূর্বেই বেরিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি পাশের গ্রামের আরো দুটি দল নিয়ে ভোর রাতে পাকবাহিনীকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে তুমুল গুলি বর্ষণ শুরু করে। পাকসেনারাও পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে। এবং আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে পিছু হটে মুরইল হয়ে সদরের দিকে চলে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দুইটি গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে—খন্দকার দেলোয়ার হোসেন ও খন্দকার ফরহাদ হোসেন। এ যুদ্ধে ১ জন পাকসেনাও ২ জন রাজাকার নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ হতাহত হয় নি।[৪৩]

মালাহার গ্রামের চৌকিরঘাট ব্রিজ ধ্বংস

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার/থানার মোকামতলা একটি বর্ধিষ্ণু ব্যবসা কেন্দ্র। এটি রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের উপর অবস্থিত। পাকবাহিনী এই সড়ক পথেই রংপুর সেনানিবাস থেকে বগুড়ায় আসত। মহাস্থানগড় টিলার উপর পাকবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এই সড়ক পথে পাকবাহিনীর যাতায়াতকে বাধাগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে মোকামতলার নিকটস্থ মালাহার গ্রামের চৌকিরঘাট ব্রিজটি ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম দুলাল গোপনে রেকী করে ৫/৬ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ব্রিজের নিকট পশ্চিম পার্শ্বে এসে জমায়েত হন। রাতের ঘন অন্ধকারে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা পানিতে ডুব দিয়ে ব্রিজের নিচে আসেন ও অতি সঙ্গোপনে ব্রিজের একপাশে বিস্ফোরক লাগিয়ে দেন। অতঃপর নিরাপদ দূরত্ব থেকে বিস্ফোরণ ঘটান। এতে ব্রিজটি ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিজের দুই পার্শ্বে পাহারারত ১০/১২ জন রাজাকার পালিয়ে যায়।[৪৪]

নশরৎপুর রেল স্টেশন আক্রমণ

অক্টোবর মাসের শেষের দিক সুনীল চন্দ্র প্রামাণিক ও মনসুরের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা নশরৎপুর রেল স্টেশনে অবস্থানরত পাকবাহিনীর সদস্য ও রাজাকারদের আক্রমণ করে। পাকবাহিনী তাদের বাঙ্কারের ভিতর অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় করে। পরবর্তীতে পাকসৈন্যরা

Dhaka University Institutional Repository

পিছু হটে যায়। ঐ দিন মুক্তিযোদ্ধারা একটা ট্রেন উড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর বেশ কিছু আর্মস এ্যামুনেশন দখল করে।[৪৫]

মথুরাপুর রেল ব্রিজ ধ্বংস

যুদ্ধের শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের ১২/১৩ তারিখের দিকে আদমদীঘি থানার নশরৎপুর ইউনিয়নের বেজার নামক স্থানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা সংবাদ পেল যে, পাক আর্মিরা বগুড়া হয়ে নওগায় গিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করবে কিন্তু বাঙালিদের কাছে করবে না। তখন ঐ এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপ একত্রিত হয়ে মথুরাপুর রেল ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা রাত্রি ১২/১টার দিকে মথুরাপুর রেল ব্রিজের কাছে অবস্থান নেয়। ব্রিজটিতে ৯টি পিলার ছিল। ৯ থেকে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা এক্সপ্লোসিভ বাধার কাজ করে। বাকী মুক্তিযোদ্ধারা এ্যাম্বুশ নিয়ে ছিল। এক্সপ্লোসিভ বাধার শেষ হলে ডেটোনেটরে তার সংযুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। ট্রেনটি ব্রিজের উপর ওঠার পর ভেটানেটার আগুন দিলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ইঞ্জিনসহ দুইটা বগি উড়ে যায়—৩ জন ড্রাইভারসহ দুইজন খানসেনা মারা যায়। নিচে যে বগিগুলো ছিল সে বগিতে কিছু জিনিসপত্র পাওয়া যায়। পরে যেগুলো গ্রামের গরীব মানুষের মাঝে বিতরনের জন্য মহিষের গাড়িতে করে নিয়ে যায়। মথুরাপুর ব্রিজ আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের ৫/৬টি গ্রুপ ছিল। এর মধ্যে একটি গ্রুপের কমান্ডার ছিলো আবুল কাশেম এবং টুআইসি ছিল তালেব এই গ্রুপের অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা ছিল আলিমুদ্দিন, মইজউদ্দিন, ইয়াসিন, মকবুল, খলিলুর রহমান, সলিমুদ্দিনসহ আরো অনেকে। আরেকটি গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন সুনীল চন্দ্র প্রামাণিক। এটি একটি সফল অপারেশন ছিল।[৪৬]

সান্তাহারের অভিযান এ্যাম্বুশ

বগুড়া শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সান্তাহার অবস্থিত। সান্তাহারে বিপুল সংখ্যক বিহারীর বসবাস ছিল। সে কারণে শহরটি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনিরাপদ ছিল। পাকবাহিনী শহরের মধ্যে একটি ওয়ার্কশপে তাদের আস্তানা গেড়ে ছিল। এই আস্তানা থেকে তারা শহর ও শহরের আশেপাশের গ্রামগুলোতে অভিযান চালাতো। ওয়ার্কশপে অবস্থিত ক্যাম্পটিতে বিভিন্ন রকমের রসদ সরবরাহ, জনবল প্রতিস্থাপন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য পাকসেনারা প্রায়ই রেলপথে বগুড়া থেকে সান্তাহারে যাতায়াত করতো। সান্তাহারের পাকসেনাদের বগুড়া হতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ১লা ডিসেম্বর আশেপাশের কয়েকটি ছোট দল একত্রিত হয়ে এ্যাম্বুশ পরিকল্পনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

সেই অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা মোজাফফর হোসেন, মোঃ আব্দুল আলীম সরদার এবং মোঃ আব্দুস সাত্তার-এর নেতৃত্বে সান্তাহার রেলস্টেশন হতে ৩০০ গজ পূর্বে রেল লাইনের মাঝে বিস্ফোরক পেতে রাখে এবং রেল লাইনের উত্তর প্রান্তে গ্রামের পাশে ছোট ছোট জলভাগ হয়ে অবস্থান নেয়। সান্তাহারগামী ট্রেনটি তাদের অ্যাম্বুশ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতেই মুক্তিবাহিনী তাদের বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে ট্রেনের সামনের দুইটি বগি লাইন থেকে নিচে পড়ে যায়। সামনের বগিতে থাকা পাকসেনারা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। পেছনের বগিতে থাকা তিনজন পাকসেনা পালাতে চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ফলে তিনজনই নিহত হয়। এখানে সুজিত নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই অভিযানের ফরে সান্তাহারের সাথে পাকবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৪৭]

মহাস্থানের যুদ্ধ অ্যাম্বুশ : মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

মহাস্থানগড় বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী এখানে একটা ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। এখান থেকে তারা প্রতিদিন শিবগঞ্জে যেত তিন/চারটি পিকআপ ভ্যানে করে। শিবগঞ্জ, জামুর, বিরল এই রাস্তাটায় ওরা যাতায়াত করত। ভাসুবিহারের ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদেরও একটা আস্তানা ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা একসময় খেয়াল করে যে, ওরা প্রত্যেকদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে চলাচল করে। নভেম্বর মাসের দিকে একদিন মুক্তিযোদ্ধারা মহাস্থান জাদুঘরের এপাশের উঁচু ভূমিতে পজিশন নেয়। অপরদিকে পাকবাহিনী ছিল নিচের রাস্তায়। প্রায় ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পাটমরির আড়ালে নিজেদের আড়াল করে রাখে। পাক আর্মিরা নিচ দিয়ে যাবার সময় মুক্তিযোদ্ধারা তুমুল গুলি বর্ষণ শুরু করে। প্রায় ২০ মিনিটের মত ওদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয়। ওরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে নিচে এক পাশে পজিশন নেয়। এরপর আর্মিদের আরও কয়েকটি গাড়ি চলে আসলে মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে চলে আসে। এরপর থেকে পাকবাহিনী আর ঐ রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করল না। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ধরার জন্য ওরা যে পাহারা বসাত সেগুলো সব উঠিয়ে নিল। সবকিছুই মোটামুটি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসল। এটা ছিল একটা সফল গেরিলা অপারেশন।[৪৮]

ভাসু বিহারের যুদ্ধ

মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ঘাঁটি ছিল মহাস্থানগড়ের ভাসু বিহারের ওখানে। যুদ্ধের শেষের দিকে ডিসেম্বরের ১৩/১৪ তারিখের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ১৮/২০ জন অফিসার একজন

Dhaka University Institutional Repository

বিগ্রেডিয়ারসহ জয়পুরহাট থেকে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। ঐদিন বিকেল বেলায় শিবগঞ্জ থানায় গেরিলা আক্রমণ হয় একই সাথে ইন্ডিয়ান বিমান বাহিনী ও প্লেন এ্যাটাক করে। এখানে মুক্তিযোদ্ধা ছিল প্রায় ৬০/৭০ জন। এমন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর আসে যে, এদিক দিয়ে পাকিস্তানি আর্মিরা যাচ্ছে। পাকিস্তানিরা যখন ভাসু বিহারের কাছে আসে তখন মুক্তিযোদ্ধারা পানি নিষ্কাশনের জন্য যে গভীর ড্রেন রয়েছে সেই ড্রেনের মধ্যে অবস্থান নিয়ে ওদের জন্য ফাঁদ পেতে বসেছিল। কিন্তু ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের ট্র্যাকে ঢোকার আগেই একজন মুক্তিযোদ্ধা হুট করে হল্ট বলে ফেলে তখন ওরা রাস্তার ঐ পাশে উঁচু জায়গায় অবস্থান নেয়। এবং অনেক গোলাগুলি হয়। ওদের কাছে ভারী অস্ত্র শস্ত্র ছিল। ওরা মেশিন গান দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করতে করতে আস্তে আস্তে চলে যায় ওখান থেকে। গোলাগুলি শুরু হয়েছিল রাত সাড়ে নয়টা-১০ টায়। অন্ধকারের মধ্যে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। ওরা ওখান থেকে গিয়ে সদর থানার নামুজা স্কুলে অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধারাও ওদের পিছু পিছু নামুজাতে চলে আসে। কিন্তু ওদের খুঁজে পায় না। ওরা শেষ রাতের দিকে কাহালুর কাছে দরগাহাটে চলে যায়। সকালবেলা সমস্ত এলাকার লোকজন ওদের ঘেরাও করে ফেলে। এ.বি.এম শাহজাহান এবং হোসেন আলীসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও চলে আসে। ওখানে পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মেল হোসেন তার বাহিনী নিয়ে সারেন্ডার করে। এই গ্রুপে কুখ্যাত মেজর জাকি ছিল। মুক্তিবাহিনী ও জনতা ওকে কিছুটা টর্চার করে। একজন সৈন্য ব্রিগেয়িারের কমান্ড না মানায় ব্রিগেডিয়ার তাকে পেছন থেকে গুলি করে হত্য করে।[৪৯]

আদমদীঘি থানায় ক্যাম্প আক্রমণ

আদমদীঘি থানা সদরে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে নিয়মিত টহলদানের সময় পাকবাহিনী ও রাজাকাররা আশেপাশে এলাকাগুলোতে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতো। যুদ্ধের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্পটি আক্রমণ করে। এই ক্যাম্পে ২০/২৫ জন পাকসেনা এবং ৩০/৪০ জন রাজাকার অবস্থান করতো। ১১ ডিসেম্বর ৭১ তারিখে মোঃ মোজাফফর হোসেন, মোঃ আঃ হামিদ, আমজাদ হোসেন, এল.কে আবুল হোসেন, আব্বাস আলী ও মোঃ সোলায়মানের নেতৃত্বে ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ক্যাম্পের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকবাহিনীও পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে। প্রায় দেড়ঘন্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকসেনারা ক্যাম্পটি ছেড়ে দিয়ে সান্তাহারে পালিয়ে যায়।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

বিগ্রেডিয়ারসহ জয়পুরহাট থেকে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। ঐদিন বিকেল বেলায় শিবগঞ্জ থানায় গেরিলা আক্রমণ হয় একই সাথে ইন্ডিয়ান বিমান বাহিনী ও প্লেন এ্যাটাক করে। এখানে মুক্তিযোদ্ধা ছিল প্রায় ৬০/৭০ জন। এমন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর আসে যে, এদিক দিয়ে পাকিস্তানি আর্মিরা যাচ্ছে। পাকিস্তানিরা যখন ভাসু বিহারের কাছে আসে তখন মুক্তিযোদ্ধারা পানি নিষ্কাশনের জন্য যে গভীর ড্রেন রয়েছে সেই ড্রেনের মধ্যে অবস্থান নিয়ে ওদের জন্য ফাঁদ পেতে বসেছিল। কিন্তু ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের ট্র্যাকে ঢোকার আগেই একজন মুক্তিযোদ্ধা হুট করে হুট বলে ফেলে তখন ওরা রাস্তার ঐ পাশে উঁচু জায়গায় অবস্থান নেয়। এবং অনেক গোলাগুলি হয়। ওদের কাছে ভারী অস্ত্র শস্ত্র ছিল। ওরা মেশিন গান দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করতে করতে আস্তে আস্তে চলে যায় ওখান থেকে। গোলাগুলি শুরু হয়েছিল রাত সাড়ে নয়টা-১০ টায়। অন্ধকারের মধ্যে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। ওরা ওখান থেকে গিয়ে সদর থানার নামুজা স্কুলে অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধারাও ওদের পিছু পিছু নামুজাতে চলে আসে। কিন্তু ওদের খুঁজে পায় না। ওরা শেষ রাতের দিকে কাহালুর কাছে দরগাহাটে চলে যায়। সকালবেলা সমস্ত এলাকার লোকজন ওদের ঘেরাও করে ফেলে। এ.বি.এম শাহজাহান এবং হোসেন আলীসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও চলে আসে। ওখানে পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মেল হোসেন তার বাহিনী নিয়ে সারেন্ডার করে। এই গ্রুপে কুখ্যাত মেজর জাকি ছিল। মুক্তিবাহিনী ও জনতা ওকে কিছুটা টর্চার করে। একজন সৈন্য ব্রিগেয়িারের কমান্ড না মানায় ব্রিগেডিয়ার তাকে পেছন থেকে গুলি করে হত্য করে।[৪৯]

আদমদীঘি থানায় ক্যাম্প আক্রমণ

আদমদীঘি থানা সদরে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে নিয়মিত টহলদানের সময় পাকবাহিনী ও রাজাকাররা আশেপাশে এলাকাগুলোতে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতো। যুদ্ধের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্পটি আক্রমণ করে। এই ক্যাম্পে ২০/২৫ জন পাকসেনা এবং ৩০/৪০ জন রাজাকার অবস্থান করতো। ১১ ডিসেম্বর ৭১ তারিখে মোঃ মোজাফফর হোসেন, মোঃ আঃ হামিদ, আমজাদ হোসেন, এল.কে আবুল হোসেন, আব্বাস আলী ও মোঃ সোলায়মানের নেতৃত্বে ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ক্যাম্পের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকবাহিনীও পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে। প্রায় দেড়ঘন্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকসেনারা ক্যাম্পটি ছেড়ে দিয়ে সান্তাহারে পালিয়ে যায়।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

নন্দীগ্রামের অভিযান : পাকবাহিনীর পলায়ন

বগুড়া শহর থেকে ৩২ কি. মি. দূরে নাটোর রোড সংলগ্ন নন্দীগ্রামে পাকবাহিনীর এক প্লাটুন সেনাসহ একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পের সৈন্যরা রাজাকার আলবদরদের সহায়তায় এই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ডিসেম্বর মাসের ১২/১৩ তারিখ রাতে হাজী আবু বক্কর সিদ্দিকের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল এবং কিছু উদ্যোগী যুবক তাদের অস্থায়ী ক্যাম্প আবাদপুকুর থেকে রাতের অন্ধকারে নামহুট এবং মাজগ্রামে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। রাত আনুমানিক দেড়টার সময় মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পটির উপর প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা ৩০৩ রাইফেল, ২ ইঞ্চি মর্টার ও হ্যান্ড গ্রেনেডের সাহায্যে আক্রমণ পরিচালনা করে। অল্প জনবল এবং অপর্যাপ্ত গোলা নিয়েও তারা ভোর পর্যন্ত গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে টিকতে না পেরে পাকবাহিনী বগুড়ার দিকে পালিয়ে যায়। এখানে একজন পাকসেনা বন্দী হয় এবং এদিন নন্দীগ্রাম হানাদার মুক্ত হয়।[৫১]

জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর এলাকায় সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা

পাগলা দেওয়ানের প্রথম যুদ্ধ : সফল গেরিলা আক্রমণ

জয়পুরহাট থেকে ১৫ কি. মি. পশ্চিমে এবং ভারত সীমান্ত হতে ২-৩ কি.মি. দক্ষিণে পাগলা দেওয়ান গ্রামটি অবস্থিত। পাকবাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ার পর থেকেই দলে দলে মানুষ পাগলা দেওয়ান হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পালাচ্ছিল। এপ্রিল মাসে পাকবাহিনী জয়পুরহাটে প্রবেশ করার পর পরই পাগলা দেওয়ানের ক্যাম্প স্থাপন করে। সুরক্ষিত বাঙ্কার তৈরি করে তারা এখানে শক্ত অবস্থান নেয়। এরা পলায়নপর নিরীহ বাঙালিসহ আশপাশের এলাকা থেকে মানুষ ধরে এনে পাগলা দেওয়ানের ক্যাম্পের পাশে হত্যা করতো। মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষ করে জুলাই-আগস্ট মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশ কয়েকবার পাগলা দেওয়ানের ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে কমান্ডার জাকারিয়া হোসেন মন্টু ও টুআইসি জনাব আলীর নেতৃত্বে ৩৭ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল পাগলা দেওয়ান ক্যাম্প আক্রমণের উদ্দেশ্যে ভারত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতরে ঢোকার পর পরই পাকবাহিনী টের পেয়ে যায়। ওখানেই পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে খান সেনাদের ১০/১৫ জন সৈন্য মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদেরই মধ্যে একজন তার নাম আবুল কালাম আজাদ তিনি শহীদ হন। ফজলু নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। গেরিলা আক্রমণ করেই

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধারা অন্য রাস্তা দিয়ে ভারতে চলে আসে। কারণ এই যুদ্ধের পরে পাকবাহিনী পুরো ডিফেন্স নিয়ে নেয়।[৫২]

সালপাড়ার যুদ্ধ : ফায়ার এন্ড মুভ কৌশল

জয়পুরহাটের একটা ছোট বাজার সালপাড়া, পাঁচবিবি থেকে ৪/৫ কি. মি. পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে ভারত সীমান্তের দূরত্ব ২-৩ কি. মি.। এই অঞ্চল দিয়ে মানুষ ভারতে যেত সে কারণে পাকবাহিনী এখানে একটি ক্যাম্প করে। '৭১-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের কোনো একদিন মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে যে, সালপাড়া পাকিস্তানি ক্যাম্পের বেশিরভাগ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র ১টি সেকশন পাকসেনার সঙ্গে রাজাকারের একটি দল প্রতিরক্ষায় আছে। পাকবাহিনীর এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধারা সালপাড়া পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা শিয়ালা সীমান্ত অতিক্রম করে ধলাহার গ্রামে আসে। এখান থেকে সকাল ৯টার সময় ২০/৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা সালপাড়া প্রতিরক্ষার ১০০/১৫০ গজের মধ্যে এসে থিপু গ্রামের সামনে প্রতিরক্ষার মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। অতঃপর শুরু হয় তুমুল গুলি বিনিময়। যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যায় পর্যবসিত করে প্রায় কয়েক সেকশন পাকসেনা সালপাড়া ও বেলতলী বাজার-এর পরিখা ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের দিকে ফায়ার এন্ড মুভ কৌশলের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে। সালপাড়া পরিখা ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় কয়েকজন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত হয়। ফলে সালপাড়ার পাকবাহিনী বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি তবে বেলতলীর সেকশন থিপু গ্রামের পিছন দিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা থিপু গ্রামের দক্ষিণে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী। এরই মধ্যে পাকবাহিনীর কড়িয়া ও পাগলা দেওয়ান থেকেও সেনারা চলে আসে। প্রশিক্ষিত পাকসেনাদের জনবল ও শক্তিবৃদ্ধিতে ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিকূলে চলে গেলে তারা পিছু হটে ভারতীয় সীমায় ঢুকে পড়ে। ফলে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে কিছু পাকসেনা ও রাজাকার নিহত এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছিল।[৫৩]

আটাপাড়া সীমান্ত ঘাটি আক্রমণ

পাঁচবিবি থানার বাগজানা ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকা আটাপাড়া। পাকবাহিনী এখানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা একদিন এই ঘাঁটিটি বিস্ফোরক দিয়ে বিধ্বস্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

৯ সেপ্টেম্বর '৭১ সন্ধ্যায় আটাপাড়া সীমান্ত ঘাটিতে মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিধ্বস্ত করে। অনুসন্ধান করে জানা যায়, ডিভেক্স না থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা শুধুমাত্র ফিউজের দ্বারা ৩টি চার্জ ফিট করে ঐ অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় চার্জে অগ্নিসংযোগের পর বিওপির বারান্দায় তৃতীয় চার্জে আগুন দেবার পূর্বেই ভেতরের দুটি চার্জে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তে পুরো বিল্ডিং ধ্বংস হয়। সরে দাঁড়ানোর পূর্বেই এই বিস্ফোরণ অভিযানের নেতা আবুল হোসেন ও সিরাজুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। কাছের বাঙ্কার থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসময় বৃষ্টির মত মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হানাদারেরা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জানতো না। অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা ছিল অদূরে ছোট যমুনা নদী তীরে। নৌকা যোগে সবাই নদী পার হয়ে নিরাপদে ভারতে আশ্রয় নেয়। বিওপি ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে এই অপারেশন করাতে হানাদারদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। ৩৯ জন মুক্তিযোদ্ধা এতে অংশ নেন। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল হোসেন।[৫৪]

কড়িয়া 'বিওপি'র যুদ্ধ

পাঁচবিবির কড়িয়া বিওপিতে পাকবাহিনীর একটা ক্যাম্প ছিল। সেই ক্যাম্পে প্রধানত রাজাকার, আলবদর, আল-শামস অর্থাৎ পাকবাহিনীর এদেশীয় দোসরদের অবস্থান ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্প আক্রমণের মাধ্যমে এখানকার রাজাকার আলবদরদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ এবং যতদূর সম্ভব তাদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে নিয়ে এসে পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন মুক্তিযোদ্ধাদের একটা গ্রুপের কমান্ডার জাকারিয়া হোসেন মন্টু ও টুআইসি আসাদুজ্জামান বাবলু তাদের গ্রুপের ৩৭ জন সদস্য নিয়ে কড়িয়া বিওপি ক্যাম্প আক্রমণ করে। আক্রমণের বিন্যাসটা ছিল এরকম : কভারিং-এ ফজলু নিজাম; চার্জিং-এ সন্তোস, মথুর, দীলিপ আর অন্য সবাই ছিল এ্যাডভান্স পটিতে যারা ঐ ক্যাম্পটায় ফায়ার করবে। এভাবে পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণের মাধ্যমে প্রায় ১৪/১৫ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে তাদের অস্ত্রসহ এবং এইসব রাজাকারেরা পরবর্তীতে আর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে নি। এভাবে বাহিনীর ছেলেরা শুধু একবার দুইবার নয় বহুবার কড়িয়া ক্যাম্প আক্রমণ করেছে।[৫৫]

জামালগঞ্জ রেল স্টেশন আক্রমণ

জামালগঞ্জ রেল স্টেশনটি জয়পুরহাট ও আক্কেলপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় জামালগঞ্জ রেল একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তখন এই অঞ্চলের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল রেলপথ। আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ জয়পুরহাটসহ

Dhaka University Institutional Repository

আশেপাশের পাকসেনা ক্যাম্পে শক্তিবৃদ্ধি ও সরঞ্জাম সমূহ পৌঁছানোর জন্য তথা সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য জামালগঞ্জ রেল স্টেশনটি লাইফ লাইন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মুক্তিযোদ্ধা কাজী ফরমুজুল হক (পান্না)-র নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ভারতীয় ক্যাম্প তরঙ্গপাড়া থেকে জামালগঞ্জে আসে আক্রমণের উদ্দেশ্যে। রেল স্টেশনের অবস্থান শত্রুর জনবল ও বিভিন্ন পজিশন বিবেচনা করে তারা প্রথমে স্টেশনের দক্ষিণে অবস্থিত রেলওয়ে কালভার্টে বিস্ফোরণ ঘটান এবং এরপর যখন পাকসেনা ও রাজাকারদের মনোযোগ সেদিকে চলে যাবে তখন স্টেশনের উত্তর দিক হতে মূল আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ৯ আগস্ট রাত ১.২৫ মিনিটে পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি অংশ স্টেশনের অদূরে দক্ষিণ পাশের ব্রিজটি উড়িয়ে দেয় এবং অপর দলটি উত্তর দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে প্রহরীদের নিরস্ত্র করে। অতপর প্লাটফর্ম দখল করে ত্বরিৎ গতিতে সরবরাহের একটা বড় অংশ ধ্বংস করে এবং পাকসেনা ক্যাম্পে আক্রমণ করে। এরপর দ্রুত পশ্চাৎপসারণ করে। এই অভিযানে দেলোয়ার হোসেন আহত হলে তাঁকে নিয়ে মধুপুর ইউনিয়নের নহেলা গ্রামে আশ্রয় নেয়। এটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অত্যন্ত সাফল্যজনক আক্রমণ। এখানে ১৭ জন খানসেনা, ২৬ জন রাজাকার এবং পার্শ্ববর্তী আক্কেলপুর থানার দারোগাকে নিধন করা হয়। এই অপারেশনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনী ও রাজাকারদের ১৩টি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ও ৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছিল।[৫৬]

আক্কেলপুর রেল স্টেশন আক্রমণ ও বিহারপুর ব্রিজ ধ্বংস

আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, হিলি, সান্তাহার এসব ছোট ছোট শহরগুলো একমাত্র রেল যোগাযোগের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। ফলে সীমান্ত এলাকার পাকসেনা ক্যাম্পগুলোতে খাদ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য রেলপথই ছিল প্রধান মাধ্যম। রেল চলাচলে বাধা সৃষ্টি এবং পাকবাহিনীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ১৫ নভেম্বর রাত ১২টার পর বিহারপুর রেলওয়ে ব্রিজ আক্রমণ করে এবং ব্রিজটি ধ্বংস করে।[৫৭]

পাগলা দেওয়ানের দ্বিতীয় যুদ্ধ

কৌশলগত অবস্থানের কারণে গুরুত্বপূর্ণ পাগলা দেওয়ানের পাকিস্তানিদের ক্যাম্পটি যুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের কাছেই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে মুক্তিবাহিনী পাগলা দেওয়ান ক্যাম্পে একের পর এক আক্রমণ পরিচালনা করেছে। মুক্তিবাহিনীর মূল উদ্দেশ্যই ছিল পাকবাহিনীর মনে ভীতি সৃষ্টি করা। জয়পুরহাট টিনিকলের ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

একদিন রাতে একশ থেকে সোয়াশ মুক্তিযোদ্ধা পাগলা দেওয়ান ক্যাম্প আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা শ্রী নদীর এপার-ওপার অর্থাৎ ভারত ও বাংলাদেশের উভয় সীমান্তে অ্যাম্বুশ নেয়। রাত তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা পাগলা দেওয়ান ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। সকাল ৯টা পর্যন্ত গোলাগুলি চলার পর এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলা-বারুদ কমে আসে। অতঃপর পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললে মুখোমুখি গুলি বিনিময়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে চলে আসে। এখানে ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পোষাকগুলো ও তিনটি রাইফেল দিয়ে সোবরা ক্যাম্পে ফেরত আসে।[৫৮]

হিলির প্রথম যুদ্ধ

বৃহত্তর বগুড়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো হিলির যুদ্ধ। '৭১ সালে হিলি ছিল বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুরের একটি সীমান্ত এলাকা। বাংলাদেশ ও ভারতের সরাসরি প্রবেশদ্বার ছিল হিলি। যে কারণে পাকিস্তানিরা ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশ রোধকল্পে এখানে দুর্ভেদ্য বাঙ্কার গড়ে হিলির চতুর্দিকের গ্রামগুলোতে সুরক্ষিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পাক আর্মিরা তাদের বাঙ্কারগুলো এমনভাবে তৈরি করে কোনোভাবেই বোঝার উপায় ছিল না যে এখানে বাঙ্কার আছে। কারণ বাঙ্কারের উপর দিয়ে রেললাইন গিয়েছে এবং মাঠের পর মাঠে সর্ষে ফুল ফুটে আছে। ফলে বাঙ্কার কোথায় তা টের পাওয়া যায় নি। এই কারণে প্রথমবার যখন ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী হিলিতে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী বাঙ্কার থেকে ফায়ার ওপেন করলে শত শত ইন্ডিয়ান আর্মি ও মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে হিলি মুক্ত হয়। হিলির যুদ্ধে ভারতীয় ২০২ মাউন্টেন ব্রিগেডের সৈন্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের এফ.এফ যোদ্ধা বা সম্মুখ যুদ্ধের ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেছে। হিলিতে ২টি যুদ্ধ হয়—প্রথম যুদ্ধ ২২-২৩ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ ৯-১১ ডিসেম্বর। হিলির প্রথম যুদ্ধকে মোরাপাড়া ও বাসুদেবপুর-এর যুদ্ধও বলা যায়। মিত্র বাহিনী ২২ নভেম্বর রাত ৮টায় মোয়াপাড়া আক্রমণ করে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে মোয়াপাড়া শত্রুর পজিশন অক্ষত থাকে। রাত দেড়টার দিকে মিত্র বাহিনীর 'এ' ও 'বি' কোম্পানি মোয়াপাড়া আক্রমণ করে কিন্তু তারা শত্রুর বিন্যাস এলাকা অতিক্রমের পর পরই প্রচণ্ড ফায়ারের সম্মুখীন হন। এতে করে মিত্র বাহিনীর গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে যায়। নিহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। 'এ' কোম্পানির অধিনায়ক ও উপ-অধিনায়ক নিহত হন। কোম্পানির ৫০ জন যোদ্ধা দক্ষিণ এবং পশ্চিম মোরাপাড়াতে প্রতিরক্ষা অবস্থানে পৌঁছে। 'বি' কোম্পানি উত্তর পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করতে গিয়েও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ পর্যায়ে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার চতুর্থ কোম্পানিকে গ্রাম শত্রুমুক্ত করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

তলব করে। ভোর রাতের দিকে এই কোম্পানির কমান্ডারও শহীদ হয়। অতঃপর ব্রিগেড কমান্ডার ৫ গারওয়ালের একটি কোম্পানিকে বাসুদেবপুর বিওপি দখলের জন্য প্রেরণ করে। কিন্তু দিনের বেলাতে মিত্রবাহিনীর ট্যাংক স্কোয়াড্রন ভেজা ও নরম কাদা মাটিতে অগ্রসর হতে না পারলে তারা আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য পেট্রোলিয়ানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং মোরাপাড়াস্থ কোম্পানির সঙ্গে সংযোগ করে। অধিনায়ক দ্রুততার সঙ্গে এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে মোরাপাড়া দখল করে নেয়।[৫৯]

হিলির দ্বিতীয় যুদ্ধ : পাঁচবিবি ও জয়পুরহাট দখল

হিলির দ্বিতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৯-১১ ডিসেম্বর। এই যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমেই ভারতীয় বাহিনী হিলি-ঘোড়াঘাট সড়ক দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং অল্প কয়েকদিন অর্থাৎ ৩-৪ দিন পরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। ২০২ ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার ভাট্টি ৯ ডিসেম্বর হিলির উপর তার সর্বশেষ আক্রমণের সূচনা করেন। পাঁচটি গোলন্দাজ ব্যাটারির বিরামহীন গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে চারটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং এক স্কোয়াড্রন টি-৫৫ মাঝারি ট্যাংক হিলির পাকিস্তানি অবস্থানে সরাসরি আঘাত হানে।[৬১] ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর ২২ মারাঠা মিত্র বাহিনী দুরয়া আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। এরপর দখল করে বারাঞ্চ গ্রাম। ১০ ডিসেম্বর দিনের বেলায় বিসাপাড়া আক্রমণ করে। ট্যাংক দ্বারা আউট ফ্ল্যাংকির এর মাধ্যমে এর পর বিসাপাড়াও দখল হয়ে যায়। অপরদিকে ৮ গার্ড রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানি চান্দিপুরে আক্রমণ করে এবং ১১ ডিসেম্বর ভোরে তা শত্রুমুক্ত হয়। অপর ২টি কোম্পানি আখক্ষেত, পাটক্ষেত এবং ধানক্ষেতের মধ্যদিয়ে সেকশনে অনুপ্রবেশ করে উত্তর-দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক দিয়ে দাঙ্গাপাড়া আক্রমণ করে। এতে করে পাকবাহিনী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এখানে সম্মুখ যুদ্ধ শেষে দাঙ্গাপাড়া দখল করতে ১১ ডিসেম্বর দুপুর হয়ে যায়। এভাবে দাঙ্গাপাড়া দখলের মাধ্যমে হিলির যুদ্ধ শেষ হয়। মিত্র বাহিনী তাদের বিজয় অগ্রযাত্রা শুরু করে ঘোড়াঘাট সড়ক দিয়ে। হিলির যুদ্ধে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর জয় লাভের মধ্য দিয়ে দিকে দিকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর বিজয় সূচিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬৫ ব্রিগেড ও যৌথবাহিনী ১৩ ডিসেম্বর প্রথমে পাঁচবিবি এবং পরে জয়পুরহাট দখল করে নেয়।[৬২]

বিজয় পর্ব

হিলি দখলে নেবার পর ভারতীয় বাহিনী ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের তিনটি ব্রিগেড তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষ ধরে বগুড়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে। ২০২ ব্রিগেড হিলির খানিকটা দক্ষিণ-পূর্বে ক্ষেতলাল হয়ে বগুড়ার দিকে অগ্রসর হয়। ৩৪০ ব্রিগেড গাইবান্ধা ও ফুলছড়ি ঘাট দখল করে বগুড়ার

Dhaka University Institutional Repository

মহাস্থানগড়ের করতোয়া সেতু দখল করে ১১ ডিসেম্বর। ১২ ডিসেম্বর মহাস্থানগড়ের পতন ঘটে।[৬৩] ৬৬ ব্রিগেড পীরগঞ্জ, রংপুর হয়ে বগুড়া শহরের ৩ কি.মি. উত্তরে নওদাপাড়া, চাঁদপুর এবং ঠেঙ্গামারা গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান লাঠিগাড়ি পাথার সংলগ্ন বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে অবস্থান নেয়। এখান থেকে বগুড়া শহরে অভিযান চালানোর জন্য ফ্রন্ট ফাইটার গুর্খা বাহিনীর সৈন্যরা ট্যাংক নিয়ে শহরের অভিমুখে এবং করতোয়া নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে দু'দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হয়। মিত্র বাহিনী শহরতলীর ফুলবাড়ী এলাকায় এতিমখানার নিকট পৌঁছলে ওৎ পেতে থাকা পাকবাহিনী আকস্মিক হামলা চালায়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। ভারতীয় বিমান পাক অবস্থানের উপর হামলা করে। ১০, ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর তুমুল যুদ্ধ হয়। ১৩ ডিসেম্বর ৩টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার এলাহী বক্স প্রায় ৫/৭শ সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বৃন্দাবন পাড়ায় আত্মসমর্পণ করে। পরাজিত পাকবাহিনী আটাপাড়ায় অবস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ড (ওয়াপদা) ভবনে মিত্র বাহিনীর হেফাজতে অবস্থান গ্রহণ করে।[৬৪] ১৩ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর ৬ষ্ঠ গার্ড ব্যাটালিয়ন অগ্রসর হয় দক্ষিণ দিকে সুখানপুকুর, গাবতলী সাজাদপুর হয়ে বগুড়া পুলিশ লাইনের পেছনে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের কাছে। এই ব্যাটালিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা ও বগুড়ার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা। ১৪ ডিসেম্বর রাত তিনটায় এই ইউনিটটি করতোয়া নদী পার হয়ে বগুড়া পুলিশ লাইনের পেছনে পৌঁছায়। অতঃপর পিটি ৭৬ ট্যাংক নিয়ে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের মাঝিড়ায় যৌথ-বাহিনীর দুটো জীপ ও একটা ট্রাক তাদের আক্রমণের শিকার হলো এবং ও কনভয়ে থাকা সবাই নিহত হলো। অতঃপর বগুড়া টেকনিক্যাল কলেজ এলাকায় অবস্থানের ৩ পাকবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। এখানে প্রায় ৩ দিন যুদ্ধ চলার পর মিত্র বাহিনী টেকনিক্যাল কলেজ দখল করে। এখানে পাকবাহিনীর ঘাটিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এরপর ১৮ ডিসেম্বর এই বাহিনী বগুড়া সাতমাথায় প্রবেশ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডার জিওসি মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ মিত্র বাহিনীর ২০ মাউন্টেইন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল লচমন সিং এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।[৬৫]

বাংলাদেশের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা লাভ। সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। আমাদের গর্ব ও গৌরবময় এই অর্জনের পেছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী ট্রেনিং কিংবা ভারী সমরাস্ত্র না-থাকলেও বাঙালির আবেগ ও সহানুভূতির কমতি ছিল না। মাঠ-গবেষণা, তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানে এ-কথার সত্যতা মিলে যায়। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে, মাত্র নয় মাসের এই অর্জনকে হয়ত-বা অনেকেই অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারেন—বাংলাদেশের মানুষের হাতে আধুনিক সমরাস্ত্র না-থাকলেও যার হাতে যতটুকু রসদ ছিলো তাই ঢেলে দিয়েছে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য।

বগুড়া জেলার যুদ্ধের বর্ণনা লিখতে গিয়ে প্রায় অধিকাংশ থানার জীবিত উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা—বিশেষত, নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। তাদের কাছ থেকে গৃহীত সাক্ষাৎকার এবং দেয় লিখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় বগুড়ার যুদ্ধ একটু অন্যভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। এই ব্যাপকতা ও বিস্তারের নেপথ্যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যোগসূত্র গভীর। নদীপথ, সড়কপথ, রেলপথ এবং আকাশপথ—এই চতুর্বিধ পথেই বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নসহ হিলি স্থলবন্দর হওয়ায় এবং বগুড়া উত্তরাঞ্চলের ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্রে পরিণতি লাভ করায় খুব সহজেই বিহারিদের বসবাস এবং পাকবাহিনীর দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয়েছিলো। এর নেপথ্যে একটি কারণকেও ছোট করে দেখার উপায় নেই—১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ায় ভারত থেকে আসা মুসলমানরা সহজে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। দেশ-মাটি-সম্পদ ত্যাগ করে এদেশে আসা মুসলমানরা নিজেদেরকে ইসলামের বিশ্বস্ত একজন মনে করে এবং পাকিস্তানকে তাদের আস্থা ও ঠিকানা হিসাবে বিবেচনা করে। একাধিক কারণে বগুড়ার যুদ্ধে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ এবং গুপ্তহত্যা, অগ্নি-সংযোগ, লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণ ব্যাপকতা লাভ করে।

বগুড়া জেলার পূর্ব অঞ্চলের গাবতলী, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, ধুনট, শেরপুর এবং পশ্চিম-বগুড়ার আদমদীঘি, দুপচাচিয়া, কাহালু, শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম, জয়পুরহাট, ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর ও পাঁচবিবি থানায় সংঘটিত একাধিক যুদ্ধের বর্ণনা চলমান অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় মনোভাব এবং আত্মত্যাগ স্মরণযোগ্য। পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা নদীপথে চোরাগোপ্তা হামলা অব্যাহত রেখেছিলো প্রাণ-বাজি রেখে। তারা বিভিন্ন ব্রিজ-কালভার্ট উড়িয়ে দেয়। ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মাইন অপারেশন চালায়। গেরিলা আক্রমণ করে পাকবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়াসহ নদীপথে পাকবাহিনীর লঞ্চে আক্রমণ করে লঞ্চ ডুবিয়ে দেয় এবং একাধিক চোরাগোপ্তা হামলা চালায়। সর্বস্তরের জনসাধারণের তথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-ছাত্র-জনতা-নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল আমাদের স্বাধীনতা—বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা বিশ্লেষণে এ-কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. সাক্ষাৎকার, এ.বি.এম শাহজাহান, ৩ মে ২০০৮, শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, ৩ মে ২০০৮, হোসেন আলী, ৪ মে ২০০৮, রেজাউল বাকী ৪ মে ২০০৬।
২. সাক্ষাৎকার, মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেল, ২১ মে ২০০৮।
৩. সাক্ষাৎকার, খাজা নাজিম উদ্দিন, ৩ মে ২০০৮।
৪. সাক্ষাৎকার, মোঃ শফিকুল আলম, ৫ মে ২০০৮।
৫. ঐ।
৬. ঐ।
৭. সাক্ষাৎকার, মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেল, ২১ জুন ২০০৮।
৮. ঐ।
৯. ঐ।
১০. ঐ।
১১. সাক্ষাৎকার, মিজানুর রহমান রতন, ৫ মে ২০০৮।
১২. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *দুই শতাব্দীর বুকে (বগুড়ার ইতিহাস)*, প্রজাবাহিনী প্রেস, বগুড়া, ১৯৭৬, পৃ. ১৭৮।
১৩. সাক্ষাৎকার, মিসবাহুল মিল্লাত নান্না, ৭ মে ২০০৮।
১৪. ঐ।
১৫. ঐ।
১৬. সাক্ষাৎকার, সমুদ্র হক, ৬ মে ২০০৮।
১৭. সাক্ষাৎকার, মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেল, ২১ জুন ২০০৮।
১৮. সাক্ষাৎকার, রেজাউল বাকী, ৪ এপ্রিল ২০০৬।
১৯. সাক্ষাৎকার, মোঃ শফিকুল আলম, ৫ মে ২০০৮।
২০. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২-১৮৩।
২১. সাক্ষাৎকার, আব্দুল আজিজ রঞ্জু, ৪ মে ২০০৮ এবং এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।
২২. সাক্ষাৎকার, আব্দুল আজিজ রঞ্জু, ৪ মে ২০০৮।
২৩. সাক্ষাৎকার, গোলাম জাকারিয়া খান রেজা, ৫ মে ২০০৮ এবং এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯।
২৪. সাক্ষাৎকার, মিসবাহুল মিল্লাত নান্না, ৭ মে ৮ এবং আব্দুল হামিদ, ৫ মে ২০০৮।
২৫. সাক্ষাৎকার, মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেল, ২১ জুন ২০০৮।
২৬. ঐ।
২৭. সাক্ষাৎকার, গোলাম জাকারিয়া খান রেজা ৫ মে ২০০৮ এবং এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।
২৮. সাক্ষাৎকার গোলাম জাকারিয়া খান রেজা, ৫ মে ২০০৮।
২৯. সাক্ষাৎকার, আব্দুল হামিদ, ৫ মে ২০০৮ এবং এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।
৩০. এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*।
৩১. সাক্ষাৎকার, আব্দুল আজিজ রঞ্জু, ৫ মে ২০০৮, খাজা নাজিম উদ্দিন, ৩ মে ২০০৮, তহসিন আলী, ১০ মে ২০০৮, মোঃ মোখলেছুর রহমান বাবলু, ১০ মে ২০০৮, মোঃ বজলার রহমান, ৩ মে ২০০৮ এবং এ.জে.এম সামুছ উদ্দীন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫।
৩২. সাক্ষাৎকার, মোঃ মোখলেছুর রহমান বাবলু, ১০ মে ২০০৮।
৩৩. সাক্ষাৎকার, মোঃ মোসলেম উদ্দিন, ৮ মে ২০০৮, খাজা নাজিম উদ্দিন, ৩ মে ২০০৮ এবং *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ষষ্ঠ খণ্ড, এরিয়া সদর দপ্তর, বগুড়া, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনা সদর শিক্ষা পরিদপ্তর, বইমেলা ২০০৮, পৃ. ১২৬।
৩৪. সাক্ষাৎকার, রেজাউল করিম মন্টু, ৫ এপ্রিল ২০০৬।
৩৫. সাক্ষাৎকার, গোলাম মোস্তফা ঠাণ্ডু, ১০ মে ২০০৮।
৩৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১১৭।
৩৭. ঐ, পৃ. ১২২-১২৩।
৩৮. সাক্ষাৎকার, এ.বি.এম শাহজাহান, ৩ মে ২০০৮ এবং হোসেন আলি, ৪ মে ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. সাক্ষাৎকার, শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, ৩ মে ২০০৮।
৪০. সাক্ষাৎকার, হোসেন আলি, ৪ মে ২০০৮ এবং শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, ৩ মে ২০০৮।
৪১. সাক্ষাৎকার, শফিকুল আলম, ৫ মে ২০০৮।
৪২. সাক্ষাৎকার, এ.বি.এম শাহজাহান, ৩ মে ২০০৮।
৪৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৫।
৪৪. ঐ, পৃ. ৮৪।
৪৫. সাক্ষাৎকার, সুনীল চন্দ্র প্রামাণিক, ২ মে ২০০৮।
৪৬. সাক্ষাৎকার, আবুল কাশেম, ৩ মে ২০০৮।
৪৭. সাক্ষাৎকার, সুনীল চন্দ্র প্রামাণিক, ২ মে ২০০৮।
৪৮. সাক্ষাৎকার, শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, ৩ মে ২০০৮।
৪৯. সাক্ষাৎকার, এ.বি.এম শাহজাহান, ৩ মে ২০০৮, হোসেন আলি, ৪ মে ২০০৮, শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, ৩ মে ২০০৮।
৫০. *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫।
৫১. ঐ, পৃ. ১৩৯-১৪০।
৫২. সাক্ষাৎকার, জনাব আলী, ৩০ এপ্রিল ২০০৮।
৫৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬২।
৫৪. মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, সম্পাদনা : আবুল কাশেম, জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট, ২৬ মার্চ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৯।
৫৫. সাক্ষাৎকার, জনাব আলী, ৩০ এপ্রিল ২০০৮।
৫৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১২ এবং মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।
৫৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭২।
৫৮. মুক্তিযুদ্ধ জয়পুরহাট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।
৫৯. সাক্ষাৎকার, এস.এম জাকির উদ্দিন (জাকারিয়া), ১ মে ২০০৮।
৬০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।
৬১. ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, একাত্তরের গাইঘাক্কা, বাংলাদেশ চর্চা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৩৪।
৬২. সাক্ষাৎকার, জনাব আলী, ৩০ এপ্রিল ২০০৮ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।
৬৩. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৩৫।
৬৪. মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা, উত্তরণ পাবলিক লাইব্রেরি, বগুড়া।
৬৫. মেজর এ.টি.এম হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম, পিএসসি (অব.), জলছবি ৭১, মিসেস শামীম তারেক, পরিবেশক : নিখিল প্রকাশন, ৮/৫ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ১১১-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত বাঙালি জাতি একাত্তরে এসে দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কৃষক, শ্রমিক এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদ, ছাত্র, জনতা, নারী সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের ফলেই মাত্র ৯ মাসের মধ্যে বাঙালি জাতি তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বৃহত্তর বগুড়া জেলাতেও মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়। স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালি জাতির ইস্পাতকঠিন প্রতিজ্ঞা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে বগুড়ার প্রতিটি থানায়। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন চাকরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, কৃষক, শ্রমিক, নারী, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, ধনী, গরিব নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ সর্বান্তকরণে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশমাতৃকাকে শত্রু মুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করে।

শ্রমিকদের ভূমিকা

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বাংলাদেশের যে কয়টি জেলায় বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল বগুড়া ছিল তার মধ্যে অন্যতম। বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে ছিল—জামিল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, ভার্জিনিয়া টোবাকো কোম্পানি, কটন স্পিনিং মিল, জাহেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরি, নর্থ বেঙ্গল ট্যানারি, ভাণ্ডারি গ্রুপ, জয়পুরহাট চিনিকল প্রভৃতি। এই সকল শিল্প কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করতো। শিল্প কারখানাগুলোর অধিকাংশের মালিক ছিলেন অবাঙালি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে ওঠা এই অবাঙালি সম্প্রদায়ের হাতে আঞ্চলিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার ফলে সর্বৈব বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে বৈষম্য ও অসমতার শিকার হন। এই বঞ্চনা ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণীকে অসহিষ্ণু করে তোলে। একটা পর্যায়ে এসে ষাটের দশকে শ্রমিকরা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সম্বলিত দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এসব দাবি-দাওয়াগুলোর মধ্যে ছিল বেতন বৃদ্ধি, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ সাবসিডি বাড়ানো ইত্যাদি।[১] এ সময় শ্রমিকদের সমর্থন জোগায় প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাঁরা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন এবং শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করতে সমর্থ হন। এভাবে ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচিতে শ্রমিক

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর দাবি-দাওয়াগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে। ফলে শ্রমিকরা সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। '৬৯-র গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজনৈতিক দলসমূহের আহ্বানে বিশেষত আওয়ামী লীগের ডাকে এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহূত বিভিন্ন সভা সমাবেশে হাজার হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ফলে বগুড়ায় গণ-আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। শ্রমিকদের সংগঠিত করে আন্দোলনকে বেগবান করার অপরাধে '৬৯-এর ২ ফেব্রুয়ারি গাজীউল হক, মোখলেছুর রহমান, সুবোধ লাহিড়ী, আব্দুল লতিফ, আব্দুল খালেক, জওহর মল্লিক, আব্দুর রাজ্জাক, আকরাম হোসেন খানসহ ১১ জন নেতাকে গ্রেফতার করে। রাজনৈতিক এবং শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদের পরের দিন বগুড়ার সকল শিল্প-কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল সহকারে আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে উপস্থিত হয়ে এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ করে। এই শ্রমিক সমাবেশে গ্রেফতারকৃত ১১ জন নেতার মুক্তি দাবি করে ৭২ ঘন্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিড়ি-শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শাহজাহান আলী। বক্তব্য প্রদান করেন আঃ সাত্তার তারা, আঃ গোফফার শেখ, সেকান্দার আলী, বুলু মিয়া, আনসার আলী, আঃ রহমান, আঃ সাত্তারসহ আরো অনেকে।[২] ক্রমান্বয়ে শ্রমিকরা স্বতন্ত্রভাবে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জেল জুলুম এবং নির্যাতনের প্রতিবাদ জানায়।

বগুড়া জেলা কেন্দ্রীয় শ্রমিক ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এখানে সক্রিয় ছিল। বগুড়া জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন কমরেড মোখলেছুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার তারা। এই দু'জনের নেতৃত্ব ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন মোশাররফ হোসেন মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কামরুল হুদা টুকু। বিড়ি-শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন আব্দুল গাফফার শেখ এবং সাধারণ সম্পাদক আনিসার রহমান। কটন মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন সেকান্দার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক আঃ সাত্তার তারা। এই সকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলো বগুড়া জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রমিক ফেডারেশনের অফিস ছিল প্রথমে কালীতলা হাটে পরবর্তীতে এসে দত্ত বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে মূলত ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা থাকলেও এই শ্রমিকেরা আওয়ামী লীগ আহূত বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতো।[৩] '৬৯-এ জয়পুরহাট চিনিকলের শ্রমিকদের সংগঠিত করে আওয়ামী লীগ নেতা মাহতাব মণ্ডল, রাজা চৌধুরী ও শ্রমিক নেতা আঃ আজিজসহ কতিপয় নেতা। তাঁরা শ্রমিকদের সংগঠিত করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে নিয়ে আসতেন। শ্রমিকদের এই অংশগ্রহণ স্বাধীনতা আন্দোলনকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। '৭০-এর ২০ জানুয়ারি শহীদ

Dhaka University Institutional Repository

আসাদ দিবসে জয়পুরহাট চিনিকলের শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে এবং শহরের প্রধান সড়কে অবস্থিত মুসলিম লীগের অফিস ভাংচুর করে।[৪]

৭০'র এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তাল হয়ে ওঠে '৭১-এর মার্চ। বগুড়ার অলি-গলি মিছিল শ্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতিবিদ, চাকুরিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মিল-কারখানার শ্রমিক, রিকশাওয়ালা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে আন্দোলনে যোগ দেয়। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে' এই ঘোষণার পর সমগ্র বগুড়া জেলায় সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ন্যায় শ্রমিকরাও উদ্বেলিত হয়। জয়পুরহাট চিনিকলের গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা বিভিন্ন রকম বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সাহায্যে বোমা তৈরি করে। এছাড়াও মোকাবেলা করার জন্য তারা একটি কামান তৈরি করে।[৫] আনোয়ার হোসেন, হাফিজার রহমান, কালু, আব্দুল আজিজ, একরামুল হক, বুলু, বাবলু, আলমসহ সুগার মিলের বিভিন্ন শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতা এই কাজে অংশগ্রহণ করে। মার্চের প্রথম থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে শ্রমিকদের মিছিল মিটিং চলছিল। এ সম্পর্কে এ.জে.এম সামুছউদ্দিন তরফদার লিখেছেন, '২৫ শে মার্চ সন্ধ্যাবেলা ছাত্রদের মিছিল পথে বাহির হইল। তাহার পরে পরেই লাল ঝাণ্ডাসহ শ্রমিকদের মিছিল চলিয়া আসিল। ছাত্র আর শ্রমিকদের শ্লোগানে বগুড়া শহরের রাজপথ আর অলিগলি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।'[৬] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বগুড়ার বিভিন্ন শিল্প কারখানার অনেক শ্রমিক কর্মচারী শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এদের মধ্যে জয়পুরহাট চিনিকলের উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধারা হলেন : ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলী, জনাব আলী, আব্দুল আজিজ, একরামুল হক প্রমুখ।[৭] বগুড়ার বিভিন্ন মিল কারখানা থেকে অনেকেই সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রমিক কর্মকর্তা হলেন, মন্টু মিয়া, আঃ জলিল, ডা. নারায়ণ চন্দ্র, আঃ সারোয়ার হোসেন, আঃ জব্বার প্রমুখ। বিচ্ছিন্নভাবে অনেক শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেও জামিল গ্রুপের বিভিন্ন মিল কারখানা থেকে ৭ জন, তাজমা সিরামিক থেকে ৩ জন, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের ৫/৬ জনের সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করে।[৮]

সংবাদিকদের ভূমিকা

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। যুগ যুগ ধরে পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিভিন্ন রকম বৈষম্যের সঠিক চিত্র উঠে এসেছে সংবাদপত্রের পাতায়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার এই বৈষম্য বাংলার সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সময় থেকেই বগুড়ার বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের খবর তৎকালীন প্রধান প্রধান দৈনিক বিশেষত দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, আজাদ, ইত্তেফাক ইত্যাদিতে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাগুলোর বগুড়াস্থ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হতো।

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বগুড়া থেকে তেমন কোনো দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন অনিয়মিতভাবে কিছু কিছু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করতো যার অধিকাংশই ছিল সাহিত্যনির্ভর। বগুড়া প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শহীদ বুদ্ধিজীবী অধ্যক্ষ মহসিন আলী দেওয়ানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'বগুড়া বুলেটিন' ও সান্ধ্য দৈনিক 'জনমত' প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকাগুলোতে স্থানীয় খবরাখবর তুলে ধরা হতো। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি মাহমুদুল হাসান খানের নেতৃত্বে, জাহেদুর রহমান যাদুর সম্পাদনায় এবং যাবেদুর রহমানের প্রকাশনায় 'সমাচার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সাধনা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[৯] পত্রিকাটি বগুড়া এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৭০-৭১ সালে এটি কখনো নিয়মিত আবার কখনো অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার জন্য আব্দুস সামাদ ঘাড়ে করে, মাথায় করে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পত্রিকাটি বিক্রি করতো। সাধনা প্রেস থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো বলে পাকবাহিনী বগুড়া দখল করার পর প্রেসটিতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়া হয়।[১০] বর্তমানে এই পত্রিকাটির কোনো কপি খুঁজে পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ভারতের বালুরঘাট শহর থেকে পাঁচবিবির আমিনুল হক বাবুলের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক বাঙলাদেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন ডা. অমল পাল ও অনিয় সাহা ঝুনু। এই পত্রিকাটি সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যক্তি মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত।[১১] এভাবে পত্রিকাটি যুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বগুড়ায় প্রাথমিক প্রতিরোধের সময় যোদ্ধাদের মনোবল যুগিয়েছে 'জয় বাংলা' সংবাদপত্র। এই পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় মুক্তিফ্রন্টের অগ্রবর্তী সংবাদ পরিবেশন করার মাধ্যমে বীরদের সাহস জোগানো হতো। সাইক্লোস্টাইল মেশিনের মাধ্যমে পত্রিকাটি বের করা হতো এবং বিভিন্ন জন মাথায় করে নিয়ে জায়গায় জায়গায় বিলি করতো।[১২]

জনগণের ভূমিকা

চিহ্নিত কিছু দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। পাকবাহিনীর ঘোষণা, নিপীড়ন, নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাধারণ জনগণ নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে। এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে ধনী-গরিব কোনো ভেদাভেদ

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। যার যা সামর্থ্য ছিল সেই সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করেই তারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, অনেকেই তাদের নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। এ সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম মন্টুর বক্তব্য থেকে মূল্যমান তথ্য জানা যায়। তিনি বলেন, 'শতকরা ৯৪% মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ছিল। যারা হাতেগোনা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে তারা কিছু মানুষ। সাধারণ মানুষ সঙ্গে না থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ করতে পারত না। সারিয়াকান্দি থানার গণকপাড়া গ্রামে একদিন সকাল থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করার পর একটা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে পালিয়ে আসছিলো মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ। সারাদিন তাদের পেটে কোনো দানা-পানি পড়ে নাই। ফেরার পথে তারা একজন গরীব মানুষের বাড়ি গেল এবং খাওয়ার কথা বলল। তাঁর নিজের ঘরে খাবার ছিল না তথাপিও লোকটি অন্যের বাড়ি থেকে ভাত-তরকারী নিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। এই যে আন্তরিকতা এই আন্তরিকতা না থাকলে তো মুক্তিযুদ্ধ করা সম্ভব হত না।'[১৩]

মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়ই অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে দেশের মানুষের বন্ধন ছিল অটুট, ঐক্য ছিল ইস্পাত-কঠিন। দেশের সাধারণ মানুষকে এই ঐক্যই যুগিয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা ও শক্তি। স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত সাধারণ জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে কোনো কিছু বাকি রাখে নাই। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে খান সেনাদের অবস্থান, রাজাকারদের অবস্থানসহ সকল তথ্য তারা সরবরাহ করেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের দুঃসাহস ছিল অত্যধিক। বিভিন্ন স্থানে অপারেশনের জন্য তারা মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করতেন। একদিন অপারেশন না করলে গ্রামের লোকেরাই মুক্তিযোদ্ধাদের তাগাদা দিতেন এবং বলতেন যে, 'আজ আমাদের ভাল লাগছে না। আপনারা যে কোনো এক জায়গায় অপারেশনে চলেন।'[১৪]

সকল স্থানেই সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছে। তাঁরা খেয়ে না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। তাদের শোবার ঘরে জায়গা দিয়েছে এমনকি মুক্তিযোদ্ধারা যখন কোথাও যেত তখন তাদের সামনে পেছনে অন্ততপক্ষে ১০/১৫ জন করে লোক থাকতো। তারা বলতো যে, 'আপনারা পিছনে আসেন আমরা আগে আগে যাব। যদি আক্রান্ত হই তাহলে যেন আমরা আগে মারা যাই। তবুও তো আপনারা দেশ স্বাধীন করতে পারবেন।' সাধারণ মানুষ ছিল অভূতপূর্ব সাহসের অধিকারী, দেশপ্রেমিক এবং সচেতন। এই সচেতনতাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করার জন্য। সাধারণ মানুষের এই বোধ এই চেতনা হঠাৎ করেই জাগ্রত হয় নি। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈরী আচরণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৈষম্য সাধারণ মানুষকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শত্রুর আক্রমণের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে সঙ্গে জনগণ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে নিজেদের উদ্যোগেই সংগঠিত হয়েছে। কারো সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে জনগণ নিজেদের সম্পদকে সমবেত করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ নিজেদের আরাম-আয়েশকে জলাঞ্জলি দিয়েছে হাসিমুখে। প্রাসঙ্গিক কারণে একটি সত্য ঘটনা না-বললেই নয়। জীবন ঘনিষ্ঠ গল্পের মাধ্যমে বাঙালির স্বদেশপ্রেম শিক্ষণীয়। দুপচাঁচিয়ার একটা গ্রামে এবিএম শাহজাহান এবং হোসেন আলীর গ্রুপ অবস্থান করছিল। তাঁরা গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ভাগ ভাগ হয়ে থাকতো। মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ১ সপ্তাহ পূর্বে বিয়ে হয়েছিল এমন একটি নবদম্পতি নিজেরা বারান্দায় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাঁদের নিজেদের শোবার ঘরে জায়গা করে দিয়েছিল।[১৫] তীব্র শীতের রাতে মা তার সন্তান-সন্ততিসহ একটা ছোট্ট ঘরে অবস্থান নিয়ে কাঁথা গায়ে দিয়ে কষ্ট করে ঘুমিয়েছে অপরদিকে নিজেদের শোবার ঘরের চৌকির উপর লেপ-তোষক সহযোগে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকতে দিয়েছে। অভাবতাড়িত সাধারণ মানুষের কাহিনী বললেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বলেন, 'বড় দরগাহাটের উত্তর পার্শ্বের পুরো একটা গ্রামের মানুষের পেশা চুরি করা। সেই চোরের গ্রামেও মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিল।[১৬]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শুধু অস্ত্র হাতে যারা যুদ্ধ করেছেন কেবল তারাই মুক্তিযোদ্ধা নন; অস্ত্র ছাড়াও যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তারাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। তাদের অবদানও কোনো অংশে কম নয়। এরকম কয়েকজন ব্যক্তি হচ্ছেন বগুড়া সদরের নামুজা ইউনিয়নের চালমোহিনী গ্রামের এডভোকেট খয়বর আলি, অধ্যাপক আবুল হোসেন, বাঘোরপাড়া গ্রামের মোমতাজুর রহমান, গোকুল গ্রামের অধ্যাপক আইয়ুব, কুকরুল গ্রামের মোখলেছুর, আশোকোনা গ্রামের তৈয়ব আলী, মহিষবাথান গ্রামের খলিল মাস্টার, তেলিহারা গ্রামের ছাত্রনেতা সামছুল হক প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষপর্যায়ে যখন ভারতীয় মিত্রবাহিনী বগুড়া দখলের জন্য আসেন তখন বগুড়ার উপরদিয়ে রংপুর-বগুড়া মহাসড়ক সংলগ্ন বিরাট আমবাগানে এবং চাঁদপুর গ্রামের জঙ্গলের মধ্যে মিত্রবাহিনী অবস্থান করে পাকবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ ব্যূহ রচনা করে। এসময় মিত্রবাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপের যোদ্ধারা এ সময়ে মিত্রবাহিনীর খাবারের ব্যবস্থা থাকলেও মুক্তিবাহিনীর খাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা অনাহারে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এ সম্পর্কে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ ছিল এরকম—'বগুড়া টাউন আক্রমণ করার পূর্বে কোনো খাদ্য বা খাবার ছিল না। অনাহার অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধের কোনো বিরতি নাই। দুই দিন যুদ্ধ করার পর পাশের গ্রাম থেকে জনগণ আমাদের জন্য খিচুরি রান্না করে মাথায় ও কাঁধে করে পৌঁছে দেয়। সেইগুলি পর্যায়ক্রমে জীবন বাঁচানোর জন্য অল্প অল্প করে অপরিষ্কার কলা

Dhaka University Institutional Repository

পাতায় খাওয়া হয়। ধীরে ধীরে নিজ নিজ জায়গা ফিরে পেলাম। আমি এমন এক পজিশনে পড়ে গিয়েছিলাম যেখান থেকে অন্য কোনো দিকে সরে যাবার উপায় ছিল না। মাটিতে শোওয়া অবস্থায় প্রস্রাব পায়খানা করে ঢেলা ব্যবহার করতে হতো।[১৭] যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-অনাহারী এবং মৃত্যুমুখে পতিত এ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন উপরে বর্ণিত দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গ। স্থানীয় জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাল, ডাল, তেলসহ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং টাকা পয়সা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে লাগলো। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরি হবার পর বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটা। এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এল অত্র এলাকার কিছু অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবক। তারা হলেন—বাঘোর পাড়া গ্রামের সালামত, জবির উদ্দিন, আব্দুস সামাদ, কোরবান আলী, মোসলেম উদ্দিন, মহিষবাথান গ্রামের নিজাম, সাত্তার, গফুরসহ আরও অনেকে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত এসকল যুবকদের পথচলা এবং পথ চেনার প্রশিক্ষণ দিলেন ছাত্র নেতা মুক্তিযোদ্ধা সামাদ এবং মুক্তিযোদ্ধা ইসরাইল হোসেন।[১৮]

আইনজীবীদের ভূমিকা

বগুড়া আইনজীবী সমিতির সদস্য আব্দুল জব্বার ১৯৭০ সালে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। বাঙালির অধিকার আদায় এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি ছিলেন আপোসহীন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজের এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান করা, সংগঠিত করা এবং তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করাকে নিজের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে আব্দুল জব্বার হানাদার বাহিনীর প্রধান শত্রু ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ মে হানাদার বাহিনী আব্দুল জব্বারকে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।[১৯] মুক্তিযুদ্ধে আরো যে সকল আইনজীবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন—এডভোকেট সুরেশ দাসগুপ্ত, এডভোকেট নবাব আলী, এডভোকেট খন্দকার নুরুল হুদা, এডভোকেট তাহের উদ্দিন আহমদ, এডভোকেট নবির উদ্দিন তালুকদার প্রমুখ।

রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা

বগুড়া জেলা বহু পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী সকল আন্দোলন-সংগ্রামে বগুড়ার রাজনৈতিক দল তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মূলত রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দই বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের মূল পরিকল্পনাকারী ও পরিচালনাকারী।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)। অপরদিকে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীও বগুড়ায় বিশেষত পশ্চিম বগুড়ায় প্রভাবশালী ছিল। বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আওয়াম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, এ.কে মুজিবুর রহমান, মাহমুদুল হাসান খান, ডাঃ জাহেদুর রহমান, আকবর আলী খান চৌধুরী, মজিবুর রহমান আক্কেলপুরী, কবিরাজ শেখ আব্দুল আজিজ, আমানুল্লাহ খান, হাশেম আলী খান জাহেদী, হাসেন আলী সরকার, ড. মফিজ চৌধুরী, জাবেদুর রহমান, কছিম উদ্দিন আহম্মেদ, গোলাম মুর্তজা চৌধুরী, কাফেজ উদ্দিন আহমদ, মাহতাব উদ্দিন মন্ডল, মোজাফফর হোসেন, ডাঃ গোলাম সারওয়ার, সিরাজুল ইসলাম সুরুজ, মোস্তাফিজার রহমান পটল, সৈয়দ নুরুল হুদা, মন্তেজার রহমান মন্ডল, চিত্ত রঞ্জন সরকার, আজহর আলী মন্ডল, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, আবু খাদেন খান প্রমুখ।[২০] এই নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি বগুড়ায় বরাবরই শক্তিশালী ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় কমিউনিস্ট নেতারা ন্যাপে যোগ দিয়ে পার্টির কাজ করতেন। ন্যাপ কমিউনিস্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মোশাররফ হোসেন মন্ডল, গাজীউল হক, শেখ হারুনার রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, সাদেক আলী আহম্মদ, মকলেছুর রহমান, মীর ইকবাল হোসেন, দুর্গাদাশ মুখার্জী, আব্দুল লতিফ, আব্দুর রাজ্জাক, গোলাম মোস্তফা খান, ডাঃ আব্দুল কাদের চৌধুরী, মীর শহীদ মন্ডল, হায়দার আলী প্রমুখ।

ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মমতাজ উদ্দিন, ফেরদৌস জামান মুকুল, আব্দুস সামাদ, খাদেমুল ইসলাম, নজিবুর রহমান, রেজাউল বাকী, গোলাম জাকারিয়া খান রেজা, আব্দুর রাজ্জাক মিল্লাত, শোকরানা, তোফাজ্জল হোসেন, আমিনুল ইসলাম পিন্টু, মাসুদ, আফতাব রেহানা, মুন্নী, বদিউলি, নজরুল, সামছুল আলম প্রমুখ।[২১]

প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা

অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধকালীন সময়ে বগুড়ায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আর্মি, পুলিশ এবং ইপিআরের অনেক সদস্য পাকিস্তানি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাকবাহিনীকে নিধন করতে পূর্বাহ্নেই যে প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ৭১ এসে তারা সেই ধর্মকে পুরোপুরি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব নিজামুল হক ২৫ মার্চ রাত্রে রংপুর থেকে আগত পাকবাহিনীর

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকবাহিনী এগিয়ে আসার সংবাদ পাবার সাথে সাথে তিনি বগুড়ার রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত শহরের মানুষকে মাইকিং এর মাধ্যমে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে। রাতের মধ্যেই সব এলাকায় ব্যারিকেডের মাধ্যমে পাক বাহিনীর অগ্রাভিযান রুখে দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে আরো ছিলেন ডি.আই.বি ইন্সপেক্টর শাহ্ মকবুল হোসেন, আর আই হাতেম আলী খান, সাব ইন্সপেক্টর দলিলুর রহমান, সাব ইন্সপেক্টর রহিম উদ্দিন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্টাফ অফিসার লুৎফর রহমান প্রমুখ।[২২]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই বগুড়ার মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। সেজন্য বিভিন্ন স্কুল/কলেজে সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সেনা সদস্য যারা ছুটিতে এসেছিলেন তারা এই সকল ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দিতেন। বগুড়া সেন্ট্রাল স্কুল মাঠে প্রশিক্ষণ দিতেন প্রাক্তন সৈনিক দবির উদ্দিন, করোনেশন স্কুলে প্রশিক্ষণ দিতেন হাবিলদার এ.কে.এম সামছুল হক।[২৩] জয়পুরহাট কলেজ কেন্দ্রের প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন প্রাক্তন সৈনিক শাকিল আহমেদ। তাঁকে সহযোগিতা করেন অস্ত্রে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক আজিজুল বারী, আব্দুল কাদের এবং আব্দুল ওয়াদুদ।[২৪] শেরপুর ডি.জে হাইস্কুল কেন্দ্রে ট্রেনিং দেন হাবিলদার আব্দুল হালিম। এছাড়াও কিছু কিছু এলাকায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নেতৃত্বে যুবক ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে গিয়েছেন। সোনাতলা থানার শাহানবান্দা গ্রামের সুবেদার মইজার রহমান এরকম একজন সেনা সদস্য যিনি যুদ্ধের প্রাক্কালে ছুটিতে এসে আর চাকরিতে যোগদান করেন নাই। আশপাশের বিভিন্ন এলাকার তরুণ ছেলেরা সুবেদার মইজার রহমানের কাছে গিয়ে তাঁর নেতৃত্বে ভারতে ট্রেনিং নিতে যাবার ব্যাপারে অনুরোধ করেন। অতঃপর এপ্রিল মাসেই ৫০ জন যুবকের একটি দল নিয়ে সুবেদার মইজার রহমান ট্রেনিং নিতে ভারতে চলে গেলেন।[২৫] পরবর্তীতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

নঁওগায় অবস্থিত ই.পি.আর বাহিনীর ৭নং উইং-এর কমান্ডার মেজর নাজমুল হক এবং সহকারী উইং কমান্ডার ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মেজর নাজমুল হক ২৮ মার্চ তারিখে ইপিআর বাহিনীর একটি কোম্পানির সঙ্গে বেশ কিছু আনসার মুজাহিদ ও ছাত্র দিয়ে ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে বগুড়া আক্রমণে পাঠান। ক্যাপ্টেন গিয়াস তার বাহিনী নিয়ে বগুড়া পুলিশ লাইনে পৌঁছান। ইপিআর বাহিনীর আগমনের ফলে পুলিশ লাইনে অবস্থানরত রিজার্ভ পুলিশ ইন্সপেক্টরসহ প্রায় দুইশত পুলিশের মনোবল দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাঁরা বগুড়ায় পাকবাহিনীর অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে ক্যাপ্টেন গিয়াসকে অবহিত করেন। ক্যাপ্টেন গিয়াস সেই মতো তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

"বগুড়াতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ব্যাটারির ৬০ জনের মতো সৈন্য এবং 'এ্যামুনিশন-পাম্প' রক্ষার জন্যে একজন ক্যাপ্টেনসহ ২৫ জনের মতো সৈন্যও অবস্থান করছিল। পথে প্রতিবন্ধকতার জন্যে রংপুর থেকে পাকসেনারা কোনো সাহায্য পাচ্ছিলো না। পাকবাহিনী মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে জোর করে শাক, সবজি, গরু, মুরগি আদায় করে সন্ধ্যার পূর্বেই বগুড়া শহরে ফিরতো। ক্যাপ্টেন গিয়াস সিদ্ধান্ত নিলেন পাকবাহিনী গ্রাম থেকে ফেরার পথে তাদেরকে এ্যামবুশ করবেন। পরিকল্পনানুযায়ী ২৯/৩০ মার্চ রাতে ইপিআর পুলিশ, মুজাহিদ এবং ছাত্র সম্বলিত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল 'এ্যাম্বুশ' করে বসে থাকেন। ঐ তারিখ রাতে পাকসেনারা ফেরার পথে মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যাম্বুশে পড়ে যায়। অকস্মাৎ আক্রমণে পাকবাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই আক্রমণে ২৩ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩টি গাড়ি ধ্বংস হয়। এখান থেকে গাড়ি ওয়ারলেসসহ বেশ কিছু অস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রংপুরের দিকে পালিয়ে যায়।"[২৬] ২৫ মার্চ রাত থেকে এপ্রিলের ২২ তারিখে পতনের পূর্ব পর্যন্ত বগুড়ার সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।

চিকিৎসকদের ভূমিকা

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং আন্তরিক। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার অপরাধে বগুড়ায় পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে যারা শহীদ হন তারা হলেন ডাঃ কাছির উদ্দিন তালুকদার এবং বগুড়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডা. আবুল কাসেম ছিলেন। দেশপ্রেমকে ঈমানের অঙ্গ মনে করে তিনি মার্চের উত্তাল অসহযোগের দিনগুলোতে স্বাধীনতার স্ব-পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। চিকিৎসকের কর্তব্যবোধ থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এ সকল অপরাধে পাকবাহিনী মে মাসের ২৯ তারিখে ডা. কছির উদ্দিন তালুকদারকে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে ধরে নিয়ে গিয়ে মাঝিড়ার একটি পরিত্যক্ত কবরে ফেলে গুলি করে হত্যা করে।[২৭]

সোনাতলা থানার রানীর পাড়া গ্রামের ডাক্তার মাহবুবুর রহমান চান্দু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুন মাসের প্রথম থেকেই ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেওয়া শুরু করে। বগুড়ার সোনাতলা সারিয়াকান্দি এলাকায়ও এসময় থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন অপারেশন শুরু করে। চকচকে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া এবং সুখানপুকুরে

Dhaka University Institutional Repository

একটা ট্রেন ধ্বংস করার পর ঐ পুরো এলাকাটা আর্মিদের চোখে পড়ে যায়। তারা ধারণা করে আশেপাশে কোথাও মুক্তিযোদ্ধারা আত্মগোপন করে আছে। ফলে তারা প্রতিদিনই ভেলুরপাড়া ও সুখানপুকুরের আশেপাশের এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে অত্যাচার চালাতো। L.M.F ডাক্তার মাহবুবুর রহমান চান্দু আর্মির আক্রমণে আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং গ্রামের সাধারণ মানুষদের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা দিতেন। তার কাছে যা ঔষুধ ও পথ্য ছিল তা দিয়ে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। আগেকার দিনের L.M.F ডাক্তাররা সার্জিক্যালে মোটামুটি পারদর্শী ছিলেন। একদিন আর্মিরা ডাক্তার সাহেবকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে এবং তাঁর নিজের হাতে কবর খুড়িয়ে কবরের ভিতর ফেলে দেন। এমন সময় একজন বালুচ পাক আর্মি তাঁকে বলেন যে, তুমি তো ডাক্তার আমার এই জায়গাটা কেটে গেছে একটু দেখে দাও এই বলে তাকে কবর থেকে টেনে তুললো। ডাক্তার সাহেব তার সেবা করলে দয়াপরবশ হয়ে পাক আর্মিটি তাঁকে ছেড়ে দেন। বেঁচে যাওয়ার পরও রাতের বেলা মুক্তিযোদ্ধারা ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে গিয়েছে এবং ডাক্তার সাহেব ও যথারীতি তাদেরকে সেবা দিয়েছেন। ঐ এলাকায় আর্মিরা বিভিন্ন স্থানে টহল দেওয়া শুরু করলে ডাক্তার সাহেব নৌকায় করে চাল, ডাল, মুড়ি এসব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তাদের আস্তানায় পাঠিয়ে দিতেন। এ সময় যখনই কোনো মুক্তিযোদ্ধার অসুখ বিসুখের কথা/খবর শুনতেন তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর সেবা করতেন।[২৮] বগুড়ার বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ হেদায়াতুল ইসলাম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সময় চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা দুলাল ছররা গুলিতে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তিনি চিকিৎসা করেন।[২৯]

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন ডাঃ জাহিদুর রহমান। তিনিই চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়াকালীন সময়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। পরবর্তীতে বগুড়ায় এসেও তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৭০-এর নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তিনি গভীরভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।[৩০] মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালনকারী উল্লেখযোগ্য চিকিৎসকরা হলেন, ডাঃ মোজাফফর রহমান, ডাঃ মোঃ ইয়াসিন, ডাঃ আব্দুল করিম, ডাঃ নুরুল হক, ডাঃ সজল দেওয়ান, ডাঃ মনীন্দ্র কুমার গোস্বামী, ডাঃ ননী গোপাল দেবদাস, ডাঃ আব্দুর রশিদ, ডাঃ সি.এম ইদ্রিস, ডাঃ রফিকুল আলম, ডাঃ গোলাম সারওয়ার, ডাঃ সামসুল আরেফিন তারা, ডাঃ টি আহম্মদ, ডাঃ আব্দুর রউফ, ডাঃ মকবুল হোসেন, ডাঃ বরুন রায় প্রমুখ।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ভূমিকা

জননী, জায়া, ভগ্নী—একজন নারীর পরিচয় যাই হোক-না-কেন সকল সংকটময় মুহূর্তে নারীই পুরুষের সবচেয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী ছিল জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৪ লাখ নারী ছিল মুক্তিযাদ্ধা। কোনো নারী রাজাকার ছিল না। রাজাকারের কোনো কাজকে তারা সমর্থন করে নি। নারীরা কখনও আত্মসমর্পণ করে নি রাজাকার বা পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে।'[৩২] মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা তাঁর অবস্থান এবং পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রকম ছিল। অধিকাংশক্ষেত্রেই নারী ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাত্রী এবং অন্নদাত্রীর ভূমিকায়। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল সেখানে তাদের থাকা-খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা যেখানেই গিয়েছে নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দেখাশোনা করেছে এবং রান্না করে খাইয়েছে। এই কাজ তারা কোনো স্বার্থ কিংবা বিনিময়ের আশায় করে নি। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নারীরা দায়িত্ব পালন করেছে।

নারীর এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা খুব সহজেই যে কোনো বাড়িকেই নিজের বাড়ি ভাবতে পারতেন, যে কোনো মাকে নিজের মা মনে করতে পারতেন। যে কোনো বোনকে নিজের বোন ভাবতে পারতেন। সেই সময়ে মুক্তির আবেগটা এতই প্রবল ছিল যে, নিজের সর্বশেষ সম্বল ডিম পাড়া দুটো মুরগি জবাই করে তাদের ঘরে সাময়িক আশ্রয় নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়ে পরম তৃপ্তি পেয়েছেন অনেক গরিব মা। লুকিয়ে খাবার রান্না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটু দূরে ঘাঁটি গেড়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার বয়ে নিয়ে গেছেন অনেক বোন। মর্টারের গুলি আসছে আর মাথা নিচু করে সানকিতে রুটি এবং পানতা ভাত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন অনেক কম বয়সী নারী। পাশাপাশি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা দেয়ার জন্য হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করে রেখেছে উজ্জ্বল।[৩৩] বগুড়ায় নারীরা বহু পূর্ব থেকেই সচেতনভাবে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলন সংগ্রামেই তারা ছেলেদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় নারী অস্ত্র হাতে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও বগুড়া জেলায় সে রকম কোনো নারীর সন্ধান পাওয়া যায় নি যিনি অস্ত্র হাতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বগুড়া জেলার নারীরা সংঘবদ্ধভাবে কিংবা একাকী পরিপ্রেক্ষিত ও সময় অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলো হলো :

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়ানো।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রদান করা এবং লুকিয়ে রাখা।

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খবরা-খবর সংগ্রহ করে দেয়া।

ঘ. সেবা প্রদান করা এবং

ঙ. শরণার্থী ক্যাম্পে সাহয্য সহযোগিতা করা।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর এই সকল ভূমিকাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—আমরা যে সকল এলাকায় যুদ্ধ করেছি সেখানে নারীর সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা না থাকলেও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল অপরিসীম। 'আমাদেরকে আশ্রয় দেয়া, খাওয়ানো এগুলোর মূল্য তো কম না। আমি কোথায়—আমার পায়ের নিচে যদি মাটিই না থাকে শেকড়ই না থাকে, আমি যদি দাঁড়াতেই না পারি আমি যুদ্ধ করব কি দিয়ে? সেই জায়গাগুলো তো নারীরাই করে দিয়েছে যারা ট্রেনিং নেয় নি অথচ যুদ্ধে আমাদেরকে সরাসরি সহযোগিতা করেছে। এটা নারীদের জন্য খুবই বিপদজনক কাজ ছিল—আমরা তো লুকিয়ে আছি আর তারা প্রকাশ্যে আর্মিদের কাছে, রাজাকারদের কাছে যাচ্ছে সংসার করছে আবার আমাদের লুকিয়ে রাখছে। অগণিত নারী নির্যাতিত হয়েছে—পাকবাহিনী যেখানেই গিয়েছে নারী সেখানেই নির্যাতিত হয়েছে তথাপিও নারী তাঁর সর্বস্ব দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতে পিছপা হয় নি।'[৩৪]

একজন নারী যদি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়াটাকে বিপদজনক মনে করতো কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সম্পর্কে রাজাকারদের তথ্য দিত তাহলে এত সহজে ৯ মাসেই বিজয় অর্জন সম্ভব হতো না। গাবতলী-সারিয়াকান্দি এলাকার অনেক নারীই বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে রাজাকারদের সাথে গল্প করতো এবং তাদের গতিবিধির সমস্ত খবরা-খবর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট সরবরাহ করতো।'[৩৫] ৭১ সালে ৮/৯ বছরের বালিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শাহীনা খাতুন শাহীন মুক্তিযুদ্ধের সময় কাহালু থানার মাগুড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জাহাঙ্গীর হোসেনের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে রাজাকার এবং পাক-আর্মির বিভিন্ন খবরা-খবর সংগ্রহ করে দিত। পাকবাহিনীর অবস্থান, ট্রেনিং, গতিবিধি এবং অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে এ সকল তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ৮/৯ বছরের ছোট্ট মেয়েটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে যেমন লাউ, মুরগি, মুড়ি এসব দেয়ার নাম করে গামছা গায়ে হাফপ্যান্ট পরে রাজাকার ক্যাম্পে যেত এবং খবরা-খবর সংগ্রহ করে আনত।[৩৬]

পাকিস্তানি বাহিনী বগুড়ায় প্রবেশ করার পর এপ্রিল মাসের শেষের দিকে জয়পুরহাট থেকে ৬১ জন লোক মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেয়ার জন্য হিলি সীমান্ত এলাকা সংলগ্ন কামার পাড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। এই দলে চার পাঁচশ মহিলা ছিল। এই মহিলারা কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এসকল খবরা-খবর সংগ্রহ করে দিত। কামারপাড়া ক্যাম্পে যাওয়ার রাস্তা চিনিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তারা গাইড হিসেবে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করত। মহিলাদের বয়স ছিল ২০-৩০ এর মধ্যে। এদের সকলের নাম পরিচয় সংগ্রহ করা যায় নি তবে একজন মহিলার নাম মোমেনা ছিল বলে ঐ গ্রুপের একজন মুক্তিযোদ্ধা জানান। মোমেনার বড় ভাইয়ে নাম ছিল মজিবুর রহমান চিশতী। মোমেনা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।[৩৭] মহিলারা নিজের খাবার মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে তুলে দিয়েছে। নিজের শোবার ঘর, বিছানা-বালিশ মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে নিজে বারান্দা কিংবা একটা ছোট্ট ঘরে সন্তান-সন্ততিসহ বসবাস করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নারীর এই মমত্বকে কোনোকিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। আদমদীঘি থানার নশরৎপুর ইউনিয়নের বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা পার্শ্ববর্তী নওগা জেলার থলবড়বড়িয়া গ্রামে অবস্থানকালে পাকবাহিনী ও রাজাকার কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অতঃপর সেখানে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়। ঘটনাস্থলেই ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। কিছু মুক্তিযোদ্ধা কচুরিপানা ভর্তি জলাশয়ে নেমে আত্মরক্ষা করে। তিনজন মুক্তিযোদ্ধা গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চাইলে ঐ বাড়ির মহিলারা নিজেদের জীবন বাজী রেখে তাদেরকে ধান রাখার চাড়ির ভিতর লুকিয়ে রাখে। আর্মি এবং রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। ফলে গফুর, আহম্মদএবং মিজান নামের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ডা. আহম্মদ সাহেবের এম.এ পাশ মেয়ে, যার নাম জানা যায় নি।[৩৮]

বগুড়ার মেয়ে ফেরদৌস পারভীন ডলি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তার বড় তিন ভাই মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়। নিদারুণ ভয়ে ভীত হয়ে ডলিকে সঙ্গে করে তাঁর বাবা-মা বগুড়ায় নিজ বাড়িতে চলে আসে। এখানেও পাকসেনারা আক্রমণ করলে বাবার সাথে ডলিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর মায়ের হাত ধরে ডলি আসামের গোয়ালা পাড়ায় আশ্রয় নেয়। সেখানে শরণার্থী শিবিরের অসহায় শিশুদের দুরবস্থা দেখে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। এরপর একে একে রণাঙ্গনে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা থেকে শুরু করে কিশোর তরুণদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ট্রেনিং কেন্দ্রে পাঠানো, শরণার্থী শিবিরের ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করাসহ বহুবিধ কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়।[৩৯] ফেরদৌস পারভীন ডলির এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের কিছু অংশ ছিল এরকম :

> 'শরণার্থী শিবিরে একদিন ডলি মায়ের পাশে বসেছিল খাবারের অপেক্ষায়। হঠাৎ নজরে পড়লো একজন সেচ্ছাসেবক হাজার হাজার শিশুর লাইনে দুধ বন্টন করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছেন।' এ দৃশ্য দেখে ছুটে আসে ডলি। সেচ্ছাসেবকের হাতে হাত মিলিয়ে দুধ খাবার পরিবেশন করে। ভিন দেশে বাবা মা হারা শিশুর দল অসীম স্নেহকাতরতায় জড়িয়ে ধরে ডলিকে। ডলি এখন

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরী নয়। তাদের মা বোন। সবার প্রিয় ডলি আপা। শুধু খাবার পরিবেশনকারিনী হিসেবেই ডলি আবদ্ধ রইল না। ডাক পড়লো রণাঙ্গণে। ঘন বর্ষায় হাঁটু কাদা ঠেলে কাঁটা ঝোপ পেরিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের মাতৃস্নেহে সুস্থ করে তুলেছে সে। শরণার্থী শিবির আর মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ট্রেনিং সেন্টারে ছুটে গিয়েছে ডলি। মাত্র ১০ পনের দিনের মধ্যে এস.এল.আর রাইফেল, শর্ট গান, এস.এম.জি ব্যবহারে নিপুণ দক্ষতা লাভ করে। কিন্তু রণাঙ্গনে তাঁকে অস্ত্র ব্যবহার করতে মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা দেয় নি। মেয়েদের শিবিরে অনাথ ছেলেমেয়েদের শিবিরে সদাহাস্যময়ীর পদশব্দ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো অসংখ্য গৃহহারা, স্বজনহারা মানুষ। কারণ এই মেয়েটি না হলে শরণার্থীদের রেশন আনতে উনিশ-বিশ হতে পারে। অসুস্থ রোগীকে পথ্য খাওয়াতে দেরি হতে পারে। পায়ে মর্টারের গোলা পড়া পঙ্গু বৃদ্ধের প্রতি বেখেয়ালবশত অবহেলা হতে পারে। তাছাড়া প্রতিদিন শত শত কিশোর-তরুণ অপেক্ষা করে থাকে ডলি আপার জন্য। কারণ ডলি আপা সঙ্গে থাকলে ট্রেনিং এর ব্যবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কর্তাব্যক্তিরা অবসরের মাত্রাটা বাড়াতে পারবেন না। ডলির উপর দায়িত্ব ছিল এই সব নতুন নতুন কিশোর-তরুণদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ট্রেনিং কেন্দ্রে পাঠানো। তাছাড়া বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগের মিলিত কমিটির সদস্যা হিসেবে সমগ্র শিবিরের ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করার ভারও ডলিকে বহন করতে হতো।"

এতসব পরিশ্রমের বোঝা সইতে পারে নি কিশোরী শরীর। তাই যুদ্ধের পর অসুস্থ হয়ে ডলিকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক দলের অকুতোভয় নেতৃত্ব স্মরণযোগ্য। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আঞ্চলিক নেতৃত্বের যৌথ-সম্মিলনে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির আন্দোলন বেগবান হয়। বাঁধভাঙা স্রোতের টানে স্বাধীনতা বিরোধীদের সকল অপকর্ম ও অপকৌশল ভেসে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র, জনতা, পেশাজীবী সম্প্রদায়ের পাশে যুক্ত হয় বাঙালি নারীদের জীবনত্যাগী দুর্বার নেতৃত্ব দেন। জীবনের মায়া ত্যাগ করে সর্বপ্লাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন দেশ-জাতিই তাদের একমাত্র স্বপ্নের ঠিকানায় রূপ লাভ করে। দেশের অন্যান্য স্থানের মতোই বগুড়ার সর্বস্তরের জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে। এখানে উল্লেখের দাবি রাখে যে, স্বাধীনতা-পূর্বকালে অবিভক্ত পাকিস্তানে বগুড়ায় শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল বিধায় এই শিল্পের বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল। বিভিন্ন মিল-কারখানার শ্রমিকরা স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিষয়কে এবং অবাঙালি বিহারি মিল-কারখানার মালিকদের নির্যাতনকে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণকারী শ্রমিকসহ সর্বস্তরের ঘটনা প্রচারের জন্য বগুড়ার সাংবাদিকগণ ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে অর্থসহ অন্যান্য সহযোগিতা করে সাধারণ জনগণ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল বলেই বগুড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা খুব সহজে না-হলেও আনুকূল্যের মধ্য দিয়েই বগুড়া মুক্ত রাখতে পেরেছিল ১ মাস। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। আইনজীবীগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য লড়াই করে গেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সমন্বয়ে গঠিত একাধিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কুশলী প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ করে বগুড়ার সর্বস্তরের মানুষের ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। এই যুদ্ধে ও ভালবাসায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নামও স্মরণযোগ্য। কারণ চাকুরিজনিত সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা নিজস্ব উদ্যোগে কঠোর ত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে হানাদার মুক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে আহত, রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে জীবন বাজি রেখে চিকিৎসার মাধ্যমে জীবন দান করেছেন বগুড়ার চিকিৎসকগণ। তাদের নিষ্ঠা, সততা, একাগ্রতা পরবর্তী প্রজন্ম স্মরণ করবে শ্রদ্ধা ভরে। বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। জীবন, যৌবন, ইজ্জত, সম্ভ্রম বাজি রেখে বগুড়ার সর্বস্তরের নারীগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বীরাঙ্গনার ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়েছেন—একথা অনস্বীকার্য।

সর্বোপরি, সর্বস্তরের জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বগুড়া হানাদার মুক্ত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়াবাসীর অংশগ্রহণ ছিল প্রাণের দাবির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেই দাবি স্বাধীনতা ও একটি পতাকা। সেই সাফল্য বগুড়ার সর্বস্তরের পেশাজীবী, নারী, রাজনৈতিক দল, শ্রমিকসহ সকলের।

তথ্যসূত্র

১. সাক্ষাৎকার, কমরেড অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, জজকোর্ট বগুড়া। মুক্তিযুদ্ধকালীন জেলা সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া, শ্রমিক সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ও পরবর্তীকালে দেশের কল্যাণে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক কাজ করেন। বর্তমানে বগুড়া শহরের সুলতান পাড়ায় স্নিগ্ধা আবাসিক এলাকায় বসবাস করেন। ১৬ আগস্ট ২০০৮।

২. ঐ।

৩. সাক্ষাৎকার, আব্দুস সাত্তার তারা, শ্রমিক নেতা, বগুড়া কটন মিল, ১৯৭১ সালে কটন স্পিনিং মিলে চাকরি করতেন, বগুড়া জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৮-৭৪), বর্তমানে নারুলি পশ্চিমপাড়া, চেলপাড়া, বগুড়ায় বাস করেন। ১৬ আগস্ট ২০০৮।

৪. আবুল কাশেম (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট, ১৯৯৯, পৃ. ২০।

৫. সাক্ষাৎকার, একরামুল হক, ১ মে ২০০৮।

৬. এ.জে.এম সামুছউদ্দিন তরফদার, *দুই শতাব্দীর বুকে বগুড়ার ইতিহাস*, প্রজাবাহিনী প্রেস, ১৯৭৬, পৃ. ১৫০।

৭. সাক্ষাৎকার, আঃ সাত্তার তারা, ১৬ আগস্ট ২০০৮।

৮. জাহেদুর রহমান বাদু, বগুড়া প্রেসক্লাব বার্ষিকী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯. সাক্ষাৎকার, জাহেদুর রহমান যাদু, ২৭ জুন ২০০৮।
১০. সাক্ষাৎকার, আমিনুল হক বাবুল, ১ মে ২০০৮।
১১. সাক্ষাৎকার, এনামুল হক তপন, ১ এপ্রিল ২০০৬।
১২. সাক্ষাৎকার, রেজাউল করিম মন্টু, ৫ এপ্রিল ২০০৬।
১৩. সাক্ষাৎকার, আব্দুল হামিদ, ৫ মে ২০০৮।
১৪. সাক্ষাৎকার, হোসেন আলী, ৪ মে ২০০৮।
১৫. সাক্ষাৎকার, শফিকুল আলম, ৫ মে ২০০৮।
১৬. মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
১৭. *দৈনিক করতোয়া*, ২৬ মার্চ, ১৯৯৮।
১৮. আবু মোঃ সেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী*, ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ১৯৯৮, পৃ. ১৯-২০।
১৯. এ.কে মুজিবুর রহমান, *রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা* (তৃতীয় সংস্করণ), প্রকাশক মিসেস মিনু রহমান, ১৯৯৫, পৃ. ৪৬-৪৭।
২০. ঐ।
২১. সাক্ষাৎকার, মিসবাহুল মিল্লাত নান্না, ৭ মে ২০০৮।
২২. সাক্ষাৎকার, মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেল, ২১ জুন ২০০৮।
২৩. মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
২৪. সাক্ষাৎকার, রেজাউল করিম মন্টু, ৫ এপ্রিল ২০০৬।
২৫. সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯ পৃ. ২৬২-২৬৩।
২৬. *স্মৃতি : ১৯৭১*, সম্পাদনা রশীদ হায়দার, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ১৭১-১৭২।
২৭. সাক্ষাৎকার, সমুদ্র হক ৬ মে ০৮।
২৮. সাক্ষাৎকার, মাসুদ হোসেন আলমগীর নোবেল, ২১ জুন ২০০৮।
২৯. সাক্ষাৎকার, ডা. জাহেদুর রহমান, ২৭ জুন ২০০৮।
৩০. রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৩১. মালেকা বেগম : মুক্তিযোদ্ধা প্রেক্ষিত নারী, *দৈনিক করতোয়া*, ২৫ মার্চ ২০০৫।
৩২. আতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, ফাল্গুন ১৪০৯, পৃ. ২৮।
৩৩. সাক্ষাৎকার, গোলাম জাকারিয়া খান রেজা, ৫ মে ০৮।
৩৪. সাক্ষাৎকার, মোঃ তহসিন আলী, ৩ মে ০৮।
৩৫. সাক্ষাৎকার, শাহীনা আক্তার শাহীন, ১ এপ্রিল ০৬।
৩৬. সাক্ষাৎকার, আজিজুল বারী ১ মে ০৮।
৩৭. সাক্ষাৎকার, আবুল কাশেম ৩ মে ০৮, সুনীল চন্দ্র প্রামাণিক ২ মে ০৮।
৩৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৭৮ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর চরম আক্রোশ ও আগ্রাসন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষার প্রতি চরম বৈরিতা পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণগোষ্ঠীকে তাদের প্রতি ক্রমশ ক্ষুব্ধ করে তোলে। সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষী জনগণ পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্তিলাভের যে পথ খুঁজতে থাকে সেই দীর্ঘ পথপরিক্রমার সমাপ্তি ঘটে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে যারা মেনে নিতে পারে নি, বাঙালির আজন্ম-লালিত আত্মমর্যাদার এই লড়াইয়ের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছে এবং এই মহৎ অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করার লক্ষে হত্যা, রক্তপাত, লুণ্ঠন, নির্যাতনসহ নারী ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থেকে পাকবাহিনীকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা প্রদানসহ নানাবিধ তথ্য সরবরাহ করেছে মূলত তারাই স্বাধীনতা বিরোধী। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ এদেশীয় দালালচক্র এবং মুসলিম লীগ, পিডিপি ও জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট করাই ছিল এই চক্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ষড়যন্ত্র ও বিরোধীতার নেপথ্যে কিছু কারণ নিহিত ছিল। সেই কারণগুলো যতটা না রাষ্ট্রিক তারচেয়ে বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় উন্মাদনায় সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার অভীপ্সা—মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা সর্বোপরি দেশপ্রেম তথা মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ এই দালাল চক্রের পাশবিক হৃদয়কে নাড়াতে পারে নি। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস, নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা এবং এদেশের নারী নির্যাতনের নেপথ্যে পৈশাচিকতা ও লোলুপতাই দায়ী। এই অপশক্তি এদেশের নারীদের গণিমাতের মাল হিসেবে উপঢৌকন দিয়েছে বর্বর পাকবাহিনীর কাছে। এই জঘন্য কাজে তাদের কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করে নি। সংঘবদ্ধভাবে তারা ধর্মের নামে চরম অধর্ম চালিয়েছে এদেশের অগণিত জনতার উপর।

বাংলাদেশের জেলাগুলোর মধ্যে বগুড়ার জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে প্রাথমিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছিল বলে এখানে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের নির্যাতনের মাত্রাটা ছিল ভয়াবহ। বগুড়ায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সরাসরি পাকবাহিনীর হয়ে দালালী করেছে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব। নেতৃবৃন্দের নির্দেশ ও প্ররোচনায় স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতায় পাকবাহিনীর প্রধানতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে স্থানীয় দালাল,

Dhaka University Institutional Repository

রাজাকার, আলবদর এবং আলশামস। বগুড়া জেলার বিভিন্ন থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক যারা নিজ নিজ এলাকায় প্রভাবশালী ছিল তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশে স্ব-স্ব এলাকায় রাজাকার সৃষ্টি করেছিল। এই হীন-স্বার্থচিন্তা সফল করার মানসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে লোভ দেখিয়ে তারা রাজাকার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সৃষ্ট রাজাকারদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। 'রাজাকার' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বেচ্ছা শ্রমের উদ্দেশে গঠিত রাজাকার বাহিনী মূলত আরবী শব্দ 'রেজা' ও ফার্সি শব্দ 'কার'-এর সামষ্টিক রূপ। এর অর্থ স্বেচ্ছায় যারা কাজ করে।[১] মানবিক, কল্যাণকর কাজেই মূলত স্বেচ্ছাশ্রম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগটা ছিল বিপরীত, বিধ্বংসী ও জঘন্যতম। একথা সত্য যে, বাংলাদেশের জন্মকে প্রতিরোধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা স্বেচ্ছায় 'রেজাকার' বাহিনীতে যোগ দেয়। 'রেজাকার' শব্দটি পরবর্তীকালে মানুষের মুখে মুখে 'রাজাকার'-এ পরিণত হয়। একাত্তরের ১০ এপ্রিল পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা ও বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য শান্তি কমিটি গঠন করেন। খাজা খয়ের উদ্দিন এই কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। গোলাম আযম, দুদু মিয়া, এস.এম সোলায়মানসহ ১৪০ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সারাদেশেই শান্তি কমিটির শাখা কমিটি গঠন করা হয়। অপরপক্ষে আলবদর বাহিনীর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয় তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্যরা। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অধিকতর সুবিধা লাভের জন্য সারাদেশের ইসলামী ছাত্রসংঘের শাখা গুলিকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়। পাশাপাশি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বিহারী ও অবাঙালিদের নিয়ে তথাকথিত ইসলামপন্থীদের উদ্যোগে আলশামস সশস্ত্র গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠে। পাকিস্তান রক্ষার নামে বাঙালিদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্যই মূলত এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছিল।[২] অস্ত্র এবং রসদ পেয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা এবং সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য কাজ করতে থাকে। দেশব্যাপী চালাতে থাকে ভয়াবহ নির্যাতন। সমগ্র বগুড়া জেলায় স্বাধীনতা বিরোধীরা যে অপ-তৎপরতা চালিয়েছিলো সে কর্মকাণ্ডে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, ডাক্তার, রাজনীতিবিদসহ সর্বস্তরের জনগণ শারীরিক, আর্থিক, মানসিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বস্তরের মুক্তিকামী জনসাধারণের উপর স্বাধীনতা বিরোধীরা যে-নির্যাতন চালিয়েছিলো বগুড়া জেলার জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এবং পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে সে-নির্যতানের ভয়াবহতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যের আলোকে জানা যায়, বগুড়া জেলার স্বাধীনতা বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন আব্বাস আলী খান ও আব্দুল আলীম। '৭১ সালে আব্বাস আলী খান পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সহকারী প্রধান ছিলেন। তার ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাঙালি জাতিসত্তা বিরোধী। আব্বাস আলী খান ও আব্দুল আলীম শুধু বগুড়াতেই নয়, সারা বাংলার স্বাধীনতা বিরোধীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আব্দুল আলীম ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা এবং জয়পুরহাট মহকুমা মুসলিম লীগ কমিটির সভাপতি। এই দুই শীর্ষস্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীর সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার পেছনে এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও গভীর চক্রান্ত নিহিত।[৩] মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী চেতনার বীজ তাদের মধ্যে পূর্বেই প্রোথিত হয়েছিল।

ভাষা-আন্দোলনের বিরোধীতার মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সহিংসতায় তার বিকাশ ঘটে। গবেষকগণ মনে করেন, এই দুই ব্যক্তি শুধু মুক্তিযুদ্ধই নয়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়েও বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তার বিরোধী ছিল। এরা যৌথভাবে ভাষা আন্দোলনকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বদৌলতে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করত। এ সম্পর্কে ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে : '৫২ সালে জয়পুরহাট মহকুমা ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতা ও কর্মীরা প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা আব্বাস আলী খান ও আব্দুল আলীমের বিরোধীতায় জয়পুরহাটে ভাষা আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নিতে পারেন নি। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে এখানকার নেতা ও কর্মীরা গোপনে কাজ করেছেন।'[৪] চিহ্নিত অপশক্তি শুধু ভাষা-আন্দোলনে বিরোধীতা করেই ক্ষান্ত হয় নি, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তাই তো ঘটনা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নিপীড়িত বাঙালিরা দলে দলে ভারতে আশ্রয় নেয়। স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নেওয়াকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় ওঠে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংখ্যালঘুদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাদের দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান। দেশত্যাগী মানুষের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন জয়পুরহাট মহকুমা পীস কমিটির সভাপতি ও মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল আলীম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেন : 'ওদের ক্ষমা নেই, ওরা দেশে ফিরলেই ওদের সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হবে।'[৫] আব্দুল আলীম সেই সময় সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পাকবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েই স্বস্তি পান নি। উপরন্তু নিজের হাতে বাঙালিদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলিতে হত্যা করাসহ বেয়নেট চার্জ করে পাশবিক নির্মমতায় বহু বাঙালিকে মারার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য যে, জয়পুরহাটের প্রখ্যাত হোমিও

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসক ডা. আবুল কাশেমকে ২৪ জুলাই দিবাগত রাতে আব্দুল আলীমের নির্দেশে একজন পাকিস্তানি সুবেদার, কিছু বিহারি রাজাকার ও বাঙালি রাজাকার মিলে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখের দাবী রাখে যে, ইতিপূর্বে এপ্রিলের ২০ তারিখে ডা. আবুল কাশেম পরিবার পরিজনসহ পার্শ্ববর্তী জামালপুরে তাঁর ছোট মেয়ে-জামাই বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং ৩ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। আব্দুল আলীমের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জুলাই মাসে জয়পুরহাটে ফেরত আসেন। যেদিন ফেরত আসেন ঐ দিনই তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ডা. আবুল কাশেমকে ধরতে আসা রাজাকার ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান ডা. আবুল কাশেমের ছেলেকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, ডা. সাহেবকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি যদি দ্রুত আব্দুল আলীমের শরণাপন্ন হন তাহলে হয়ত-বা মুক্তি পেতে পারেন তার বাবা। ডা. আবুল কাশেমের ছেলে, ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য আব্দুল আলীমের নিকট গেলে সে তাঁকে ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস প্রদান করে। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে না দিলে পরিবারের লোকজন আব্বাস আলী খানের নিকট যায়। আব্বাস আলী খান এক্ষেত্রে আব্দুল আলীমের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন : 'তোমরা যাকে ধরেছ, নাম বললেও কোনো অসুবিধা নেই, সেই আব্দুল আলীম এখন তোমাদের নিকট এক কথা বলছে মেজর সাহেবের নিকট আর এক কথা বলছে। মনে হয় তোমার বাবাকে এরা ছাড়বে না।'[৬] অনুমান সত্য হিসেবে পরিগণিত হয়। একদিন একরাত আটকে রাখার পর কিসমত নামে এক লোকের হাতে কবর খনন করিয়ে ২৬ জুলাই মাগরিবের নামাজের আগে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ডা. আবুল কাশেমের মত একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক আব্দুল আলীমের ঘৃণ্য কূটকৌশলের কারণে পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। মালেক মন্ত্রী সভার শিক্ষামন্ত্রী এবং পাকবাহিনীর সহযোগী আব্বাস আলী খানের উপর্যুক্ত বক্তব্যে ডা. আবুল কাশেমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আব্দুল আলীমের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডা. আবুল কাশেমের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র ৮ম খণ্ডে গোলাম মোস্তফা মণ্ডলের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় : 'ডা. আবুল কাশেমকে জয়পুরহাট ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিম্নাংশ মাটির নিচে পুঁতে তাকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে। এছাড়া তার পায়ের গোড়ালির রগ ছিদ্র করে উল্টো করে রশি বেঁধে টাঙিয়ে রেখে গায়ের চামড়া কেটে লবণ লাগিয়ে দেয়। অতঃপর তাকে হাত পা পুটলি করে বেঁধে ট্রাকে ধপাস করে ফেলে এবং সেখান থেকে আবার নিচে ফেলে দেয় অতঃপর তার দুই চোখ উপড়ে ফেলে দেয় এবং সেখানে পেট্রোল মাখানো তুলো ঢুকিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে হত্যা করে।'[৭]

উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে এ-কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ডা. আবুল কাশেমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ও পরবর্তী কালের প্রকাশনার মধ্যে তত্ত্ব ও তথ্যের কিঞ্চিৎ

Dhaka University Institutional Repository

গরমিল লক্ষ্য করা যায়, এই গরমিল ইচ্ছাকৃত নয়। দুটি তথ্যের একটি পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যেটি স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে আর অপরটি শহীদ ডা. আবুল কাশেমের পুত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত। ফলে ডা. কাজী মোঃ নজরুল ইসলামের বক্তব্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময় একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জয়পুরহাটের এই মর্মান্তিক ঘটনার ব্যাপারে ডা. নজরুল ইসলামের বক্তব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম বাবুল এবং মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডা. আবুল কাশেম হত্যার নির্মমতার পাশাপাশি অত্র এলাকার আরেকটি পাশবিক হত্যাকাণ্ড উল্লেখের দাবী রাখে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো স্মরণ করে আজো জীবিত জনসাধারণ শিহরিত হয়ে ওঠেন। ছমির উদ্দিন মণ্ডল তেমনি এক হতভাগ্য ব্যক্তির নাম। বগুড়া জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী, ১৯৫২ সালে বগুড়ায় ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, জাতীয় কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং জয়পুরহাট চিনিকলের আখচাষী সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আক্কেলপুর নিবাসী জনাব ছমির উদ্দিন মণ্ডল ১৯৭১ সালের ৯ মে ট্রেনিং নেয়ার জন্য ১০/১২ জন সঙ্গীসহ ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে জয়পুরহাট থানার ভাতসা গ্রামে রাজাকার ডা. সৈয়দ আলীর বাড়িতে পানি খাওয়ার জন্য গেলে ডা. সৈয়দ আলী তার নিজ বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং পরের দিন পাকবাহিনীর হাতে সবাইকে তুলে দেয়। অতঃপর পাকবাহিনী সবাইকে আক্কেলপুর নিয়ে যায় এবং আক্কেলপুর থেকে ট্রেনে জয়পুরহাটে নিয়ে আসে। সেখানে পীস কমিটির সভাপতি আব্দুল আলীম এবং সেক্রেটারী আক্কেলপুর থানার সোনামুখী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমানের পরামর্শক্রমে বাগজানা রেল স্টেশনের পূর্ব পাশে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের পর ১৩ মে গুলি করে হত্যা করে। এখানে আরো নিহত হন আঃ রহমান মণ্ডল, আজিম, জলিল, আব্দুস ছালাম, আব্দুল মাঝি, এবরেত আলী ও ফজলুর রহমান। এই বর্বর হত্যাকাণ্ড থেকে ভাগ্যচক্রে বেঁচে যাওয়া মোফাজ্জল কাজী আহত অবস্থায় এবং আব্দুল খালেক ও হাশেম আলী খান জাহেদী পিছন থেকে পালিয়ে এসে রক্ষা পান।[৮] এভাবে পাকবাহিনীর দোসর আব্দুল আলীম ও মতিউর রহমানের ষড়যন্ত্রের ফলে দেশ-মাতৃকার মুক্তির জন্য সংগ্রামী ৭ জন সম্ভাবনাময় তরতাজা মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। স্বাধীনতা বিরোধী এই দলটি সমগ্র পশ্চিম বগুড়া তথা তৎকালীন জয়পুরহাট মহকুমায় দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে হত্যা, খুন, ধর্ষণসহ সকল ধরনের অপকর্ম করেছে এবং করিয়েছে—মানুষের সঙ্গে পশুর মত আচরণ করেছে। নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য দম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

ভরে হীন থেকে হীনতর কাজ করতেও এদের হাত কাঁপে নি। দাম্ভিকতাপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী এ-সকল দালাল প্রতিটি বিবেকবান মানুষ কর্তৃক ঘৃণিত হয়ে থাকবে একথা বলা যায়।

দালালদের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের হাতকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিলো পাকিস্তানপন্থী অবাঙালি বিহারিরা। সেই সুবাদে দালালচক্রের প্ররোচনায় বগুড়া শহর এবং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিহারীরা ব্যাপক অত্যাচার চালায়। বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়া, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে নারী ধর্ষণসহ হেন-অপকর্ম নেই যা তারা করে নি। পশ্চিম বগুড়ার কাহালু এলাকার মুরইলে গিয়ে বিহারী নেতা মমিন হাজী তার দলবলসহ ব্যাপক অত্যাচার চালায়। বগুড়া স্টেট ব্যাংক লুট হবার পর সেই টাকা প্রথমে মুরইল এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই টাকা উদ্ধারের নামে মমিন হাজী তার দলবলসহ অত্র এলাকায় তাসের রাজত্ব কায়েম করে।[৯] এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নেপথ্যে বৈষয়িক সম্পদ আহরণ, অর্থ লোলুপতা এবং নারী লোভ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, এপ্রিলের ২২ তারিখে বগুড়ার পতনের পর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিহারি, রাজাকার, আলবদররা বগুড়া শহরের প্রত্যেকটি এলাকায় ব্যাপক লুটপাট ও নির্যাতন চালায়। মোমিন হাজীর নেতৃত্বে তার মেয়ের জামাই নিসার, ওসমান বিহারী, হাবেরীন, আলী হোসেন, মাজহার, মতাজ, বাবু কালুয়াসহ ২৫/৩০ জন বিহারীর একটা সর্বগ্রাসী গ্রুপ ছিল। মোমিন হাজী ও তার দলবলের অত্যাচার সম্পর্কে একজন মুক্তিযোদ্ধা বলেন : এরা মেয়েদেরকে ধর্ষণ ছাড়াও সকল বয়সের, সকল শ্রেণী-পেশার অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। এদের তাণ্ডবে বগুড়া শহর ও শহর-সংলগ্ন চকলোকমান গ্রামের একটা বাড়িও লুট ও অগ্নি-সংযোগের হাত থেকে রক্ষা পায় নাই। চকলোকমান ও আশপাশের অসংখ্য মানুষ এদের হাতে নিহত হয়। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগ—এই চারটা কাজে এরা ভয়ঙ্কর রকমের পারদর্শী ছিল।[১০] ভয়ঙ্করতার দিক থেকে বগুড়া শহরের বিহারী নেতারা অগ্রগামী ছিল। বগুড়া শহরের বিহারী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী শেরপুর পৌর এলাকার (সান্যাল পাড়া) মান্নান বিশ্বাস নামক একজন কুখ্যাত বিহারীর অত্যাচারে মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষের মানুষজন সর্বদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। শেরপুর শহর হিন্দু প্রধান এলাকা হওয়ায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত হিন্দু পরিবারে লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যার নেপথ্যে মান্নান বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ হাত ছিল। পাকবাহিনীর দোসর এই মান্নান বিশ্বাস এটাই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল যে, নারী-পুরুষ ও শিশু কিশোররা সেই সময় তার নাম শুনলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। কথিত আছে যে, সে করতোয়া এবং বাঙালি নদীর ধারে মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করে হত্যা করত। একথাও প্রচলিত যে, মান্নান বিশ্বাস ও তার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের শিশু সন্তানদেরকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে নিচে ছুরি ধরে হত্যা করতো।[১১] নিরীহ বাঙালিদেরকে নানাভাবে

Dhaka University Institutional Repository

অপদস্ত করতে এবং প্রাণনাশে দক্ষতা প্রদর্শনে বিহারীদের নাম সুবিদিত। বিহারীদের অত্যাচারের দিক থেকে সান্তাহার উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগের ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলের মধ্যে সান্তাহার রেল জংশনটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে শান্তাহার শহরে ব্যাপকহারে বিহারীদের বসবাস ছিল। এই সকল বিহারীরা যুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালিদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। জয়পুরহাট সদর এবং পাঁচবিবিতেও বিহারীরা ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক কাজ করে। জয়পুরহাট পাকবাহিনীর দখলে আসার পর দলে দলে লোকজন নিরাপত্তা ও ইজ্জতের কথা চিন্তা করে ভারতে চলে যেতে থাকে। দেশত্যাগকালে সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময় গরুর গাড়ি ব্যবহার করতো। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এমনিভাবে কতিপয় সাধারণ মানুষকে গাড়োয়ানরা বাংলাদেশের সীমানায় রেখে আসার পথে রাজাকাররা ১৬/১৭ জন গাড়োয়ানকে গ্রেফতার করে জয়পুরহাট শান্তি কমিটির অফিসে নিয়ে যায় এবং শান্তি কমিটির সভাপতি দালাল আব্দুল আলীমের নির্দেশে পরের দিন শামীম বিহারীর নেতৃত্বে ট্রাকে করে তাদেরকে আক্কেলপুর মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বাঁশের চোঁকা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।[১২] শুধু তাই নয়, আব্দুর রহিম নামের একজন পাকবাহিনীর খবরদাতা, দালাল জয়পুরহাট সদরের ছইমুদ্দীন নামক একজন মুক্তিযোদ্ধার পিতাকে সন্তানের মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অপরাধে ২০/২৫ জন খান সেনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ধরে আনে এবং খানসেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে এসে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।[১৩] পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে গর্হিত অপরাধ বিষয়ক কোন অনুশোচনার লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। তারা দম্ভ ভরে নিজেদের কৃতিত্বের কথা প্রচার করত। এরকমই একজন আত্মস্বীকৃত রাজাকার আইনুদ্দিন শেখ। বগুড়ায় ধুনট উপজেলার পূর্ব-ভরণসই গ্রামের আইনুদ্দিন শেখ একজন আত্মস্বীকৃত রাজাকার। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশে ৩৬ বছর পরে এসেও এই আত্মস্বীকৃত রাজাকার আইনুদ্দিনের সাক্ষাৎকারে গ্লানিহীন দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ মনোভাব লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ সালে তিনি একজন পাওয়ার পাম্প ড্রাইভার ছিলেন। পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর এই রাজাকারকে সেই সময়ের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শিবিরে নিজের একাত্মতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন :

> মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানকার পরিস্থিতির উপর আমাকে রাজাকার হইতে হইছে। আমি বাধ্য হয়ে একাজ করেছি। তখন সরকার ছিল খুব জাঁদরেল। তারপর স্বাধীনতা যে আসবে বা এই যে বিপ্লব আসছে তা কতখানি সাকসেসফুল হবে এটাতো সম্ভব হয় নি। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত, এখন যেরকম আন্দোলন হয় সরকারের পক্ষে বিপক্ষে তখন কিন্তু বিষয়টা এরকম ছিল না। তখনকার আন্দোলনটা ছিল ভিন্ন। আমরা তো তখন অতো বুঝতে পরি নাই। তার চেয়েও বড় কথা পাকিস্তান আর্মিদের হাত থেকে নিজেদেরকে এবং এলাকার মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করেছি। মূলত আমরা মনে করতাম যে এরাই (পাকিস্তানিরা) সঠিক। সরকার যেহেতু ঠিক সুতরাং এরাই ঠিক। আমাদের অতীতে এরকম ঘটনা ঘটে নাই তাই আমরা বুঝতে পারি নাই।[১৪]

আইনুদ্দিন শেখের জবানী থেকে রাজাকারের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। রাজাকার চরিত্রের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে আইনুদ্দিন প্রচলিত স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র থেকে ভিন্ন ধাঁচের বলেই মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের দোসরদের অত্যাচারে বগুড়ার ধুনট, শেরপুর এলাকা থেকে হিন্দু সম্প্রদায় দলে দলে ভারতে চলে যায়। পাশের দেশ ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আশ্রয় নেয়ার জায়গা ছিল ভারত কিন্তু মুসলমানরা সরকারের বিরোধিতা করে যাবেই বা কোথায়? এই ধরনের মনোভাবই পোষণ করত আইনুদ্দিনের মত রাজাকারেরা। ধুনটের সরুগ্রাম নিবাসী শাহাবুদ্দিন নামক এক রাজাকার প্রধানের অধীনে আইনুদ্দিন কাজ করত। শাহাবুদ্দিন ছিল প্লাটুন কমান্ডার আর সরুগ্রামের লাল মিয়া ছিল কোম্পানি কমান্ডার। কোম্পানি কমান্ডারের নির্দেশে প্লাটুন কমাণ্ডারের প্রত্যক্ষ আদেশে কাজ করত আইনুদ্দিন। মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন, ছাত্র সংগঠনগুলোকে প্রতিহত করার জন্য এরা কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে আইনুদ্দিন মানবিক গুণাবলী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'একজন নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করতেই পারেন।'[১৫] এছাড়াও বগুড়ার ধুনট থানার সরুগ্রামের পাকবাহিনীর দালাল আজিজ মণ্ডলের তিন ছেলে লাল, চান, খোকা খুব কুখ্যাত রাজাকার ছিল। এদের বাড়িতে সব সময় পাকসেনারা যাতায়াত করত, দাওয়াত খেত। পাকিস্তানিদের খাওয়ানোর জন্য এরা আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে লোকজনের গরু, খাসি, মুরগী, পুকুরের বড় মাছ এসব নিয়ে আসত এবং পাকবাহিনীকে পেট ভরে খাওয়াতো, উপঢৌকন দিত। সরুগ্রাম ও এর আশপাশের এলাকার ভুলু মণ্ডল, মজিবর প্রমুখ ছিল হানাদারদের দোসর। মোজাম চেয়ারম্যান ছিল পাকহানাদার এবং রাজাকারদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ও পাকিস্তানিদের তথ্য প্রদানকারী।[১৬] এখানে উল্লেখ্য যে, ধুনট থানার জোড়খালী মাদ্রাসায় জামায়াতে ইসলামীর সক্রিয় সংগঠন ছিল। এখানে রাজাকারদের ট্রেনিং দেয়া হতো। দালালদের প্রত্যক্ষ মদদে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ থেকে সংগৃহীত মানুষজন সহযোগে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। রাজাকার বাহিনীতে কিছু লোক স্ব-ইচ্ছায় যোগ দিলেও বেশি সংখ্যক কর্মীকে ভয় দেখিয়ে এবং লোভ দেখিয়ে নেয়া হয়। এই এলাকায় তৎকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রিয় নেতা আব্দুল মালেকের বাড়ি ছিল। মূলত আব্দুল মালেকের ছত্রছায়ায় জোড়খালী মাদ্রাসায় রাজাকার ট্রেনিং কেন্দ্র গড়ে ওঠে। জোড়খালী গ্রাম থেকেই ১৬/১৭ জনকে রাজাকার বানানো হয়। সেই দুর্দান্ত রাজাকারদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য জোড়খালী মাদ্রাসার বর্তমান সুপারিন্টেনডেন্ট মাওলানা মাহমুদ হোসেন। এছাড়াও শিক্ষক আব্দুস সামাদ, আফসার আলী কিরাম প্রমুখ রাজাকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭]

রাজাকারদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণে দেখা যে, বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার রায়নগর এলাকাতে অনেক রাজাকার ছিল। এই রাজাকাররা ছিল খুবই প্রভাবশালী এবং প্রবলভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী। প্রশিক্ষিত এবং অস্ত্রবহনকারী এ সকল রাজাকার শুধু রায়নগর এলাকা-ই নিয়ন্ত্রণ করত না, বরং তারা আশপাশের বিভিন্ন এলাকাসহ পাকবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত। পাকবাহিনীকে খবরা-খবর সংগ্রহ করে দেয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা থেকে নারীদের ধরে নিয়ে এসে শিবগঞ্জ থানায় অবস্থানরত পাকবাহিনীর সদস্যদের উপঢৌকন দিত। শিবগঞ্জে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের অপকর্ম সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য এরকম :

> যুদ্ধ শেষে আমরা যখন প্রথম শিবগঞ্জ থানায় ঢুকি তখন যে কি দৃশ্য দেখেছি তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। একটা লিবারেশন মুভমেন্টে আমরা ছিলাম বাইরে আর ওরা ছিল ভিতরে ফলে রাজাকার, আলবদর, আলশামস যাই বলেন-না-কেন এসকল স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা যে কতটা ভয়াবহ ছিল তা চোখে না-দেখলে বুঝা যাবে না। শিবগঞ্জ থানায় কিছু বিহারীও অবস্থান নিয়েছিল। ওরাই বাঙালিদের বেশি অত্যাচার করত। এদেশীয় দালালরা মহিলাদের জোর করে ধরে নিয়ে যেত। রওশন সার্কাসের মালিক আকবর আলী একজন অন্যতম দালাল ছিল।[১৮]

মুসলিম লীগাররাও স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতায় বেশি লিপ্ত ছিল। এরা বেশিরভাগই ছিল দালাল। এই কৃচক্রী দালালগোষ্ঠী নিজ নিজ এলাকায় রাজাকার তৈরি করত। রাজাকারদের মধ্যে কেউ কেউ বাধ্য হয়ে দালালদের ভয়ে রাজাকারের নাম লিখিয়েছিল। রাজাকার সংগঠন ও দলনেতা হিসাবে অন্যতম ছিলেন পশ্চিম বগুড়ার দুপচাঁচিয়া থানার পীস কমিটির চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান তালুকদার। অপকর্ম এবং নির্যাতকের দিক থেকে দেখলে সে ছিল একজন নিকৃষ্টমানের দালাল।[১৯] বিশ্লেষণে দেখা যায়, পূর্ব বগুড়ার চেয়ে পশ্চিম বগুড়া এলাকায় দালাল ও রাজাকারের সংখ্যা বেশি ছিল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কম ছিল। ফলে এই এলাকায় যে-সকল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে হতো। দিনের বেলা ঘর থেকে বের হতে পারতো না। ঘরের ভিতরেই প্রাতকৃত্য সম্পন্ন করে রাতে বাইরে ফেলে দিতে হতো। যুদ্ধ শুরু হবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের একটা গ্রুপ ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে হিলি সীমান্ত দিয়ে বগুড়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হবার পূর্বের দিন পশ্চিম বগুড়া এলাকার একটি বাড়িতে তারা অবস্থান নেয়। সেই বাড়িটি ছিল পাকবাহিনীর এদেশীয় দোসর এক স্বাধীনতা বিরোধীর। একজন মুক্তিযোদ্ধার জবানীতে ঘটনাটা ছিল এরকম : আমরা প্রথম রাত্রিতে যে বাড়িতে গিয়েছি তারা আমাদের থাকতে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে পাকস্তিানিদের খবর দিল। ঐ রাতটা ছিল আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আগের রাত। দেখা গেল যে, ওরা কাহালুতে পাকবাহিনীকে খবর দিতে গেছে আর আমাদের জন্য খাসি-টাসি জবাই করছে যাতে আমরা দেরী করি।[২০] পাকিস্তানিদের আগমনের সংবাদটি তড়িৎগতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা খাবার না খেয়েই দ্রুত ঐ এলাকা ত্যাগ করে। পাকবাহিনীর দোসরদের ষড়যন্ত্রে বিপদগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন সাধারণ জনগণের সহযোগিতায় নিজেদের জীবন রক্ষা করতে পেরেছিল। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, শোষিত ও নিপীড়িত সাধারণ জনগণ পাকবাহিনীর অপকর্মের বিরুদ্ধে মানসিকভাবে তৈরি ছিল বলেই তারা সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

পাকবাহিনীর এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের নৃশংস বর্বরতা সর্বজন বিদিত। বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় এরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এদের প্রধান কাজই ছিল লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন এবং হত্যা। এরা মানুষকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করেছে। নারুলী এলাকার কুখ্যাত রাজাকার ছিল গোলাম হোসেন এবং তার পুত্র মন্টু রাজাকার, জামাত নেতা আনিসুর রহমান, জুলফিকার, মোহাম্মদ আলীসহ আরো অনেকে। এদের মধ্যে গোলাম হোসেন, মন্টু রাজাকার এবং জুলফিকার হত্যা এবং লুটপাটে অগ্রগামী ছিল। নারুলী দক্ষিণপাড়ার বৃদ্ধ সালামত উল্লাহ সরকার জানান : গোলাম হোসেন এবং তার ছেলে মন্টু সালামত উল্লাহ সরকারের নাতি বুলু প্রামাণিককে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করে। এছাড়া তারা নারুলী এলাকার চেয়ারম্যান সাদেকুর রহমানের ভাইকে হত্যাসহ বৃদ্ধ সালামত উল্লাহর আরো ১৬ জন আত্মীয়কে হত্যা করে। সাদেকুর রহমানের এক আত্মীয়কে গুলি করে মারার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পিতার প্রশ্নের উত্তরে রাজাকার গোলাম হোসেন বলে, 'পাখি মারলাম'।[২১] মৃত্যু নিয়ে এরকম উক্তি করার মধ্য দিয়ে তার নৃশংতার রূপ সম্পর্কে জানা যায়।

স্বাধীনতা বিরোধী দালালচক্রের দূরদর্শী রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ছিল। জঘন্য অপরাধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেছে। পরবর্তীকালে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে সুযোগ মতো তারা রাজনীতির সামনের কাতারে চলে আসে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এরকম সুযোগ-সন্ধানী চক্রের অন্যতম দালাল আব্দুল মজিদ। আদমদীঘি থানার কুখ্যাত দালাল আব্দুল মজিদ (পরবর্তীকালে এম.পি হয়েছিল) অত্র এলাকায় পাকবাহিনীর প্রধানতম দোসর ছিল। আব্দুল মজিদ চকসোনা গ্রামের একটা ছেলেকে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া নশরৎপুর এলাকার অবের, মজিবর, জলিলসহ আরো কয়েকজন রাজাকার মিলে নশরৎপুর ও এর আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক নির্যাতন চালায়।[২২] এছাড়াও তালোড়া এলাকায় পাকবাহিনীর দালাল লুৎফর রহমান মোল্লার নাম

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখের দাবী রাখে। সে তালোড়া বন্দর এলাকায় পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষ সহযোগী ছিল। এছাড়াও তালোড়ার আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় পাকবাহিনীর অপকর্মগুলো এই দালাল কর্তৃক সৃষ্ট রাজাকারদের তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।[২৩] পূর্ব-বগুড়ার যমুনা-বিধৌত সারিয়াকান্দি এলাকায় শান্তি কমিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এ্যাডভোকেট ওয়াজেদ হোসেন তরফদার এবং রাজাকার বাহিনীর প্রধান ছিল শওকত হোসেন। এরা সারিয়াকান্দি এলাকায় পাকবাহিনীর দোসর হিসেবে তাদের বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গী হয়েছিল।[২৪] যমুনা-বিধৌত পার্শ্ববর্তী ধুনট থানার পূর্ব এলাকা বিশেষত, গোসাইবাড়ির কাদের প্রামাণিক ছিল পাকবাহিনীর একজন দালাল। কাদের প্রামাণিকের সঙ্গে পাকবাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা সুবিদিত—থানায় ছিল তার অবাধ যাতায়াত। তার বাড়িতে পাকবাহিনী বেড়াতে এলে ঐ এলাকার রাজাকার এবং দালালরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে মানুষের বড় বড় বকরী/খাসি, এঁড়ে গরু, বড় মুরগী এসব ধরে নিয়ে এসে খাওয়াতো। যুদ্ধকালীন সময়ে ধুনট থানার গোসাইবাড়ি খাদ্য গুদাম থেকে কিছু চিহ্নিত রাজাকার চাল এবং গম নিয়ে যাওয়ার সময় পাশের বাড়ির একজন যুবক, যে ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধার ভাই সে প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, 'তোমরাই যদি সব নিয়ে যাও তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা আসছে ওরা কি খাবে?'[২৫] এই অপরাধে পরদিন এই রাজাকাররা পাকবাহিনী ডেকে নিয়ে আসে এবং তারা ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর গোসাইবাড়ি বাজারে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচারের পর পুনরায় বাড়িতে নিয়ে এসে ছেলেটিকে গুলি করে হত্যা করে এবং তার বাড়ি-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বগুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাকবাহিনীর এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস সর্বোপরি দালাল ও শান্তি কমিটির সদস্যদের প্রত্যক্ষ মদদে পাকবাহিনী ব্যাপক নির্যাতন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্ষণসহ নানা অপকর্ম চালায়। স্বাধীনতা-বিরোধী এদেশীয় দালাল ও নরপশুরা নিজ হাতে অনেক মানুষকে হত্যা করাসহ অগণিত মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে। অসংখ্য ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, লুট করেছে। মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতি ও জাতিসত্ত্বা বিরোধী এসকল দালালরা ধর্মের ধ্বজাধারী পাকবাহিনীকে সাহায্য করার নামে চরম অধর্ম করেছে এদেশের সাধারণ আপামর জনগণের উপর। ধর্মীয় উন্মাদনায় শুধু হিন্দুদের প্রতিই নয়, একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমান ভাইয়ের গলা কাটতেও এদের হাত কাঁপে নাই। পাকবাহিনীর হাতে মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হবার পর এদের প্রধান নেতা বলেন : যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী এমন ঘটনা ঘটায়ই—এটা কোনো দোষের বিষয় নয়, দেশের স্বার্থে এটা মেনে নিতে হবে।[২৬] অপরাধীচক্রের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যালাপে এ-কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল নরপশুরা শুধু দেশ ও জাতির বিরোধীতাই করে নি, বরং ধর্মকেও করেছে কলুষিত।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীব্যাপী ঘটে যাওয়া যুদ্ধের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণে বিবেক-বিবর্জিত নারকীয় হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনসহ সকল প্রকার অপকর্মের মতো এত নিষ্ঠুর ও নির্মম ঘটনা দ্বিতীয়টি আর ঘটে নি—অন্তত সময়ের পরিধি বিবেচনায় এবং নির্মমতার মাপকাঠি বিশ্লেষণে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম জেলা বগুড়ায় স্বাধীনতা বিরোধীদের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানবিক গুণাবলী বিবর্জিত এই অপকর্মের নেপথ্যে তাদের ধর্মীয় গোড়ামি, অন্ধ-উন্মাদনা, পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বেড়াজালে আত্মরতি ও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার হীনমানসিকতা এবং কূটচাল সর্বাংশেই দায়ী। বৃহত্তর বগুড়ায় হিলি স্থলবন্দর অবস্থিত হওয়ায় এবং ভারতীয় সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় স্বাধীনতা বিরোধীদের কর্মকাণ্ডে অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়। উপরন্তু, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের অন্যতম দুই নেতা আব্বাস আলী খান ও আব্দুল আলীমের স্থায়ী নিবাস পশ্চিম বগুড়ার জয়পুরহাটে হওয়ার সুবাদে তাদের নেতৃত্ব এবং অনুপ্রেরণায় রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স বাহিনীর প্রাধান্য ও বিস্তার অধিকতর অনুকূল হয় এবং বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে। এই নানামুখী সহযোগী পরিবেশের কারণে পশ্চিম বগুড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য দুই ব্যক্তি আবদুল আলীম ও আব্বাস আলী খানের প্ররোচণা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি বিহারি, রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌সসহ সকল বিরোধী চক্রকে উন্মত্ত-প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তোলে। তারা সমগ্র বগুড়া জেলাব্যাপী ধর্ষণ, খুন, হত্যাসহ সকল প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। স্বল্প সময়ে এবং তড়িৎ গতিতে সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে এই বিরোধী চক্র। অগ্নি-সংযোগ, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ এমন দুর্বিষহ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাসে বগুড়া তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের নির্মমতার তুল্য অপরাধ খুব কমই ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

তথ্যসূত্র

১. *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, এ হাকিম এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৪২২।
৩. সাক্ষাৎকার, আনজাদ হোসেন, ১ মে২০০৮।
৪. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ১৫৭।
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২।
৬. *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, সম্পা : আবুল কাশেম, জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট, ২৬ মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭. হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড*, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩, সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা মণ্ডল, পৃ. ১৫৫।
৮. *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
৯. সাক্ষাৎকার, হোসেন আলী, ৪ মে ২০০৮।
১০. সাক্ষাৎকার, মিসবাহুল মিল্লাত নান্না, ৭ মে ০৮।
১১. সাক্ষাৎকার, আব্দুল জলিল, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬।
১২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
১৩. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
১৪. সাক্ষাৎকার, আইনুদ্দিন শেখ, ৫ মে ০৬
১৫. ঐ।
১৬. সাক্ষাৎকার, মিসবাহুল মিল্লাত নান্না, ৭ মে ২০০৮।
১৭. সাক্ষাৎকার, গোলাম মোস্তফা ঠাণ্ডু, ১০ মে ০৮।
১৮. সাক্ষাৎকার, শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, ৩ মে ০৮।
১৯. সাক্ষাৎকার, এ.বি.এম শাহজাহান, ৩ মে ০৮।
২০. সাক্ষাৎকার, হোসেন আলী, ৪ মে ০৮।
২১. ডা. এম.এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ঢাকা, ওয়ার ক্রাইমস্ ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, ২০০১, পৃ. ২৬২-২৬৪।
২২. সাক্ষাৎকার, আবুল কাশেম, ৩ মে ০৮।
২৩. সাক্ষাৎকার, হোসেন আলী, ৪ মে ২০০৮।
২৪. সাক্ষাৎকার, আব্দুল আজিজ রঞ্জু।
২৫. সাক্ষাৎকার, গোলাম মোস্তফা ঠাণ্ডু, ১০ মে ২০০৮।
২৬. শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, মে ২০০৭, পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইংরেজ শাসনের ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষে কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিকচেতনা, জীবনবোধ, শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চাসহ আকর্ষণীয় জীবনের দিক থেকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুখ-সড়কে অবস্থিত, কলকাতা তথা ভারতীয় সীমান্তবর্তী বগুড়া জনপদে শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল পূর্বাহ্নেই। সড়ক, নৌ এবং ট্রেন যোগাযোগ উন্নত হওয়ায় এখানে শহর ও শিল্পকেন্দ্রিক শ্রম-কলোনি গড়ে ওঠে। ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় আন্দোলন ও সংগ্রামে সংযোগ ঘটানো সহজতর হয়—মানুষের গোষ্ঠীচেতনা, সংগঠন-প্রবণতা প্রবল হয়। দলীয় কর্মকাণ্ড, রেষারেষি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক মনোভাব পাল্টে গিয়ে দলীয় রাজনীতি-চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। উর্বর সমতল ভূমি হওয়ায় কৃষিপণ্য উৎপাদন সহজতর হয়। ফলে দেশভাগের কারণে এদেশে আগত ভারতীয় মুসলমানগণ বগুড়ায় বসতি স্থাপন করে। অধিকন্তু বিহারিরা তো ছিলই—অবাঙালি বিহারি, ভারত থেকে আসা মোহাজেররা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে না। তারা পাকিস্তান, ইসলাম ও মুসলমানিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ বাজি রাখে। শুরু হয় আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তিসহ মুক্তিযোদ্ধাগণ দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় অসহযোগ আন্দোলন, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধ-ব্যবস্থাগ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারত-গমনের ক্ষেত্রে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দ উজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশের জন্য তারা কর্ম ও ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

পাকবাহিনীর অত্যাচার, পাকিস্তান সরকারের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণ ও নির্মমতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে ঝড় তোলে, সেই ঝড় অসহযোগের মধ্য দিয়ে প্রলয়ঙ্করী মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়—দেশের সর্বস্তরের জনগণ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে অকুতোভয়ে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাগণ পাকবাহিনীর নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তোলেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্য বগুড়া সদর, শেরপুর, জয়পুরহাটসহ শহর, গ্রাম-গঞ্জ ও প্রত্যন্ত এলাকায় স্বল্পমেয়াদি ট্রেনিংক্যাম্প স্থাপিত হয়। জয়পুরহাট বিশেষত, হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতের বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ হয়ে শিলিগুড়ি, হাফলং, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য এদেশের সাধারণ জনগণ, ছাত্র, যুবক গমন করেন এবং আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির অনেক নেতা-কর্মী বগুড়া হয়ে হিলি সীমান্ত দিয়ে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য নিয়ে ভারতে গমন করেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা বাংলাদেশে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ার মানুষ, প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রাথমিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বগুড়ার জনগণ ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছে। বগুড়ার মুক্তিকামী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত বগুড়া হানাদার মুক্ত থাকে। এই সুযোগে বগুড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিংক্যাম্প স্থাপন করে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তারা বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নগরবাড়ী ফেরিঘাটসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে আধুনিক সমরাস্ত্রসজ্জিত পাকবাহিনীকে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। যার ফলে উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ জেলাগুলো প্রাথমিকভাবে হানাদারমুক্ত থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশল ও কুশলী-রণনীতিতে পাকবাহিনী বিভ্রান্ত এবং প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। এদেশের মুক্তিকামী জনতার প্রতি এই ক্ষিপ্রতা পরবর্তীতে পাকবাহিনীকে মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর বিভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা সংগঠিত হতে থাকে—পরবর্তীকালে এই কৌশল যুদ্ধজয়ের জন্য ব্যাপকভাবে সহায়তা করে।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের মৌলবাণীর মধ্যেই সমগ্র দেশবাসী বিশেষত, বগুড়ার মুক্তিকামী জনগণ স্বাধীনতার ডাক শুনতে পায়—তারা দেশের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাফল্য অর্জন করে।

আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, শক্তিশালী এবং উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যৎসামান্য অস্ত্র ও কৌশল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার বীরসন্তানরা। অদম্য সাহস ও অপরিমিত শক্তি, অমিত দেশপ্রেম এবং আবেগকে আত্মস্থ করে বাঙালিরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল—বিনিময়ে খোয়াতে হয়েছে মূল্যবান জীবন, মান-ইজ্জত-সম্ভ্রম ও নানাবিধ সম্পদ। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অদম্য সাহস ও রণ-কৌশলে উন্মত্ত-পাগলপ্রায় পাকহানাদার বাহিনীর পাশবিকতা আরও প্রবলতর হয়—নিরীহ বাঙালিদের উপর নেমে আসে নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতন। ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী বগুড়ায় প্রবেশকালে ঠেঙ্গামারা নামক স্থানে প্রথম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রতিরোধকামী জনতা তাদের কুশলী-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধা ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতিরোধের মুখে প্রায় একমাস বগুড়া শহর পাকহানাদার মুক্ত ছিল। এই ক্ষোভ ও ঈর্ষা এপ্রিল '৭১ পরবর্তী সময়ে পাকবাহিনীকে নির্যাতন, হত্যা ও অগ্নিসংযোগে অতি উৎসাহী করে তোলে। উন্মত্ত দিশেহারা পাকবাহিনী পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা-ধর্ষণ শুরু করে বেসামাল। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বগুড়ার আপামরজনগণ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বগুড়ার নারীরা—ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর

Dhaka University Institutional Repository

দিন ধর্ষণ করাসহ হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত থেকেছে পাকহানাদার বাহিনী। পাকবাহিনীকে এই জঘন্য কাজে সাহায্য করেছে অবাঙালি-বিহারি এবং রাজাকার আল-শাম্‌স, আলবদররা।

বগুড়া শহর, শহর-সংলগ্ন চেলপাড়া, বাবুরপুকুর, গাঙ্গুলিবাগান, রামশহর-পীরবাড়ি, ধুনট, শেরপুর, তালোড়া, জয়পুরহাটের কড়ই কাদিপুর, ইছাইদহ, পাগলা দেওয়ানসহ অনেক স্থানে আবিস্কৃত বধ্যভূমি ও গণকবর পাকবাহিনীর নির্যাতনের সাক্ষ্য বহন করছে। বগুড়ার নির্যাতন, গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার দীপশিখা হয়ে বেদনা ও আনন্দের আবাহনে সমকালীন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে প্রতিবাদী করে তুলবে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাংলাদেশের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আসে আমাদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা। গর্ব ও গৌরবময় এই অর্জনের পেছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ভারী সমরাস্ত্র না-থাকলেও বাঙালির আবেগ ও সহানুভূতির কমতি ছিল না। মাঠ-গবেষণা, তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানে এ-কথার সত্যতা মিলে। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে, মাত্র নয় মাসের এই অর্জনকে হয়তো-বা অনেকেই অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন—বাংলাদেশের মানুষের হাতে আধুনিক সমরাস্ত্র না-থাকলেও যার হাতে যতটুকু রসদ ছিল তাই ঢেলে দিয়েছে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য।

বগুড়া জেলার যুদ্ধের বর্ণনা লিখতে গিয়ে প্রায় অধিকাংশ থানার উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা বিশেষত, নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। তাদের কাছ থেকে গৃহীত সাক্ষাৎকার এবং লিখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় বগুড়ার যুদ্ধ একটু অন্যভাবে মাত্রিকতা লাভ করেছিল। এই ব্যাপকতা ও বিস্তারের নেপথ্যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যোগসূত্র গভীর। নদীপথ, সড়কপথ, রেলপথ এবং আকাশপথ—এই চতুর্বিধ পথেই বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নসহ হিলি স্থলবন্দর হওয়ায় এবং বগুড়া উত্তরাঞ্চলের ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্রে পরিণতি লাভ করায় খুব সহজেই বিহারিদের বসবাস এবং পাকবাহিনীর দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল। এর নেপথ্যে একটি কারণকেও ছোট করে দেখার কোনো সঙ্গত কারণ নেই—'দ্বি-জাতিতত্ত্বে'র ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ায় ভারত থেকে আসা মোহাজের মুসলমানরা সহজে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। দেশ-মাটি-সম্পদ ত্যাগ করে এদেশে আসা মুসলমানরা নিজেদেরকে ইসলামের বিশ্বস্ত একজন মনে করে এবং পাকিস্তানকে তাদের আস্থা ও ঠিকানা হিসেবে বিবেচনা করে। একাধিক কারণে বগুড়ার যুদ্ধে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ এবং গুপ্তহত্যা, অগ্নি-সংযোগ, লুণ্ঠন ও নারীধর্ষণ প্রচণ্ড ব্যাপকতা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়া জেলার পূর্ব অঞ্চলের গাবতলী, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, ধুনট, শেরপুর এবং পশ্চিম-বগুড়ার আদমদীঘি, দুপচাচিয়া, কাহালু, শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম, জয়পুরহাট, ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর ও পাঁচবিবি থানায় সংঘটিত একাধিক যুদ্ধের বর্ণনা বক্ষ্যমাণ গবেষণায় স্থান পেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় মনোভাব এবং আত্মত্যাগ স্মরণযোগ্য। পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণবাজি রেখে জলে-স্থলে চোরাগোপ্তা হামলা অব্যাহত রেখেছিল। তারা বিভিন্ন ব্রিজ-কালভার্ট উড়িয়ে দেয়। ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মাইন অপারেশন চালায়। গেরিলা আক্রমণ করে পাকবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়াসহ নদীপথে পাকবাহিনীর লঞ্চে আক্রমণ করে লঞ্চ ডুবিয়ে দেয় এবং একাধিক চোরাগোপ্তা হামলা চালায়। সর্বস্তরের জনসাধারণের তথা আবালবৃদ্ধ-বনিতা-ছাত্র-জনতা-নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল আমাদের স্বাধীনতা—বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা বিশ্লেষণে এ-কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সেই অভিজ্ঞতা অর্জন বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া যুদ্ধের ইতিহাস অনুসন্ধান ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণে বিবেক-বিবর্জিত নারকীয় হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনসহ সকল প্রকার অপকর্মের মতো এত নিষ্ঠুর ও নির্মম ঘটনা দ্বিতীয়টি আর ঘটে নি।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম জেলা বগুড়ায় স্বাধীনতা বিরোধীদের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানবিক গুণাবলী বিবর্জিত এই অপকর্মের নেপথ্যে তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধ-উন্মাদনা, পাকিস্তান রাষ্ট্ররক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বেড়াজালে আত্মরতি ও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার হীনমানসিকতা এবং কূটচাল সর্বাংশেই দায়ী। বৃহত্তর বগুড়ায় হিলি স্থলবন্দর অবস্থিত হওয়ায় এবং ভারতীয় সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় স্বাধীনতা বিরোধীদের কর্মকাণ্ডে অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়। উপরন্তু, স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের অন্যতম দুই নেতা আব্বাস আলী খান ও আবদুল আলীমের স্থায়ী নিবাস পশ্চিম বগুড়ার জয়পুরহাটে হওয়ার সুবাদে তাদের নেতৃত্ব এবং অনুপ্রেরণায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর প্রাধান্য ও বিস্তার অধিকতর অনুকূল হয় এবং বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে। এই নানামুখী সহযোগী পরিবেশের কারণে পশ্চিম বগুড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য দুই ব্যক্তি আবদুল আলীম ও আব্বাস আলী খানের প্ররোচণা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি বিহারি, রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ সকল বিরোধীচক্রকে উন্মত্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। তারা সমগ্র বগুড়া জেলাব্যাপী ধর্ষণ, খুন, হত্যাসহ সকল প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। স্বল্প সময়ে এবং ত্বরিৎ গতিতে সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ভীত-সন্ত্রস্ত

Dhaka University Institutional Repository

করে তোলে এই বিরোধীচক্র। অগ্নি-সংযোগ, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ এমন দুর্বিষহ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাসে বগুড়া তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের নির্মমতার তুল্য অপরাধ খুব কমই ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। মাত্র ৯ মাসে সফলভাবে এদেশকে শত্রুমুক্ত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে এদেশের সাধারণ জনগণ। কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে আপামর জনগণের ইস্পাত-কঠিন সুদৃঢ় ও অটুট ঐক্যের বন্ধনই আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত পাকবাহিনীকে পরাস্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপামর জনগণ নিজেদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করেও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে।

বগুড়া উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর শিল্প এলাকা হওয়ার ফলে স্বাধীনতার বহু পূর্ব থেকেই শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেতন হয়। পরবর্তীতে এই সচেতনতাই মা-মাটি ও স্বদেশপ্রেমে পর্যবসিত হয়। যার ফলে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনসহ সাহায্য-সহানুভূতি প্রকাশে বগুড়ার সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতার প্রতি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হয়। ব্যক্তি, পরিবার, পরিজন ছাপিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তিসহ আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। এই মুক্তি ও কল্যাণে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের নাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ দফা

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায় করবার স্বত্ব উচ্ছেদ রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নয়নের জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পের ও বৃহৎ-শিল্পের লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. "জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স" প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করিয়া বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২২ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণকরত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পরপর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

সূত্র : মাহমুদ উল্লাহ (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১), প্রথম খণ্ড, ঢাকা, গতিধারা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৩-৮৪।

পরিশিষ্ট-২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ছয়দফা

এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দু'টি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

তিন. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর যে কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয় :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

পাঁচ. এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় :

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

১৯৬৯ সনের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে ১১ দফা দাবী পেশ করেন এগারো দফা দাবী (সংক্ষিপ্ত সার)

১। সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। শাসক গোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

৩। আওয়ামী লীগ প্রবর্তিত ও ছাত্রলীগ সমর্থিত ছয় দফাকে এই তিন নং দফায় সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইতে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, প্রগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইশতেহার

৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় আহ্বান জানিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (পরে বাংলাদেশ আওয়ামী ছাত্রলীগ) সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচীমূলক যে ইশতেহার পাঠ করেন তা নিম্নরূপ :

জয় বাংলা

ইশতেহার নং/এক

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মর্যাদা ও কর্মসূচি)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্যে বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে ঘানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৯৮ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক, রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে-গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুঠতরাজসহ সকল প্রকার সমাজ বিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের বাতিল ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালি মিলিটারিকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি [...] সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে

* স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ—দীর্ঘজীবী হউক।
* স্বাধীন কর স্বাধীন কর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
* গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়—মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
* বীর বাঙালি অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* মুক্তি যদি পেতে চাও—বাঙালিরা এক হও।

বাংলা ও বাঙালির জয় হোক
জয় বাংলা
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৬৬-৬৬৮।

পরিশিষ্ট-৫

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলা চিঠি

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
তারিখ : ২রা মার্চ, ১৯৭১

আপনার ও আপনার পার্টির ৬-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ৬-দফার অর্থনৈতিক দাবিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।
আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করছে পূর্ব বাংলার উপরন্তু পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।
পূর্ব বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেছে :

(১) পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।

(২) পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সংবলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।
প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তরিত করুন।

(৩) পূর্ব-বাংলাব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনার আহ্বান জানান।
এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমেরও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান।

(৪) পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "জাতীয় মুক্তি পরিষদ" বা "জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট" গঠন করুন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) প্রকাশ্যে ও গোপনে, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

(৬) পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে :

(ক) পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ব বাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। ঔপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকার শোষণ ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে সনাতনদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) পূর্ব বাংলার জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

(গ) গ্রাম্য এলাকায় ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারী খাস ভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার-জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।

(ঘ) শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার; ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা।

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(জ) পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা।

(ঞ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা, পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

(ট) পঞ্চশিলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করা।

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম বর্ণনা করা।

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।

ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট বুলেটের নিকট আত্মসমর্পণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেওয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার দুটো পথ পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে।

পূর্ব বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নাই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ কখনই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

পূর্ব বাংলা স্বাধীনতা—জিন্দাবাদ।

পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন

গ্রামে-শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন।

সমস্ত দেশপ্রেমিকদের—ঐক্যবদ্ধ করুন।

পূর্ব-বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক প্রচারিত।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড।

পরিশিষ্ট-৬

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ

(টেপ রেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ)

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব ক্ষমতায় নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ অ্যাসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেমব্লি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে অ্যাসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' Withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরৎ যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেমব্লিতে বসতে পারবো কী পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭০০-৭০২

পরিশিষ্ট-৭

১৪ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য জনতার প্রতি আহ্বান জনান এবং বঙ্গবন্ধু এ দিন ৩৫ দফা নির্দেশ নামা জারি করেন। এতে বলা হয় :

১. সকল সরকারি বিভাগসমূহ, সচিবালয়, হাইকোর্ট, আধা স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাসমূহ পূর্বের মতই বন্ধ থাকবে।
২. বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৩. জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসকগণ অফিস না খুলে আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশ বিভাগ, আনসার বিভাগ ও অনুরূপ কাজ করবে।
৪. বন্দর (আভ্যন্তরীণ বন্দরসহ) কর্তৃপক্ষ সৈন্য ও সমরাস্ত্র ব্যতীত সকল খাদ্যবাহী জাহাজের মাল খালাস ত্বরান্বিত করবেন ও শুল্ক আদায় করবেন।
৫. আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাস্টমস কালেকটরগণ আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্চেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের বিশেষ একাউন্টে শুল্ক জমা করবেন। কোন শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।
৬. সৈন্য ও সমরাস্ত্র পরিবহন ব্যতীত অন্যান্য পণ্য পরিবহনের জন্য রেল চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।
৭. সারা বাংলাদেশে ইপি আর টিসি চালু থাকবে।
৮. আভ্যন্তরীণ নদী-বন্দরগুলোর কাজ চালু থাকবে।
৯. বাংলাদেশের মধ্যে শুধুমাত্র চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানি অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করবে। পোস্টাল সেভিংস, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি কার্যরত থাকবে।
১০. বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। সংরক্ষণ ও মেরামত বিভাগ কাজ করবে।
১১. বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদ পত্র চালু থাকবে। তবে গণআন্দোলনের সংবাদ প্রচার না করলে কর্মচারীরা সহযোগিতা করবে না।
১২. সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ক্লিনিক যথারীতি কাজ করে যাবে।
১৩. বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজ চালু থাকবে।
১৪. গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ব্রিকফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।
১৬. খাদ্য শস্যের চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে।
১৭. বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ও কৃষি সরঞ্জাম ক্রয়, চলাচল, বন্টন অব্যাহত থাকবে।
১৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ কাজ করে যাবে।
১৯. বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি রাস্তা ও পুলসহ সকল প্রকার সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে।
২০. ঘূর্ণিদূর্গত এলাকায় বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ চলবে এবং ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হবে।
২১. ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।
২২. সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন দেয়া হবে।
২৩. সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।
২৪. বেতন ও পেনশন প্রদানের জন্য এজি ও ট্রেজারীর সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
২৫. বাংলাদেশের বাহিরে টাকা পাঠানো ব্যতীত ব্যাংকের সকল প্রকার লেনদেন চালু থাকবে।
২৬. স্টেট ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মত চালু থাকবে।
২৭. বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।
২৮. সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।
২৯. বাংলাদেশে সকল অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।
৩০. পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাফিক রাস্তায় বাতি জ্বালানো সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।
৩১. কোনো খাজনা, কর, শুল্ক আদায় করা যাবে না।
৩২. সকল বীমা কোম্পানি কাজ করবে।
৩৩. সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।
৩৪. সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে। এবং
৩৫. সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

সূত্র : রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪২-৩৪৭।

পরিশিষ্ট-৮

বগুড়া জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধার তালিকা

উপজেলা আদমদিঘী

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	শরিফ উদ্দিন	মোঃ ছমির উদ্দিন প্রাং	গ্রাম : শিবপুর, পোঃ+উপজেলা আদমদিঘী, জেলা : বগুড়া।
২.	মোঃ আঃ জলিল আকন্দ	মোঃ ফজর আলী আকন্দ	গ্রাম : কোমারপুর, পোঃ সীতাইল, উজেলা : আদমদিঘী, জেলা : বগুড়া।
৩.	এম. এম আসলাম উদদেলাল	এন.এম আবু বক্কর সিদ্দিক	গ্রাম : ঢেকরা, পোঃ+উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

৪.	পুলক কুমার বিশ্বাস	মৃত জয়গোবিন্দ বিশ্বাস	গ্রাম : তালসন, পোঃ+উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
৫.	মোঃ আজিজার রহমান	মোঃ বয়েজ উদ্দিন শেখ	গ্রাম : চাটখইর, পোঃ নশরৎপুর, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
৬.	আলতাফ হোসেন	মৃত শমসের আলী মন্ডল	গ্রাম : চকসোনার, পোঃ+উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
৭.	জালাল উদ্দিন সরদার	মোঃ কামাল উদ্দিন সরদার	গ্রাম : লক্ষীপুর, পোঃ নশরৎপুর, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
৮.	মোঃ আশরাফ আলী	মোঃ তয়েজ উদ্দিন	গ্রাম : পৌওতা, পোঃ সান্তাহার, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
৯.	রহিমুদ্দিন	মোঃ দশরত প্রামাণিক	গ্রাম : নওবাড়ীয়া, পোঃ সাওল, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১০.	মোঃ আঃ লতিফ আকন্দ	মোঃ জাহের আলী মন্ডল	গ্রাম : কোলাদিঘী, পোঃ নশরৎপুর, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১১.	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মৃত লালচান প্রাং	গ্রাম : অন্তাহার, পোঃ ছাতিয়ান গ্রাম, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১২.	মোঃ আবদুস ছাত্তার প্রামাণিক	মৃত নিলচাঁদ প্রামাণিক	গ্রাম : ভহরপুর, পোঃ+উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১৩.	জোব্বার আলী প্রাং	মোঃ রোস্তম আলী প্রামাণিক	গ্রাম : কুন্দগ্রাম উত্তরপাড়া, পোঃ কুন্দগ্রাম, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১৪.	মোঃ মজিবর রহমান	মোঃ ছবেদ আলী মন্ডল	গ্রাম : অন্তাহার, পোঃ ছাতিয়ান গ্রাম, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১৫.	মোঃ আক্কাস আলী মন্ডল	মোঃ আসকর আলী মন্ডল	গ্রাম : উত্তর মুরইল, পোঃ নশরৎপুর, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১৬.	আজিজুর রহমান	মৃত তমির উদ্দিন শাহ	গ্রাম : মালশন, পোঃ সান্তাহার, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১৭.	সুভাস ঘোষ	শ্রী রবি ঘোষ	গ্রাম : সান্তাহার বাজার, পোঃ সান্তাহার, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১৮.	মোঃ আঃ জলিল জোয়ারদার	মোঃ মনসের আলী জোয়ারদার	গ্রাম : কান্দিরা, পোঃ সান্তাহার, উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
১৯.	আমজাদ হোসেন	মোঃ আরজ আকন্দ	গ্রাম : জোড়পুকুরিয়া, পোঃ+উপজেলা : আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।

উপজেলা দুপচাঁচিয়া

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ তহির উদ্দিন সাহা	মৃত আহির উদ্দিন সাহা	গ্রাম : বোয়াই, পোঃ+উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।
২.	মৃত মকবুল হোসেন	মৃত গমির উদ্দিন প্রাং	গ্রাম : পালিমহেমহেল, পোঃ গোবিন্দপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।
৩.	আবুল মনছুর মন্ডল	মৃত আব্বাস আলী মন্ডল	গ্রাম : গাড়ীবেলঘরিয়া, পোঃ তালোড়া, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।
৪.	মৃত শাহাছুৎ আলী প্রাং	মোঃ লায়েব আলী প্রাং	গ্রাম : পালিমহেশপুর, পোঃ

Dhaka University Institutional Repository

			গোবিন্দপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।
৫.	মৃত নিজাম উদ্দিন প্রাং	মৃত হানিফ উদ্দিন প্রাং	গ্রাম ও পোঃ গোবিন্দপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।
৬.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ নজারত আলী মন্ডল	গ্রাম : ভিমানহয়, পোঃ+উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।

উপজেলা গাবতলী

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ জাহিদুর রহমান	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মন্ডল	গ্রাম উষ্ণরথী, পোঃ+উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
২.	মোঃ আঃ মান্নান (বাবলু)	মোঃ হাফিজার রহমান মন্ডল	গ্রাম : মাড়িয়া, পোঃ মাড়িয়া, উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৩.	শহীদ আমজাদ হোসেন	মোঃ রবিয়া প্রাং	গ্রাম : জোরগাছা, পোঃ ভেলুরপাড়া, উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৪.	মোঃ লাল মোহাম্মদ প্রাং	মৌঃ মহির উদ্দিন প্রাং	গ্রাম : উষ্ণরথী, পোঃ+ উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৫.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মোঃ আফজাল হোসেন প্রাং	গ্রাম : জাতহলিদা, পোঃ হাটফয়জা, উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৬.	কাজী আবদুল মান্নান	কাজী জহিম উদ্দিন	গ্রাম : নেপালতলী, পোঃ ঘাইগুনি, উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৭.	মোঃ আবদুল লতিফ	মোঃ নবির উদ্দিন আহমদ	গ্রাম : তেলীহাটা, পোঃ সুখানপুকুর, উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৮.	মোঃ মাহফুজুর রহমান	মোঃ তাহাদ্দেক হোসেন খাঁ	গ্রাম : জাগুলী, পোঃ রামেশ্বরপুর, উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৯.	ওসমান গনি	দানেশ মন্ডল	সালুকা গাড়ী, কদতলী, বগুড়া।
১০.	আবেদ আলী	আকবর আলী	সালুকগাড়ী, কদমতলী, বগুড়া।
১১.	আঃ হামিদ	আজার উদ্দিন	দুর্গাহাটা, বগুড়া
১২.	বাবলু মিয়া	হাফিজার রহমান	মাঝিড়া, বগুড়া।
১৩.	হাবিলদার কামরুজ্জামান (বীর বিক্রম)	-	সোনামোরা, কালিয়াদীঘি, বগুড়া

উপজেলা সোনাতলা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ কলিম উদ্দিন	মৌঃ মহাম্মদ উল্লাহ	গ্রাম : চকনদন, পোঃ+উপজেলা : সোনাতলা, বগুড়া
২.	মোঃ আঃ হারিম	মৃত পরপুরাম বেপারী	গ্রাম : সুজায়েতপুর, পোঃ+উপজেলা গাবতলী, জেলা : বগুড়া।
৩.	এ.কে বদিউজ্জামান	মৃত বছির মন্ডল	গোদারপাড়া, সরদার পাড়া, বিরুলিয়া, বগুড়া।
৪.	মোঃ আঃ রউফ কালু	মৃত মফিজ উদ্দিন	চনরগাছা, বগুড়া।
৫.	আঃ খালেক	শাহাদাতুজ্জামান আকন্দ	ঠাকুরপাড়া, গোড়াগাছা, বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা ধুনট

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ আঃ কাদের	মোঃ জসিম উদ্দিন আকন্দ	গ্রাম : চিথুলিয়া, পোঃ গোসাইবাড়ী, উপজেলা : ধুনট, বগুড়া।
২.	মোঃ ওসমান গনি	মোঃ আয়েজ উদ্দিন সরকার	গ্রাম : ভান্ডারবাড়ী, পোঃ নিউসারিয়াকান্দি, উপজেলা : ধুনট, বগুড়া।
৩.	মোঃ আবদুর রহমান	মোঃ গোলাম রহমান	গ্রাম : নারায়ণপুর, পোঃ নিউসারিয়াকান্দি, উপজেলা : ধুনট, বগুড়া।
৪.	মোঃ গোলাম হোসেন	মোঃ রিয়োজ উল্লাহ	গ্রাম : সোলালপুর খাদুলী, পোঃ শিলহাটি, উপজেলা : ধুনট, বগুড়া।

উপজেলা বগুড়া সদর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ আজিজার রহমান (চাঁ)	মোঃ আজিস উদ্দিন ফকির	গ্রাম : সুতরাপুর, বগুড়া সদর, বগুড়া।
২.	মোঃ মজিবর প্রাং	মৃত খেদমতুল্লাহ প্রাং	গ্রাম : বেতগাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৩.	নাসুদ আহমেদ	মৃত ডাঃ টি. আহমেদ	গ্রাম : বেতগাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৪.	আবদুস সোবহান খান	মোঃ রিয়াজ খান	গ্রাম : নামাজগর (গনিলেন), বগুড়া সদর, বগুড়া।
৫.	হাবিলদার রহিম উদ্দিন	মৃত নিদান্ত সেখ	গ্রাম : সেউজগাড়ী, পালপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৬.	মোঃ রমজান আলী	মৃত নইম উদ্দিন	গ্রাম : সুতরাপুর, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৭.	আবুল কাশেম	মৃত আবদুর রহমান	গ্রাম : চকসুতরাপুর, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৮.	আবুল হোসেন পশারী	মৃত সাহার উদ্দিন পশারী	গ্রাম : সুতরাপুর, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৯.	মোঃ আনোয়ারুল হক	মোঃ আলী আযম মিয়া	গ্রাম : মালতিনগর, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১০.	গোলাম মোঃ পাইকার খোকন	জনাব এস.এম পাইকার	গ্রাম : মালতিনগর (খোকন ভিলা), বগুড়া সদর, বগুড়া।
১১.	মোঃ আলতাফ আলী	মোঃ আফতাব আলী সেখ	গ্রাম : ঠনঠনিয়া সাহাপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১২.	মোঃ বাচ্চু সেখ	মৃত শুকটু সেখ	গ্রাম : ঠনঠনিয়া সাহাপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৩.	আমিনুল কুদ্দুস	সামসুদ্দিন আহমেদ	গ্রাম : উত্তর কাটনারপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৪.	মোঃ আনায়রুল হক (আজাদ)	হাজী মোঃ আলী আজম	গ্রাম : জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৫.	এ.কে.এম সাইফুল ইসলাম	এম.এ গনি	গ্রাম : ঠনঠনিয়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৬.	আবদুস সামাদ	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	গ্রাম : সুলতানগঞ্জপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৭.	আবদুল জামাল মন্ডল	আজগর আলী	গ্রাম : মালতিনগর, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৮.	মোঃ আবদুল কুদ্দুছ মন্ডল	আজগর আলী	গ্রাম : মালতিনগর, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৯.	আবদুল জোব্বার	মৃত মহরম আলী	জলেশ্বরীতলা (সুতরাপুর), বগুড়া সদর, বগুড়া।
২০.	মাসুদুল আলম খান (চান্দু)	আঃ খালেক	ঠনঠনিয়া, বগুড়া
২১.	ইয়াছিন আলী মন্ডল	মৃত ইয়াকুব আলী মন্ডল	মালতীনগর, বগুড়া
২২.	আঃ সবুর ভোলা	মৃত শরীফ মন্ডল	ঠনঠনিয়া শহীদ নগর, বগুড়া।
২৩.	আনোয়ারুল হক আজাদ	ইসহাক হোসেন কালু	মালতীনগর, বগুড়া
২৪.	সাইফুল ইসলাম	আঃ গনি	ঠনঠনিয়া শহীদনগর, বগুড়া।
২৫.	খায়রুল এবাদ (বাবু)	-	জালন্তঘা, গোহাইল, বগুড়া।
২৬.	নুরজাহান	স্বামী, মৃত আজিজার	ঠনঠনিয়া শহীদনগর, বগুড়া।
২৭.	মোতাসিরুল হক (তারেক)	মঈদুল হক	কাটনার পাড়া, বগুড়া।
২৮.	আমিরুল কুদ্দুস (বুলবুল)	সামছু উদ্দিন আহমেদ	ঐ
২৯.	হাবিলদার রহম উদ্দিন	মৃত নিদানু শেখ	সেউজগাড়ী পালপাড়া, বগুড়া
৩০.	মোস্তাফিজুর রহমান (ছুনু)	ফজলার রহমান	মালতীনগর, বগুড়া
৩১.	আঃ জব্বার	মহরম আলী	ইলেশ্বরীতলা, বগুড়া
৩২.	আলতাফ আলী শেখ	আলতাফ শেখ	ঠনঠনিয়া শহীদনগর, বগুড়া।
৩৩.	মনসুর রহমান	মফিজ উদ্দিন আকন্দ	সাজাপুর, মাঝিড়া
৩৪.	আকবর হোসেন (বকুল)	এস.এম ইসমাইল	বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া
৩৫.	ফজলুর রহমান	হয়রত খান	ঠনঠনিয়া, শহীদনগর, বগুড়া
৩৬.	মোফাজ্জল হোসেন	-	ঐ
৩৭.	আঃ মমিন (হিটলু)	মোজাম্মেল হক	জলেশ্বরীতলা, বগুড়া
৩৮.	আবুল হোসেন	মৃত বাহার উদ্দিন	সূত্রাপুর, বগুড়া
৩৯.	মাসুদ আহম্মেদ	মৃত ডাঃ টি আহম্মেদ	ঐ
৪০.	আবুল কাশেম	মৃত আব্দুর রহমান	চক সূত্রাপুর, বগুড়া
৪১.	ওয়াজেদুর রহমান (টুকু)	মৃত জসিম উদ্দিন শাহ	ঠনঠনিয়া শহীদনগর, বগুড়া
৪২.	টি.এম আয়ুব (টিটু)	মৃত আছালতজ্জামান	মালতীনগর, বগুড়া
৪৩.	আবু সুফিয়ান	শাহালত খন্দকার	ঠেগাড়ি, বগুড়া
৪৪.	হেলালুর রহমান (হেলাল)	মনসুর রহমান চিশতি	রহমাননগর, বগুড়া
৪৫.	মোকলেছুর রহমান	হাবিবুর রহমান	বৃ-কৃষ্টিয়া, বগুড়া
৪৬.	আঃ কুদ্দুছ মন্ডল	আজগর আলী	মালতীনগর, বগুড়া
৪৭.	জামাল উদ্দিন	মৃত আজগর আলী	মালতীনগর, বগুড়া
৪৮.	আঃ কাদের বাদশা	মৃত নয়ামিয়া শেখ	ঠনঠনিয়া, তেতুলতলা, বগুড়া
৪৯.	শুকুর আলী	ফাছিম উদ্দিন	ঐ
৫০.	হায়দার আলী	আকালু শেখ	ঐ
৫১.	ফাছিম উদ্দিন	আকালু শেখ	ঠনঠনিয়া, তেতুলতলা, বগুড়া
৫২.	শুকুর আলী	ফাছিম উদ্দিন	ঐ
৫৩.	মোজাম্মেল হক (মোজা)	মৃত গোলাম রহমান	মালতীনগর, বগুড়া
৫৪.	আঃ মজিদ খন্দকার (টিপু)	মোজাম্মেল হোসেন খন্দকার	মালতীনগর (মাটির মসজিদ) বগুড়া
৫৫.	মদন মোহন কর্মকার	কালিপদ কর্মকার	আশোকোলা, বগুড়া
৫৬.	মাহফুজুর রহমান (মান্না)	আহির উদ্দিন পশারি	ঠনঠনিয়া, বগুড়া
৫৭.	মোসলেম উদ্দিন	মৃত জসিম উদ্দীন	হরিপাড়া, বগুড়া
৫৮.	আঃ করিম বেপারী	-	হামিল মাদ্রাসার গেটের পার্শ্বে, বগুড়া

৫৯.	আঃ সামাদ	মোজাম্মেল হোসেন	সুলতানগঞ্জ পাড়া, বগুড়া
৬০.	লুৎফর রহমান	মৃত জসিম উদ্দিন সরকার	নওদাপাড়া কলোনী, বগুড়া
৬১.	আঃ রহিম বাবু	মৃত আব্দুস ছাত্তার	নুনগোলা, বগুড়া
৬২.	আঃ সোবহান খান (বাবলু)	রিয়াজ খান	নামাজগড়, বগুড়া
৬৩.	সফিউদ্দিন	মৃত সমতুল্লা মন্ডল	কাটনার পাড়া, বগুড়া
৬৪.	সেকেন্দার আলী	তরিকুল্যা মন্ডল	সেউজগাড়ী, বগুড়া
৬৫.	সামছউদ্দিন আহমেদ	ফয়েজ উদ্দিন	সুলতানগঞ্জপাড়া, বগুড়া
৬৬.	আঃ সাত্তার	মৃত রইছ উদ্দিন প্রাং	কাটনার পাড়া, বগুড়া
৬৭.	গোলাম মোহাম্মদ পাইকার (খোকন)	আলহাজ্ব এস.এম পাইকার	জলেশ্বরীতলা, বগুড়া
৬৮.	কাবুল আহম্মেদ	-	ঠনঠনিয়া, বগুড়া
৬৯.	তবিবর রহমান	-	উত্তর চেলোপাড়া, বগুড়া
৭০.	আঃ ওয়াহেদ (লতু খলিফা)	মৃত ওয়াহাব খলিফা	বাদুরতলা, বগুড়া
৭১.	ওবায়দুর রহমান (অদু)	খয়বর রহমান উদ্দিন শেখ	কানছগাড়ী, বগুড়া
৭২.	মোঃ টুকু তরফদার	হাতেম আলী তরফদার	কুটুরবাড়ি, রাজাপুর

উপজেলা সারিয়াকান্দি

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ সিরাজুল হক	মোঃ সৈয়দ আলী মন্ডল	গ্রাম : সোনাতলা, পোঃ নিউ সোনাতলা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
২.	মোঃ মোজাম্মেল হক মোল্লা	মোঃ আজিম উদ্দিন মোল্লা	গ্রাম : সাতবেকী, পোঃ হরিখালী, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
৩.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ চাঁদ মিয়া মন্ডল	গ্রাম : পাকুল্লা, পোঃ পাকুল্লা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
৪.	মোঃ মাহমুদুল আলম খান (চান্দু)	মোঃ আঃ সালেক খান	গ্রাম : রৌহাদহ, পোঃ চন্দনবাইশা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
৫.	মোঃ মোজাফফর রহমান আকন্দ	মোঃ নজিবর রহমান	গ্রাম : ফাটাখালি, পোঃ রামচন্দ্রপুর, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
৬.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মোঃ আমিন উদ্দিন ফকির	গ্রাম : বালুয়াতাইড়, পোঃ হাটফুলবাড়ী, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
৭.	মোঃ আঃ হামিদ	মৌঃ মোঃ জায়তুল্লা প্রাং	গ্রাম : উচুাভাংগা, পোঃ মথুরাপাড়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
৮.	মোঃ তবিবর রহমান	মোঃ আঃ মালেক সরকার	গ্রাম : তালতলা, পোঃ চন্দনবাইশা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
৯.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত নওসের আলী	গ্রাম : বোহাইল, পোঃ চন্দনবাইশা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।
১০.	আঃ ছাত্তার মন্ডল	মৃত তফিজ উদ্দিন মন্ডল	গ্রাম : হাটফুলবাড়ী, পোঃ হাটফুলবাড়ী, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা শিবগঞ্জ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	হাফিজার রহমান সেখ	মোঃ খেজমতুল্লাহ সেখ	গ্রাম : সালুল্যাপুর, পোঃ পুজিয়া, উপজেলা : শিবগঞ্জ, বগুড়া।
২.	আব্দুল বারী (ধলু)	ডাঃ বাহার উদ্দিন	বাঘোরপাড়া, উত্তরপাড়া, গোকুল, বগুড়া
৩.	হাবিবুর রহমান মন্ডল	-	-
৪.	মতিয়ার রহমান খোকা	বাহার উদ্দিন	রামশহর

উপজেলা নন্দীগ্রাম

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ ছমির উদ্দিন মন্ডল	মোঃ খোকা মন্ডল	গ্রাম ও উপজেলা : নন্দীগ্রাম, বগুড়া।
২.	মোঃ আব্দুর রশিদ	জসিম উদ্দিন আহম্মেদ	গ্রাম : হাটকড়ই, পোঃ হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া।
৩.	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	আলহাজ্ব মোঃ বাহতুল্লাহ প্রাং	গ্রাম : বাদনাশন, পোঃ কুন্দারহাট, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া।
৪.	মোঃ আকরাম হোসেন সরকার	মোঃ ফদমতুল্লাহ সরকার	গ্রাম : ঢাকলামা, পোঃ কন্দুরহাট, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া।
৫.	আঃ মজিদ	মোঃ আব্দুল সোবাহান শেখ	গ্রাম : নাগড়া, পোঃ ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া।
৬.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত জসিম উদ্দিন আহমেদ	গ্রাম : হাটকড়ই, পোঃ হাটকড়ই, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া।

উপজেলা কাহালু

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ আলী রেজা	মোঃ গোলাম মোস্তফা	গ্রাম : খানপূজা, পোঃ তালোড়া, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

উপজেলা জয়পুরহাট

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ আলী রেজা	মোঃ গোলাম মোস্তফা	গ্রাম : খানপূজা, পোঃ তালোড়া, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।
২.	মোঃ নাজির হোসেন	অছির ফকির	কুজির শহর, ভান্ডশা, বগুড়া।
৩.	মফিজ উদ্দিন	মৃত ছফির উদ্দিন	ছাওয়ালপাড়া, বগুড়া।
৪.	আঃ রশিদ	মৃত বশরত আলী মন্ডল	দত্তপাড়া, জয়পুরহাট, বগুড়া।
৫.	নায়েক আব্দুর রউফ	মোঃ আঃ রশিদ খান	কেশবপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা আক্কেলপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোখলেছার রহমান	সফির উদ্দিন মন্ডল	শিয়ালা কশিরা, আক্কেলপুর, বগুড়া
২.	এ.কে.এম ফজলুল করিম	হাজী আঃ রহিম মণ্ডল	আক্কেলপুর, বগুড়া
৩.	আইন উদ্দিন	ছহির উদ্দিন	শিয়ারীগ্রাম, কাশিয়া, বগুড়া
৪.	সিপাহী আঃ জব্বার	মৃত গুমির উদ্দিন	কাঠালবাড়ী, জমারপুর, বগুড়া
৫.	সিপাহী মোঃ আজিম উদ্দিন	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	সাহাপুর, জামালগঞ্জ, বগুড়া

উপজেলা পাঁচবিবি

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	আলীমুদ্দিন	মৃত সাহার উদ্দিন সরকার	বাগজানা, বগুড়া
২.	মোজাম উদ্দিন	ঐ	ঐ
৩.	লোকমান হোসেন	মৃত কাদের আলী মন্ডল	পশ্চিমকৃষ্ণপুর, আয়মায়সুলপুর, বগুড়
৪.	সোলায়মান আলী	মৃত উমির আলী মন্ডল	রামভদ্রপুর, বাগজানা, বগুড়া
৫.	ল্যাঃ নায়েক লুৎফর রহমান	সাহাব উদ্দিন আহাম্মদ	সান্তাহার, গোপিনাথপুর, বগুড়া
৬.	নায়েক ফজলুর রহমান	আব্বাস আলী	রতনপুর, পাঁচবিবি, বগুড়া

উপজেলা ক্ষেতলাল

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোঃ আফজাল হোসেন	আঃ জব্বার	মুলগ্রাম, ক্ষেতলাল, বগুড়া

তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম
জয়পুরহাট পৌরসভা

জেল : জয়পুরহাট সদর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১.	মোঃ শফিকুল আলম	মৃত সবির উদ্দিন	আরাফাতনগর	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৪৫
২.	শ্রী জিতেন্দ্রনাথ মন্ডল	শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল	ওয়ার্ড নং ৯ পৌরসভা	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৫১
৩.	মৃত সহদেব ঠাকুর	মৃত তনয় ঠাকুর	শান্তিনগর	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৭০
৪.	মোঃ মজিবুল হক (মজনু)	মৃত ইমান উদ্দিন বিশ্বাস	মাস্টারপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৫৭
৫.	মৃত শেখ সুবেদ আলী	মৃত ইয়াদ আলী	মাস্টারপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১১৮
৬.	মোঃ মোফাজ্জেল রহমান মোল্লা	মৃত হারেজ উদ্দিন মোল্লা	দক্ষিণাপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৬৬
৭.	মোঃ আবুল হাসনাত চৌধুরী	মৃত আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী	ওয়ার্ড নং-৮	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৭৬
৮.	মোঃ এনামুল হক সরকার	মৃত ডাঃ ইব্রাহিম সরকার	মাস্টারপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৭৯
৯.	মৃত আবদুর রশিদ	মৃত আবদুল লতিফ বেপারী	আদর্শপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৮৯
১০.	আহমেদ আলী মন্ডল	মৃত আলিম উদ্দিন মন্ডল	বিশ্বাসপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৭০
১১.	মৃত হুজুর আলী শেখ	মৃত নজর আলী শেখ	সাহেবপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	জাতীয় তালিকা ২য় খণ্ড-১৪
১২.	মৃত শাকিল উদ্দিন আহমেদ	মৃত এরশাদ আলী	শান্তিনগর	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১২০

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	নয়হুন গোলাম মোস্তফা	মৃত মোকলেছুর রহমান	জামালগঞ্জ সড়ক	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১১৭
১৪.	কে.এম আনোয়ার হোসেন	মৃত কে.এম আতোয়ার হোসেন	জয়পুরহাট চিনিকল	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৪৪
১৫.	বিকাশ চন্দ্র মন্ডল	শ্রী ব্রজলাল মন্ডল	খনজনপুর	খনজনপুর	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৬১
১৬.	মোঃ আবদুর রউফ	মৃত আবদুর রহিম	বিশ্বাসপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১২২
১৭.	মোঃ ফজির উদ্দিন খান	মোঃ আবদুল আজিজ খান	শান্তিনগর	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৭৪
১৮.	শহীদ আবদুর রউফ	মোঃ আবদুর রশিদ বেপারী	বিশ্বাসপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৪৭
১৯.	মোঃ মোফলেহুর রহমান	মৃত মালেক উদ্দিন মন্ডল	ধানমন্ডি মোড়	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১২১
২০.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	বিশ্বাসপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৫৪
২১.	মোঃ একরামুল হক	মৃত ডাঃ ইব্রাহিম হোসেন	মাস্টারপাড়া	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৬৯
২২.	মোঃ গোলাম সরোয়ার	মৃত আজগর আলী মন্ডল	সবুজ নগর	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১২৩
২৩.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মৃত ময়েজ উদ্দিন মন্ডল	শান্তিনগর	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৪৮
২৪.	মোঃ আদেশ আলী সোনার	মৃত আয়েজ উদ্দিন সোনার	থানপুর	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৫৭
২৫.	মোঃ খয়বর আলী মিয়া	মৃত করিম বক্স মিয়া	হাড়াইল (বাবুপাড়া)	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১৭৫
২৬.	শ্রী বাদল চন্দ্র মহন্ত	মৃত পরমেশ্বর	বুলুপাড়া (থানকুড়া)	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৬৮
২৭.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত তালেব উদ্দিন মিঞা	হাড়াইল (বাবুপাড়া)	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০০৫৬
২৮.	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	মোঃ খয়ের হোসেন	পাঁচুর চক (থানপুর)	হানাইল মাদ্রাসা	জয়পুরহাট	০৩০৭০১০১০২

উপজেলা : জয়পুরহাট সদর
ইউনিয়ন : ধলাহার

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
২৯.	সন্তোষ মুরমু	রাজেন মুরমু	ভানাইকুশলিয়া	বিষ্ণুপুর	ধলাহার	০৩০৭০১০১৪১
৩০.	মোঃ নাসির উদ্দিন মন্ডল	মৃত ইসমতুল্লা মন্ডল	আটটোকা	ধলাহার	ধলাহার	০৩০৭০১০১২৪
৩১.	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	মৃত জামির বক্স	ধলাহার	ধলাহার	ধলাহার	০৩০৭০১০১৪৮
৩২.	মোঃ আবদুর রাজ্জাক	মৃত তমিজ উদ্দিন মন্ডল	ধলাহার	ধলাহার	ধলাহার	০৩০৭০১০১৫০
৩৩.	মোঃ মফিজ উদ্দিন প্রাং	মহির উদ্দিন প্রাং	নিক্তিপাড়া	বিষ্ণুপুর	ধলাহার	০৩০৭০১০১৫৬
৩৪.	মৃত মোঃ রোস্তম আলী	মৃত মোঃ ভোমেজ উদ্দিন	খানুইকুশলিয়া	বিষ্ণুপুর	ধলাহার	০৩০৭০১০১৭২
৩৫.	দেওয়ান আবদুল আজিজ	মৃত দায়াজুল ইসলাম দেওয়ান	চাঁদপুর	চাঁদপুর	ধলাহার	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-২
৩৬.	মৃত ইলিয়াস উদ্দিন	মৃত নইম উদ্দিন	খাস পাহনন্দা	বিষ্ণুপুর	ধলাহার	০৩০৭০১০০৮৩
৩৭.	মোঃ আনছার আলী	মৃত আলীমদ্দিন মন্ডল	চাঁদপুর	চাঁদপুর	ধলাহার	০৩০৭০১০০৭৩
৩৮.	শ্রী পদ্ম রবিদাস	মৃত শিবুয়া রবিদাস	ঝালিয়াতের	ধলাহার	ধলাহার	০৩০৭০১০১৬১
৩৯.	মোঃ মোশারফ হোসেন দেওয়ান	মৃত আব্বাছ আলী দেওয়ান	মাধাইনগর	ধলাহার	ধলাহার	জাতীয় তালিকা ২য় খণ্ড-২৫
৪০.	মোঃ মফিজ উদ্দিন মন্ডল	মৃত হলা মন্ডল	চাঁদপুর	চাঁদপুর	ধলাহার	০৩০৭০১০০৯৭

উপজেলা : জয়পুরহাট সদর
ইউনিয়ন : দোগাছী

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৪১.	শ্রী বুদু মুন্ডা	মৃত পোয়া মুন্ডা	বুজরুক ভারুনিয়া	খনজনপুর	দোগাছী	০৩০৭০১০১৫৫
৪২.	শ্রী নারায়ন চন্দ্র মন্ডল	মৃত বিনোদ বিহারী মন্ডল	খিয়ট	দরগাতলা হাট	দোগাছী	জাতীয় তালিকা ২য় খণ্ড-২২
৪৩.	মোঃ লোকমান হোসেন	মৃত ফিরাজ উদ্দিন	ইছুয়া	মঙ্গলবাড়ী	দোগাছী	০৩০৭০১০১০৯
৪৪.	মাহবুব চৌধুরী	জসীমদ্দিন চৌধুরী	পশ্চিম পেঁচুলিয়া	মঙ্গলবাড়ী	দোগাছী	মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

						ট্রাস্ট ৪৩৯২৩
৪৫.	মোঃ মনির উদ্দিন মন্ডল	মৃত মাঙ্গারু মন্ডল	ডালিম্বা	মঙ্গলবাড়ী	দোগাছী	০৩০৭০১০০৭৩
৪৬.	শ্রী সুরেস চন্দ্র সরদার	শ্রী চারু সরদার	ঘাসুরিয়া	দরগাতলীহাট	দোগাছী	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-৩৮
৪৭.	মোঃ নেজাম উদ্দিন মন্ডল	মৃত সিরাজ উদ্দিন মন্ডল	পৈচুলিয়া	চকভারুনিয়া	দোগাছী	০৩০৭০১০০৭৯
৪৮.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত কিনা মন্ডল	দোগাছী	দরগাতলাহাট	দোগাছী	০৩০৭০১০০৭৪
৪৯.	মোঃ মোকছেদ আলী	মৃত তায়েজ উদ্দিন মন্ডল	জিতারপুর	চকভারুনিয়া	দোগাছী	০৩০৭০১০১১০
৫০.	মৃত অজিত চন্দ্র মন্ডল	মৃত মুরারী চন্দ্র মন্ডল	ঘাসুরিয়া	খনজনপুর	দোগাছী	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-৫
৫১.	মোঃ মোয়াল্লেস হোসেন	মৃত আজমত আলী	চকভারুনিয়া	চকভারুনিয়া	দোগাছী	০৩০৭০১০০৭৬

উপজেলা : জয়পুরহাট সদর
ইউনিয়ন : দোগাছী

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৫২.	মোঃ জমির উদ্দিন মন্ডল	মৃত আয়েজ উদ্দিন মন্ডল	বড়মাঝিপাড়া	ছোটমাঝিপাড়া	ভাদসা	০৩০৭০১০১৭৮
৫৩.	মোঃ আবদুল আজিজ	মোঃ হবিবর রহমান মন্ডল	বাঁশকাটা	ঐতিহাসিক পাহাড়পুর	ভাদসা	০৩০৭০১০০৩৯
৫৪.	শ্রী সুনীল মন্ডল	মৃত রাজেশ্বর মন্ডল	ছাওয়ালপাড়া	জয়পারবর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১০৫
৫৫.	মোঃ ওসমান আলী মন্ডল	মৃত রহিম বকস মন্ডল	ভাদসা	জয়পারবর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৩১
৫৬.	ঝুন্টু কুমার মন্ডল (সুকুমার)	রাজেন্দ্রনাথ মন্ডল	পালী	নারায়নপাড়া	ভাদসা	০৩০৭০১০০৩৩
৫৭.	শহীদ তফিজ উদ্দিন	মৃত ছফির উদ্দিন	গোপালপুর	জয়পারবর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৩৪
৫৮.	মোঃ আতুল হোসেন	মৃত মেছের উদ্দিন মন্ডল	বাঁশকাটার	ঐতিহাসিক পাহাড়পুর	ভাদসা	০৩০৭০১০০৪৩
৫৯.	মোঃ মিজানুর রহমান	মৃত নুরুল হুদা	ভাদসা	জয়পায়বর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৫৯
৬০.	শহীদ নাজির হোসেন	মৃত আছির ফকির	ফুজিশহর	জয়পারবর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৩৬
৬১.	মোঃ রমজান আলী	মৃত শফি সোনার	মালয়পুর	জয়পারবর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৭৭
৬২.	মোঃ নিজাম উদ্দিন	মৃত গালা সোনার	মালয়পুর	জয়পায়বর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০০৩৫
৬৩.	মোঃ ইউনুছার রহমান	মৃত ইব্রাহিম আলী সরদার	ফদমগাছী	জয়পারবর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০০৪১
৬৪.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত ছহির উদ্দিন	বড়মাঝিপাড়া	জয়পায়বর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৩৫
৬৫.	মোঃ সেলেমান	আকবর আলী	ভাদসা	জয়পারবর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৩০
৬৬.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত পবন উদ্দিন মন্ডল	পালী	নারায়নপাড়া	ভাদসা	০৩০৭০১০০৩৬
৬৭.	মৃত সেলিম উদ্দিন	মৃত তাছির উদ্দিন	নুরপুর	জয়পায়বর্তীপুর	ভাদসা	০৩০৭০১০১৩২

উপজেলা : জয়পুরহাট সদর
ইউনিয়ন : মোহাম্মদাবাদ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৬৮.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত নেওয়াজ উদ্দিন	বেলআমলা	বেলআমলা	মোহাম্মদাবাদ	০৩০৭০১০১০৭
৬৯.	মোঃ আবদুস সামাদ	মৃত আয়নুল হক সরদার	পারুলিয়া	বেলআমলা	মোহাম্মদাবাদ	০৩০৭০১০১২৯
৭০.	মোঃ আনিছুর রহমান	মৃত আজগর আলী দেওয়ান	বেলআমলা	বেলআমলা	মোহাম্মদাবাদ	জাতীয় তালিকা ২নয় খণ্ড-৩

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা : জয়পুরহাট সদর
ইউনিয়ন : জামালপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৭১.	শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার	মৃত শ্রীরাম চন্দ্র সরকার	দাররা জন্তিগ্রাম	সুক্তাহার	জামালপুর	০৩০৭০১০০১৩
৭২.	মৃত মোফাজ্জল হোসেন	মৃত করিম বক্স মোল্লা	দাদরা জন্তিগ্রাম	নারায়নপাড়া	জামালপুর	০৩০৭০১০০১০
৭৩.	মোঃ আবদুল রহিম সরদার	মৃত তাছের উদ্দিন সরদার	সাহাপুর	নারায়নপাড়া	জামালপুর	০৩০৭০১০০০৮
৭৪.	শহীদ আজিম উদ্দিন	মৃত রিয়াজ উদ্দিন সরকার	সাহাপুর	নারায়নপাড়া	জামালপুর	০৩০৭০১০১৩৭
৭৫.	মোঃ সাইদুর রহমান সরদার	মৃত সমশের আলী সরদার	সাহাপুর	জামালগঞ্জ	জামালপুর	০৩০৭০১০০১৪
৭৬.	মোঃ তায়েজ উদ্দিন	মৃত তছির উদ্দিন	সাহাপুর	জামালগঞ্জ	জামালপুর	০৩০৭০১০০০৯

উপজেলা : জয়পুরহাট সদর
ইউনিয়ন : পুরানাপৈল

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৭৭.	জি.এন দাস	মৃত নলিনী কান্ত দাস	বনখুর		পুরানাপৈল	০৩০৭০১০১৬৯
৭৮.	মৃত সন্তোষ কুমার	মৃত হরেন্দ্রনাথ মন্ডল	শ্যামপুর		পুরানাপৈল	০৩০৭০১০০০৬
৭৯.	মৃত মথুর চন্দ্র মহন্ত	মৃত প্রকান্ত মহন্ত	বনখুর		পুরানাপৈল	০৩০৭০১০০০৭
৮০.	শ্রী ডিজেন্দ্রনাথ	মৃত বসন্ত সরকার	শ্যামপুর		পুরানাপৈল	০৩০৭০১০০০৪
৮১.	মোঃ মমতাজুল ইসলাম	মৃত জমির উদ্দিন	পুরানাপৈল		পুরানাপৈল	০৩০৭০১০১০৮
৮২.	শ্রী সন্তোষ কুমার মন্ডল	মৃত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল	শ্যামপুর		পুরানাপৈল	০৩০৭০১০০০৩
৮৩.	শ্রী অজিত চন্দ্র দাস	মৃত অক্ষয় চন্দ্র দাস	চিরলা	চকবরকত	চকবরকত	০৩০৭০১০০৮৮
৮৪.	মোঃ এনতেজার রহমান	আলহাজ্ব মোঃ গোলাম হোসেন	ভুটিয়াপাড়া	ভুটিয়াপাড়া	চকবরকত	০৩০৭০১০১১৩
৮৫.	মৃত রিয়াজ উদ্দিন সরদার	মৃত রহিম বকস সরদার	জগদীশপুর	ভুটিয়াপাড়া	চকবরকত	০৩০৭০১০১৪৯
৮৬.	সুখোল চন্দ্র বর্মণ	মৃত গুপিনাথ বর্মণ	রাজনগর	জাতফোটা	চকবরকত	০৩০৭০১০১১৪
৮৭.	মৃত আবদুস সাত্তার	মোঃ আলীমদ্দিন	পাহনন্দা	চকবরকত	চকবরকত	০৩০৭০১০১৪০
৮৮.	মোঃ ফজেল উদ্দিন সোনার	মৃত মনছের আলী সোনার	চকবরকত	চকবরকত	চকবরকত	০৩০৭০১০০৯৯
৮৯.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত ওয়াজ মিয়া মন্ডল	চকবরকত	চকবরকত	চকবরকত	০৩০৭০১০১৪২
৯০.	মৃত আতাউর রহমান মন্ডল	মৃত ময়েজ উদ্দিন মন্ডল	চকবরকত	চকবরকত	চকবরকত	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-৩৩
৯১.	মোঃ সামছুর রহমান	মোঃ ছাইফুল ইসলাম	দোগর	ভুটিয়াপাড়া	চকবরকত	০৩০৭০১০১৬৩
৯২.	শ্রী অনীল চন্দ্র মন্ডল	মৃত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল	ইছুয়ানওপাড়া	মাল্লিকপুর	চকবরকত	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-৪৫
৯৩.	মোঃ নিজানুর রহমান	মৃত কোবাদ হোসেন	চক উজাল	ভুটিয়াপাড়া	চকবরকত	০৩০৭০১০০১২
৯৪.	মোঃ আবদুল জব্বার মন্ডল	মৃত কাদের বকস মন্ডল	চকবরকত	চকবরকত	চকবরকত	জাতীয় তালিকা ২য় খণ্ড-২৬
৯৫.	মোঃ আবদুল হাকিম মন্ডল	মোঃ আফতাব উদ্দিন মন্ডল	ভুটিয়াপাড়া	ভুটিয়াপাড়া	চকবরকত	০৩০৭০১০০০৫
৯৬.	মোঃ ওসমান গনি মন্ডল	মৃত ধন বকস মন্ডল			চকবরকত	০৩০৭০১০০০২
৯৭.	মোঃ আবদুল হামিদ সরদার	মৃত করিম বকস সরকার	জগদীশপুর	ভুটিয়াপাড়া	চকবরকত	০৩০৭০১০১৩৮
৯৮.	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মৃত সাধু মন্ডল	চিরলা	চকবরকত	চকবরকত	০৩০৭০১০১৮০
৯৯.	মোখলেছুর রহমান চৌধুরী	মৃত কোবাদ হোসেন চৌধুরী	চকউজাল	ভুটিয়াপাড়া	চকবরকত	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম
পাঁচবিবি পৌরসভা

উপজেলা : পাঁচবিবি

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১.	মোঃ কায়সার রহমান	মৃত শরিফ উদ্দিন	দানেজপুর	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১২৯
২.	মোঃ জলিলুর রহমান	মৃত আলী মামুদ	দানেজপুর	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৩১
৩.	মোঃ আবদুর রব বুলু	মৃত রহিম বকস মন্ডল		পাচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৩০
৪.	খন্দকার শামিম আহমেদ মোহন	খন্দকার বজলার রহমান	বালিঘাটা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৩২
৫.	এ.বি.এম মোজাম্মেল আজিজ	মোঃ আবু তালেব মন্ডল	বালিঘাটা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৩৪
৬.	মৃত খন্দকার মছির উদ্দন	মৃত জায়েদ উদ্দিন খন্দকার	দমদমা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৪৬
৭.	মোঃ আবদুল কাদের	আছমদ্দিন	বালিঘাটা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৪৭
৮.	শ্রী দিলিপ কুমার	মৃত এতোয়া উড়াও	গোপালপুর	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০০৯৬
৯.	শ্রী বিমল সিং	মৃত ফাঁদ সিং	গোপালপুর	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০০১১
১০.	মোঃ আবদুল মান্নান বাবলু	মোঃ আবদুল মমিন মন্ডল	পশ্চিম বালিঘাটা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৫৬
১১.	মরহুম ডাঃ সাইদুর রহমান	মৃত হাজী আমির উদ্দিন	বালিঘাটা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০১৬১
১২.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত আরজ আলী	পূর্ব বালিঘাটা	পাচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০০৯৩
১৩.	মোঃ বছির উদ্দন	মৃত করম বকস	করট্রি	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০০৯৫
১৪.	মোঃ আবদুল মান্নান শেখ	মৃত মাজু শেখ	দমদমা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	০৩০৭০২০০৯৭
১৫.	মৃত ডাঃ তালেবুর রহমান চৌধুরী	মৃত আয়েজ উদ্দিন	দানেজপুর	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	জাতীয় তালিকা নং-১ম খণ্ড-৫
১৬.	মোঃ এরশাদুল মোস্তফা		বালিঘাটা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	জাতীয় তালিকা নং-১ম খণ্ড-৯০
১৭.	মোঃ আঃ কাইয়ুম	মৃত ওমর আলী	বালিঘাটা	পাঁচবিবি	পাঁচবিবি	জাতীয় তালিকা নং-২য় খণ্ড-৭

উপজেলা : পাঁচবিবি
ইউনিয়ন : বালিঘাটা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১৮.	মহির উদ্দিন	আফাজ উদ্দিন	পাটাবুকা	পাঁচবিবি	বালিঘাটা	০৩০৭০২০১৬৬
১৯.	হাসিম উদ্দিন	মৃত জমির উদ্দিন	মাধখুর	পাঁচবিবি	বালিঘাটা	০৩০৭০২০১৪০
২০.	মৃত নসির উদ্দিন	মৃত নিয়ত আলী	সীতা মাধখুর	পাঁচবিবি	বালিঘাটা	০৩০৭০২০১৩৮
২১.	শ্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র মাহাতো	মৃত সহদেব মাহাতো	বীরনগর	বীরনগর	বালিঘাটা	০৩০৭০২০০৯৮
২২.	শ্রী ধরেন মাহাতো	মৃত হরিয়া মাহাতো	বীরনগর	বীরনগর	বালিঘাটা	০৩০৭০২০১০০
২৩.	শ্রী বিমল মাহাতো	মৃত বালেক রাম মাহাতো	বীরনগর	বীরনগর	বালিঘাটা	০৩০৭০২০১০১
২৪.	মোঃ মীর নাসুদার রহমান মন্ডল	মোঃ মীর কাশেম মন্ডল	খাসবাগুড়ী	পাঁচবিবি	বালিঘাটা	জাতীয় তালিকা ২য় খণ্ড-৫
২৫.	মোঃ কফিল উদ্দিন দেওয়ান	মৃত কেরামত আলী দেওয়ান	দমদমা	পাঁচবিবি	বালিঘাটা	০৩০৭০২০১৫৫
২৬.	আবদুস সামাদ	আঃ রহমান প্রামাণিক	সুলতানপুর	বীরনগর	বালিঘাটা	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা : পাঁচবিবি
ইউনিয়ন : ধরঞ্জি

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
২৭.	মোঃ শাহার উদ্দিন মন্ডল	মৃত আলা বক্স	শ্রীমন্তপুর	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০০২
২৮.	মোঃ ওসমান আলী	মৃত বশির উদ্দিন	শ্রীমন্তপুর	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০০৫
২৯.	মোঃ মহির উদ্দিন	মোঃ লফোর উদ্দিন	চকশিমুলিয়া	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০০৬
৩০.	মোঃ আবদুল খালেক	মৃত ছৈমদ্দীন	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০০৭
৩১.	শ্রী ধীরেন পাহান	মৃত ঠকরা পাহান	নন্দইল	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০০৮
৩২.	শহীদ ফজলুর রহমান	মৃত আব্বাস আলী	রতনপুর	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০১৯
৩৩.	শহীদ সোলাইমান আলী	মৃত জমির উদ্দিন	উচনা	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০২০
৩৪.	মোঃ আজাহার	মৃত সুধন মন্ডল	হাটখোলা	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৩৬
৩৫.	মোঃ দুলাল হোসেন	মৃত নাদের আলী	রতনপুর	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৩৯
৩৬.	মৃত তৈয়ব আলী	মৃত আহমেদ আলী	রতনপুর	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৪১
৩৭.	মোঃ আবুল খায়ের মন্ডল	মৃত কাঁচা মিয়া মন্ডল	পাড়ইল	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৫১
৩৮.	মোঃ আঃ ছাত্তার	মৃত জোবায়দুল হক	রামপুর	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৫৩
৩৯.	শ্রী মঙ্গল চন্দ্র	মৃত হাওরা উড়াও	রুপাপুর	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৫৪
৪০.	মোঃ জমির উদ্দিন	মৃত আছির উদ্দিন	কাঁচনা	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৮৯
৪১.	মোঃ ছামেদ আলী	মৃত ছৈতুল্যা প্রামাণিক	রতনপুর	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১৬০
৪২.	মোঃ বক্তার আলী	মৃত মহর উদ্দিন	শ্রীমন্তপুর	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-২৭
৪৩.	মোঃ তজোব আলী	মৃত ঝড়ু মন্ডল	উচনা	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১১১
৪৪.	শ্রী সুকটা পাহান	মৃত চেন্দু পাহান	শ্রীমন্তপুর	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১১২
৪৫.	মোঃ ইউনুস আলী	মৃত বছির ফকির	রায়পুর	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১১৩
৪৬.	মোঃ দবিবুর রহমান	মৃত হাইতুল্যা মন্ডল	পলাশগড়	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১১৪
৪৭.	শ্রী কার্তিক চন্দ্র	মৃত রামেন্দ্র	উচনা	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১১৯
৪৮.	শ্রী বিরেন	মৃত জগবন্ধু	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১২৩
৪৯.	শ্রী বিশ্বনাথ বর্মণ	মৃত কেদার বর্মণ		ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১২৪
৫০.	শহীদ শরিফ উদ্দিন	মৃত আমেজ আলী	কাঁচনা	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০১৩৬
৫১.	মোঃ নিজাম উদ্দিন	মৃত সিরাজ উদ্দিন	শ্রীমন্তপুর	ধরঞ্জি	ধরঞ্জি	জাতীয় তালিকা ১ম খণ্ড-৩৪
৫২.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত ফছিমদ্দিন	পলাশগড়	কোতোয়ালীবাগ	ধরঞ্জি	০৩০৭০২০০৯৪
৫৩.	মোঃ ছাবেদ আলী	মৃত আইন উদ্দিন	রামচন্দ্রপুর	বাগজানা	বাগজানা	০৩০৭০২০১৫৪
৫৪.	মোঃ আঃ ছাত্তার	মৃত আছের আলী	ভুইভোবা	বাগজানা	বাগজানা	০৩০৭০২০০২২
৫৫.	মৃত আনসার আলী	মৃত আহম্মদ আলী	উত্তর গোপালপুর	বাগজানা	বাগজানা	০৩০৭০২০০১৪
৫৬.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খান	মৃত শুকুর আলী	ভুইভোবা	বাগজানা	বাগজানা	০৩০৭০২০০২৪
৫৭.	মোঃ আবদুল হামিদ	মোঃ কলিম উদ্দিন মন্ডল	রামচন্দ্রপুর	বাগজানা	বাগজানা	০৩০৭০২০০৬৭
৫৮.	মোঃ মজিবর রহমান মন্ডল	মৃত শরিফ উদ্দিন	চেঁচড়া	বাগজানা	বাগজানা	০৩০৭০২০১৬৪

উপজেলা : পাঁচবিবি
ইউনিয়ন : আয়মারসুলপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৫৯.	শহীদ লোকমান হোসেন	মৃত কছের আলী মন্ডল	পশ্চিম কৃষ্ণপুর	পাঁচবিবি	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০০২৮
৬০.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত মমতাজ মিয়া	পশ্চিম কড়িয়া	কড়িয়া	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০০৬৩
৬১.	মোঃ হাদিউজ্জামান	মৃত আয়েন উদ্দিন	রসুলপুর	বিষ্ণপুর	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০০৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৬২.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত মহির উদ্দিন মন্ডল	আগাইর	বিষ্ণপুর	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০১২৮
৬৩.	মোঃ আঃ মালেক	মৃত আঃ গফুর মন্ডল	মালিলহ	পাঁচবিবি	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০১৩৫
৬৪.	মোঃ হাফিজুর রহমান হাফু	মৃত সাহার উদ্দিন মন্ডল	দক্ষিণ জামালপুর	বিষ্ণপুর	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০১৫৩
৬৫.	মোঃ ময়েজ মন্ডল	মৃত আকবর আলী	কড়িয়া	কড়িয়া	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০১৬৫

উপজেলা : পাঁচবিবি
ইউনিয়ন : কুসুম্বা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৬৬.	শ্রী লরেস মার্ডি	শ্রী ফ্রান্সি মার্ডি	বেলপুকুর	আটাপুর	কুসুম্বা	০৩০৭০২০০৮০
৬৭.	শ্রী মহাদেব মিনজী	মৃত খিতলা মিনজী	কদমপুকুর	আটাপুর	আয়মারসুলপুর	০৩০৭০২০০৮৫
৬৮.	মৃত সানচু উড়াও	মৃত বির্সা উড়াও	বায়কান্দি	সয়াইল	মোহাম্মদপুর	০৩০৭০২০০৮৩
৬৯.	মৃত শ্রী চরন বর্মণ	মৃত রমেশ্বর বর্মণ	রশিদপুর	শিকরাদিঘী	মোহাম্মদপুর	জাতীয় তালিকা ২য় খণ্ড-১০
৭০.	শ্রী অক্ষয় সিং	মৃত লাচু সিং	আটাপুর	উচাই	আটাপুর	০৩০৭০২০০৮৪
৭১.	মোঃ হাফিজুর রহমান হাফু	মৃত সাহার উদ্দিন মন্ডল	দক্ষিণ জামালপুর	উচাই	আটাপুর	০৩০৭০২০০৭৯
৭২.	মোঃ ময়েজ মন্ডল	মৃত আকবর আলী	কড়িয়া	উচাই	আটাপুর	০৩০৭০২০০৮৬
৭৩.	মৃত রঘুনাথ মাহাতো	মৃত বিজিয়া মাহাতো	খিড়পাথার	উচাই	আটাপুর	০৩০৭০২০১০৬

তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম

উপজেলা : ক্ষেতলাল
ইউনিয়ন : ক্ষেতলাল সদর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১.	শ্রী অরুন কুমার দাস	মৃত নিরিন্দ্রনাথ দাস	দিঘীরপাড়া	ক্ষেতলাল	ক্ষেতলাল	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-২৬
২.	মোঃ আশরাফ আলী মন্ডল	মৃত দেয়াজ উদ্দিন মন্ডল	কোড়লগাড়ী	ক্ষেতলাল	ক্ষেতলাল	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-২৪
৩.	মোঃ আবদুল মজিদ তরফদার	মৃত জাসিমউদ্দিন তরফদার	দাশড়া মালিগাড়ী	ক্ষেতলাল	ক্ষেতলাল	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-৩৯
৪.	মৃত নূরুল ইসলাম তালুকদার	মৃত তৈমুর হোসেন তালুকদার	ক্ষেতলাল সদর	ক্ষেতলাল	ক্ষেতলাল	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-১৪
৫.	মোঃ আবু রেজা আতাউল্যাহ	মৃত কলিমুজ্জামান চৌধুরী	স্নানপুরা	ক্ষেতলাল	ক্ষেতলাল	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-৩০

উপজেলা : ক্ষেতলাল
ইউনিয়ন : মানুদপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৬.	মোঃ নাসির উদ্দিন	মৃত শরিফ উদ্দিন মন্ডল	আমিয়া	সোনামুখী	মানুদপুর	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-৩৫
৭.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত ইয়াচিন আলী সরদার	মহব্বতপুর	জামালগঞ্জ		০৩০৭০৪০০১৩

Dhaka University Institutional Repository

৮.	শ্রী অজিত কুমার সরকার	মৃত মহিন্দ্রনাথ সরকার	রসুলপুর	মামুদপুর		০৩০৭০৪০০১১
৯.	শ্রী বনমালী ঘোষ	মৃত দিলু ঘোষ	জিয়াপুর	জামালগঞ্জ		জাতীয় তালিকা-২য় খন্ড-১১

উপজেলা : ক্ষেতলাল
ইউনিয়ন : বড়তারা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১০.	মোঃ মোফলেছার রহমান	মৃত মেহের উদ্দিন	তিলাবদুল	বানিয়াপাড়া	বড়তারা	০৩০৭০৪০০৩৪
১১.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মৃত আলেফ উদ্দিন মন্ডল	তিলাবদুল	বানিয়াপাড়া	বড়তারা	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-৭
১২.	মোঃ আবদুর রশিদ মন্ডল	মৃত ছমির উদ্দিন মন্ডল	নাজিরপাড়া	উত্তর হাটশহর	বড়তারা	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-১৪

উপজেলা : ক্ষেতলাল
ইউনিয়ন : বড়াইল

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১৩.	মোঃ আবদুল মান্নান মন্ডল	মৃত মোশারফ হোসেন মন্ডল	হিন্দা পাঁচখুপী	হিন্দা কসবা	বড়াইল	জাতীয় তালিকা-১ম খন্ড-২২

উপজেলা : ক্ষেতলাল
ইউনিয়ন : আলমপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১৪.	মোঃ লোকমান হোসেন	মৃত অফির উদ্দিন ফকির	শিবপুর	শিবপুর	আলমপুর	০৩০৭০৪০০২২
১৫.	দেওয়ান গোলাম সরোয়ার	মৃত দেওয়ান মওদুদ আলী	পাঁচুইল	শিবপুর	আলমপুর	০৩০৭০৪০০০৯

তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম
কালাই পৌরসভা

উপজেলা : কালাই

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১.	আবদুল ওয়াহেদ	মৃত আঃ বাছের	কাথাইল	কালাই	কালাই	০৩০৭০৩০০০৪
২.	মোঃ রেজাউল ইসলাম	মৃত আলতাফ হোসেন	মূলগ্রাম	কালাই	কালাই	০৩০৭০৩০০০৭

Dhaka University Institutional Repository

তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম
আক্কেলপুর পৌরসভা

উপজেলা : আক্কেলপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
১.	আবদুর রাজ্জাক	আঃ রহিম মন্ডল	আক্কেলপুর	আক্কেলপুর	আক্কেলপুর	০৩০৭০৫০০০৩১
২.	মোঃ নূরুল ইসলাম	সবদুল মন্ডল	হাস্তাবসন্তপুর	আক্কেলপুর	আক্কেলপুর	০৩০৭০৫০৩৫৪
৩.	আশরাফ আলী চৌধুরী	মফেজুর রহমান চৌধুরী	হাস্তাবসন্তপুর	আক্কেলপুর	আক্কেলপুর	০৩০৭০৫০২০৩
৪.	আবুল কালাম	গহির সরদার	কেশবপুর	আক্কেলপুর	আক্কেলপুর	০৩০৭০৫০১৯১
৫.	নীল রতন	ননীগোপাল মহন্ত	বিহারপুর	আক্কেলপুর	আক্কেলপুর	০৩০৭০৫০০২৬

উপজেলা : আক্কেলপুর
ইউনিয়ন : রুকিন্দীপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
৬.	ওমর ইন্না	তমিজ উদ্দিন মুন্সি	কানুপুর	কানুপুর	রুকিন্দীপুর	০৩০৭০৫০০১০
৭.	আছিম উদ্দিন	হুয়মত আলী	কানুপুর	কানুপুর	রুকিন্দীপুর	০৩০৭০৫০০২৫
৮.	শাহাদত হোসেন	সৈয়দ মুক্তার আলী	কানুপুর		রুকিন্দীপুর	০৩০৭০৫০৩৭৬
৯.	সাইদুল আলম	পায়েজ উদ্দিন	বেগুনবাড়ী	কানুপুর	রুকিন্দীপুর	০৩০৭০৫০২৯০
১০.	এমদাদ হোসেন	ইসমাইল হোসেন	বেগুনবাড়ী		রুকিন্দীপুর	০৩০৭০৫০৩৭৫
১১.	অতুল চন্দ্র	খিতিশ চন্দ্র মন্ডল	আওয়ালগাড়ী	সোনামুখী	রুকিন্দীপুর	০৩০৭০৫০১৭১
১২.	আঃ কুদ্দুস ফকির	ছমির উদ্দিন ফকির	মাতাপুর	জামালগঞ্জ	রুকিন্দীপুর	০৩০৭০৫০১৭৪
১৩.	নূরুল ইসলাম	ছবের উদ্দিন ফকির	ইসমাইলপুর	জামালগঞ্জ	রুকিন্দীপুর	জাতীয় তালিকা ২য় পর্ব-৫৩
১৪.	এনামুল হক	ছামছদ্দিন সরদার	জাফরপুর	জাফরপুর	সোনামুখী	জাতীয় তালিকা ১ম পর্ব-২৪৯
১৫.	ছায়ের আলী	মকবুল মন্ডল	সুসৃষ্টি (গুচ্ছগ্রাম)	গোপীনাথপুর	গোপীনাথপুর	জাতীয় তালিকা ২য় পর্ব-১৮
১৬.	ছাইদুর রহমান	তমিজ উদ্দিন	সুসৃষ্টি (গুচ্ছগ্রাম)	গোপীনাথপুর	গোপীনাথপুর	জাতীয় তালিকা ২য় পর্ব-১৫
১৭.	সিরাজ উদ্দিন	ছমির উদ্দিন	সুসৃষ্টি (গুচ্ছগ্রাম)	গোপীনাথপুর	গোপীনাথপুর	জাতীয় তালিকা ২য় পর্ব-১৬
১৮.	গোপাল চন্দ্র	রাজেন্দ্রনাথ সরকার	হোসেন নগর	গোপীনাথপুর	গোপীনাথপুর	০৩০৭০৫০৩৪৫
১৯.	আঃ আজিজ	বাছির উদ্দিন	টেকুঞ্চা	কাশিড়া	গোপীনাথাপুর	০৩০৭০৫০২২৭

উপজেলা : আক্কেলপুর
ইউনিয়ন : তিলকপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর	পৌরসভা	জাতীয় তালিকা নং/মুক্তিবার্তা নং
২০.	আজিজুর রহমান	আফতাব উদ্দিন	চক ইসমাইলপুর	তিলকপুর	তিলকপুর	জাতীয় তালিকা ১ম পর্ব-৭৪
২১.	হাফিজুল ইসলাম	জসমতুল্লা মন্ডল	বড়গাছা	মোহনপুর	তিলকপুর	জাতীয় তালিকা ১ম পর্ব-২২৪
২২.	সোলাইমান আলী	খরুশাহ	মাটিয়াকুড়ি	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০১৪৭
২৩.	খলিলুর রহমান	ইসমাইল হোসেন	মির্জাপুর	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

২৪.	মজিবর রহমান	মানিক উদ্দিন	নির্জাপুর	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০২৯৯
২৫.	তাজিম উদ্দিন	তহির উদ্দিন	কাদোয়া	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০০৬৭
২৬.	আবদুর রহিম	জাকির উদ্দিন	করমজী	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০০৩৭
২৭.	হাবিবুর রহমান	গরিবুল্লা মন্ডল ভ্যাটকুড়ি	করমজী	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০২০৩
২৮.	আহম্মেদ আলী	শতুব আলী	শ্যামপুর	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০০৯৭
২৯.	তুমিজ উদ্দিন	মফিজ উদ্দিন	শ্যামপুর	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০২৯৬
৩০.	হাবিবুর রহমান	মহির উদ্দিন	নূরনগর	তিলকপুর	তিলকপুর	০৩০৭০৫০৩৭৮
৩১.	রহিম উদ্দিন	আহির উদ্দিন	হারগাছা	রায়কালী	রায়কালী	জাতীয় তালিকা-৩
৩২.	মজিবর রহমান	মরেন উদ্দিন	টিয়ারীগ্রাম	কাশিড়া	রায়কালী	০৩০৭০৫০০৪৪
৩৩.	আছাব উদ্দিন	লয়েজ উদ্দিন	টিয়ারীগ্রাম	কাশিড়া	রায়কালী	০৩০৭০৫০৩৩৪
৩৪.	দিলবর রহমান	ইমান আলী শাহ	ঝালুকাপাড়া	খিদাহালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০০৯২
৩৫.	ওসমান আলী	আমীর আলী	হরিনালী	খিদাহালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০১০২
৩৬.	আছাব উদ্দিন	হিম্মত আলী	নারিকেলী	রায়কালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০৩৪০
৩৭.	আবদুর রহমান	আঃ ছাত্তার	নারিকেলী	রায়কালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০০৪৫
৩৮.	মোখলেছার রহমান	তছের উদ্দিন	খোসলাপাড়া	রায়কালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০২৯২
৩৯.	মোসলিম উদ্দিন	মফিজ উদ্দিন	মাধাইপুকুর	রায়কালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০১১২
৪০.	আকবর আলী	তছের উদ্দিন	দেওড়া	পুকুরিয়া	রায়কালী	০৩০৭০৫০১১৪
৪১.	আব্বাস আলী	মেহের আলী	দেওড়া	পুকুরিয়া	রায়কালী	০৩০৭০৫০২৪২
৪২.	মোসলিম উদ্দিন	আক্কাস আলী	দেওড়া	পুকুরিয়া	রায়কালী	০৩০৭০৫০২৪১
৪৩.	আফতাব উদ্দিন	মোহাম্মদ আলী	মালিগ্রাম	রায়কালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০৩৩৯
৪৪.	মোসলিম উদ্দিন	ভোলা সরদার	ডোলাপাড়া	রায়কালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০১০৪
৪৫.	শুকবর আলী	কালম উদ্দিন	মুনজিয়া	রায়কালী	রায়কালী	০৩০৭০৫০২৬৭

সূত্র : *বাংলাদেশ গেজেট*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা ২০০৫।

৬। "খ" স্মারক পত্রের বিষয়ে আলোচনায় সদস্য-সচিব ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ডাঃ এম. মহাদ্দেছ, উপ-পরিচালক (হাসপাতাল-২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম- বড়গাছা, ডাকঘর- মোহনপুর, উপজেলা- আক্কেলপুর, জেলা- জয়পুরহাট এর আবেদন পত্রখানা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে যাচাই-বাছাই করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫-০২-২০০৪ তারিখের মুবিম/প্রঃ-৩(১)/তালিকা-১/২০০২/৪২ নং স্মারক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিগত আবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। যেহেতু এখনও উক্ত নির্দেশনা বহাল আছে, সেহেতু ডাঃ এম. মহাদ্দেছ হোসেন এর আবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মে ১৪, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১.	মোঃ আঃ জোববার আলী	মৃত আঃ বারী ফকির	রাজাকপুর	
২.	মোঃ রমজান আলী	মৃত আঃ আজিজ	মিশিন্দায়া	
৩.	মোঃ হারুন অর রশিদ	মৃতময়েজ উদ্দিন	মধ্যপাড়া	
৪.	মোঃ আঃ জলিল সাকর	মৃত মজিবর রহমান সরকার	ফুলবাড়ি সরকার পাড়া	
৫.	মোঃ মোস্তফা কামাল	মৃত আকরাম আলী	ঠনঠনিয়া	
৬.	মোঃ আঃ কুদ্দুস ছাবরী	মৃত কছির উদ্দিন	এরুলিয়া	
৭.	মৃত আফজাল হোসেন	মৃত ইছমত উল্যা	এরুলিয়া	
৮.	মৃত আমিনুল হক মণ্ডল	মৃত ছামির উদ্দিন মন্ডল	আকাশ তারা	
৯.	মৃত নুরুল ইসলাম	মৃত আঃ জলিল খন্দকার	চকরূপ	
১০.	মৃত মতিয়ার রহমান	মৃত আব্দুস সাত্তার	বাদুরতরা	
১১.	মৃত সিরাজুল ইসলাম	মৃত কেরামত আলী	কাপোড়	
১২.	মৃত আঃ সবুর সওদাগর	মৃত হাফিজার রহমান	সুত্রাপুর	
১৩.	কে এম এ রশিদ	মৃত মোজাহার আলী খন্দকার	কর্নপুর	
১৪.	মোঃ ইব্রাহীম হোসেন	মৃত মোজাহার আলী	শিববাটি	
১৫.	মোঃ খায়রুল আলম	মৃত মজিদ আলী	জামুরচয়	
১৬.	মোঃ আঃ বারী প্রাং	মোঃ আঃ গনি প্রাং	ফুলবাড়িয়া	
১৭.	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মোঃ কামাল উদ্দিন	নিশিন্দায়া	
১৮.	মোঃ আবু ছালেক	মৃত ময়েজ উদ্দিন প্রাং	ইসলামপুর	
১৯.	মোঃ মহাতাব আলী	মৃত জসিম উদ্দিন সাকিদার	হরিগাড়ী	
২০.	আল হাজ্ব মোঃ মহসীন আলী	মৃত এছান আলী সাকিদার	ফুলবাড়িয়া	
২১.	মোঃ শহিদুল হক (খাতের)	মৃত ইছামুদ্দিন	পাঁচবাড়িয়া	
২২.	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মোঃ ময়েজ উদ্দিন আকন্দ	ফুলবাড়িয়া	
২৩.	মোঃ শহীদুল হক	মৃত ময়েন উদ্দিন	জালিপুর	
২৪.	মোঃ নুরুল আমিন	মৃত রহিম উদ্দিন প্রাং	কালিমপাড়া	
২৫.	মোঃ আফছার আলী	মৃত রমজান আলী	সাতশিমুলিয়া	
২৬.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত মোজাহার আলী	সাতশিমুলিয়া	
২৭.	মোঃ আঃ বারী	মৃত কাসেম উদ্দিন	সাতশিমুলিয়া	
২৮.	মোঃ আঃ সাত্তার প্রাং	মৃত কবির উদ্দিন প্রাং	ভেকরা	
২৯.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত তফছির রহমান মন্ডল	রামশহর	
৩০.	মোঃ জিল্লুর রহমান	মৃত ছলিম উদ্দিন	রামশহর	
৩১.	মোঃ মাকছুদুর রহমান	মৃত বেলায়েত হোসেন	রামশহর	
৩২.	মোঃ ফিরোজ উদ্দিন	মৃত ময়েন উদ্দিন	নিশিন্দারা	
৩৩.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত সামছুর রহমান	ঠনঠনিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৩৪.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত কাজেম উদ্দিন	সেউজগাড়ী	
৩৫.	মোঃ শাহ্ লুৎফর রহমান	মৃত এস এ ওয়াজেদ	জলেশ্বরীতলা	
৩৬.	মোঃ আঃ বারী	খাজা আহম্মেদ তালুকদার	শিববাটি	
৩৭.	মোঃ আঃ আজিজ	আবেদ আলী সেখ	জয়পুরপাড়া	
৩৮.	এস এম ফারুক	সৈয়দ জিন্নাত আলী	কামারগাড়ী	
৩৯.	মোঃ সাদেক আলী	মৃত মিয়াজান আলী	শিববাটি	
৪০.	ইবনে সাউদ বাদল	মৃত হারুনার রশিদ	বৃন্দাবনপাড়া	
৪১.	মোঃ মোরশেদুল আলম	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	বৃন্দাবনপাড়া	
৪২.	মোঃ সৈয়দ আলী	মৃত রফাত আলী সোনার	কাটনারপাড়া	
৪৩.	মোঃ শোকরানা (রানা)	মৃত আবদুস সামাদ	চকসুত্রাপুর	
৪৪.	মোঃ শওকত সোহেলী	মৃত মিছির উদ্দিন	বাদুরতলা	
৪৫.	মোঃ আবদুস সামাদ	মোঃ বছির উদ্দিন	তেলিহারা	
৪৬.	মোঃ আব্দুর রহমান	মৃত ওসমান গনি	মালগ্রাম	
৪৭.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মোঃ মজিবর রহমান	কুটির বাড়ী	
৪৮.	মোঃ মীর রফিকুল ইসলাম	মৃত আঃ আজিজুল	নারুলী	
৪৯.	মোঃ নজরুল আলম	ডাঃ মহসিন আলী	মালতীনগর	
৫০.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আব্বাছ আলী সরদার	ভাকুরচয়	
৫১.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মোঃ মোজাম প্রাং	ভাকুরচয়	
৫২.	মোঃ সাহাবুদ্দিন খান	মৃত সনজান আলী খান	মন্ডল ধরন	
৫৩.	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মৃত ফজলার রহমান	মালতীনগর	
৫৪.	মৃত আব্দুস সোবহান খান	মোঃ রিয়াজ খান	নামাজগড়	
৫৫.	মোঃ মোফাজজল হোসেন	মৃত আছির উদ্দিন ফকির	বালাদিঘী	
৫৬.	মোঃ জমসেদ আলী	মৃত এনায়েতুল্লা প্রাং	বালাদিঘী	
৫৭.	মোঃ ছিদ্দিক হোসেন	মোঃ রইচ উদ্দিন	বালাদিঘী	
৫৮.	এস এম এ আজিজ	সৈয়দ মেহের আলী	বড় টেংরা	
৫৯.	দৌলাতজ্জামান	মৃত নাছির উদ্দিন প্রাং	কাদিম পাড়া	
৬০.	মোঃ সামসুল আলম	মৃত আছির উদ্দিন	নিশিন্দারা	
৬১.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত আশরাফ আলী মুন্সী	দক্ষিণ ঠনঠনিয়া	
৬২.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত আশরাফ আলী মন্ডল	চককরিম	
৬৩.	মোঃ বাবুল প্রাং	মোঃ কিনা প্রাং	সুলতাগঞ্জ	
৬৪.	মোঃ নুরু উদ্দিন শেখ	মৃত মজিবর রহমান	চকসুত্রাপুর	
৬৫.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মোঃ নাছির উদ্দিন	সুলতাগঞ্জ	
৬৬.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মোঃ ইসরাত উল্লা মন্ডল	গোকুল	
৬৭.	মোঃ আনিছুজ্জামান মন্ডল	মৃত আছালতুজ্জামাল মন্ডল	মালতীনগর	
৬৮.	মোঃ আলী ফেরদৌস	মৃত ছাকা উদ্দিন মন্ডল	জলেশ্বরীতলা	
৬৯.	এ বি এম মাছদুল আলম	আলহাজ্ব মনির উদ্দিন আহমেদ	বৃন্দাবনপাড়া	
৭০.	মোঃ ইউনুছ আলী	মোঃ নইম উদ্দিন	জয়পুরপাড়া	
৭১.	মোঃ কামরুল হাসান	মৃত নইম উদ্দিন আহম্মেদ	বৃন্দাবনপাড়া	
৭২.	তোফাজ্জল হোসেন	মৃত তমিজ উদ্দিন	রামশহর গোকুল	
৭৩.	মোঃ আলতাব হোসেন	মৃত মোসলেম উদ্দিন	কুটিরপাড়া	
৭৪.	মোঃ আঃ আজিজ প্রাং	মৃত ইশারত উল্লা প্রাং	যোগাইপুর	
৭৫.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মোঃ মোবারক উল্যাহ	সুলতানগঞ্জ	
৭৬.	শহীদ আমিনুল কুদ্দুস	শামসুদ্দিন আহাম্মদ	উঃ কাটনার পাড়া	
৭৭.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত ময়েজ উদ্দিন	রহমান নগর	
৭৮.	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	মৃত মোবারক আলী	কাটনারপাড়া	
৭৯.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত শমসের আলী	নারিকেলবাগান	
৮০.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মুনসুর আলী প্রাং	খামার কান্দি	
৮১.	মোঃ আবুল রসুল	মোঃ নুরুল হোসেন	রহমান নগর	
৮২.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত মোজাম্মেল হক	সুত্রাপুর	
৮৩.	শ্রী বুদ্ধ চন্দ্র পাল	মৃত লংকেশ্বর পাল	এরলিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৮৪.	মোঃ আবদুর রহিম	মৃত ছালিম উদ্দিন	কাটানারপাড়া	
৮৫.	এস এম মোখলেছুর রহমান	মৃত এস এম আশরাফ	জলেশ্বরীতলা	
৮৬.	মোঃ বেলাল হোসেন	মৃত বুদাশেখ	কানজগাড়ী	
৮৭.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত শমসের আলী	মহিষবাথান	
৮৮.	মোঃ আইয়ুব উদ্দিন	মৃত দিয়াজ উদ্দিন	ধলমোহনী	
৮৯.	মোঃ আঃ হামিদ	মৃত মফিজ উদ্দিন শেখ	নারুলী	
৯০.	মোঃ আইয়ুব উদ্দিন প্রাং	মৃত দিরাজ উদ্দিন প্রাং	ধলমোহনী	
৯১.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মোঃ ইব্রাহিম হোসেন	ঠেংগামারা	
৯২.	মোঃ শামছুল আলম	মৃত হানিফ উদ্দিন	দিঘলকান্দি	
৯৩.	মোঃ মোকারম হোসেন	মৃত বয়তুল্যা শাহ	বড় সরলপুর	
৯৪.	মৃত এ এম ফারুক	মোঃ আঃ গনি মিয়া	লতিফপুর	
৯৫.	মোঃ আঃ লতিফ	মোঃ আঃ মালেক	সুত্রাপুর	
৯৬.	মোঃ বুলু মিয়া খলিফা	মোঃ আমিন আলী খলিফা	সুত্রাপুর	
৯৭.	মৃত এ টি এম আব্দুল হামিদ	তোজাম্মেল হোসেন	সেউজগাড়ী	
৯৮.	সৈয়দ ফজলুল হক	সৈয়দ মহফুজুল হক	সুলতানগঞ্জপাড়া	
৯৯.	মোঃ জহুরুল হক (ইকবাল)	আহম্মেদ আলী আফছার	নারুলী	
১০০.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত ছাবেদ আলী মোল্লা	শাখারিয়া	
১০১.	মোঃ আব্দুল কাদের	মৃত ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	রহমান নগর	
১০২.	মোঃ জিয়াউল হক খান মুক্কু	মৃত জসিম উদ্দিন খান	ধাওয়াকোলা	
১০৩.	মোঃ শাহজাহান আলী খান	মৃত আলহাজ খুদু খান	কাদিরপাড়া	
১০৪.	মোঃ আব্দুর রউফ	মৃত ওয়াহেদুর রহমান	চাদপুর	
১০৫.	মৃত নিতাই চন্দ্র দাস	মৃত নগেন্দ্র নাথ দাস	দক্ষিণ চেলোপাড়া	
১০৬.	মোঃ বজলার রহমান	আজগর আলী আকন্দ	শাখারিয়া	
১০৭.	হাজী মোঃ ইজান আলী	মৃত দমছের আলী ফকির	ধরমপুর	
১০৮.	মোঃ মাহফুজার রহমান	মৃত মোবারক হোসেন	মাটিডালী	
১০৯.	মৃত নিত্য গোপাল মালাকার	মৃত রামচন্দ্র মালাকার	নিশিন্দারা কারবালা	
১১০.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত আলাউদ্দিন	ছোট বেলাইল	
১১১.	মোঃ ফিরোজ আহমেদ	মোঃ আলতাফ আলী আহমেদ	জয়পুর পাড়া	
১১২.	মোঃ জিন্নাতুল ইসলাম	মৃত আঃ জোব্বার মন্ডল	নিশিন্দারা	
১১৩.	মোঃ আফছার আলী তালুকদার	কছিম উদ্দিন তালুকদার	মালগ্রাম	
১১৪.	এ এইচ এম গোলাম রব্বানী খান	আঃ হামিদখান	ধাওয়াকোলা	
১১৫.	সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	আলহাজ্ব সৈয়দ নসির উদ্দিন আহমেদ	জয়পুরপাড়া	
১১৬.	মৃত আঃ মান্নান	মৃত রইচ উদ্দিন	সুলতানগঞ্জপাড়	
১১৭.	মোঃ রেজাউল বাকী	মৃত আঃ জলিল	জলেশ্বরীতলা	
১১৮.	মোঃ সৈয়দ আলী	মৃত রফাত সোনার	কাটনার পাড়া	
১১৯.	মোঃ আয়ুবুর রহমান	মৃত আজগার আলী প্রাং	বালাকৈগাড়ী	
১২০.	হাজী আবুবকর সিদ্দিক	মৃত কলিম উদ্দিন	ঠনঠনিয়া	
১২১.	এ এইচ এম সারোয়ার জাহান	মৃত এম রজব আলী	লতিফপুর	
১২২.	আবু সালেহ মামুদ হাসান	মৃত মোহসীন উদ্দিন	সুত্রাপুর	
১২৩.	মোঃ আব্দুল বারী	খাজা আহম্মেদ তালুকদার	শিববাটি	
১২৪.	মোঃ মশিউর রহমান	মোঃ আকরাম হোসেন	জলেশ্বরীতলা	
১২৫.	মৃত আজগর হোসেন	মৃত আজমল হোসেন খান	নামাজগড়	
১২৬.	মৃত জয়নাল আবেদীন	মৃত নুরুল হোসেন	রহমান নগর	
১২৭.	এ এইচ এম কায় খশরু	মোঃ আঃ রউফ	সুত্রাপুর	
১২৮.	মৃত ওবাইদুর রহমান	মৃত জিব্রাইল মিয়া	নামাজগড়	
১২৯.	মোঃ আফতাবুল আলম	মোঃ বদরুল আলম	কাটনারপাড়া	
১৩০.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত সিরাজ উদ্দিন	কাটনারপাড়া	
১৩১.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত মোবারক উল্লাহ	সুলতানগঞ্জপাড়া	
১৩২.	মোঃ কামরুজ্জামান লোহানী	মৃত শাহ আছাতুজ্জামান	মালতীনগর	
১৩৩.	মোঃ ইকবাল হোসেন খান	মৃত নজমল হক খান	চকসুত্রাপুর	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৩৪.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত আজিম উদ্দিন	চকসুত্রাপুর	
১৩৫.	শহীদ হোসেন চৌধুরী	মৃত আফজাল হোসেন	ঠনঠনিয়া	
১৩৬.	মোঃ আতিকুর রহমান	মৃত সামছ উদ্দিন আহমেদ	সুত্রাপুর	
১৩৭.	ইবনে সাউদ বাদল	মৃত হারুন অর রশিদ	বৃন্দাবন পাড়া	
১৩৮.	মাহমুদুল হাসান	হারেছ উদ্দিন আহমেদ	মালতীনগর	
১৩৯.	মোঃ মকবুল শেখ	মৃত জোনাব আলী শেখ	শিববাটি	
১৪০.	মোঃ আঃ সোবহান সরকার	মৃত সোহরাব হোসেন সরকার	রাজাবাজার	
১৪১.	মৃত আমিনুল হক দুলাল	মৃত মজিবর রহমান	মালতীনগর	
১৪২.	মোঃ আব্দুস সোবহান	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	হরিগাড়ী	
১৪৩.	মোঃ একরাম হোসেন	মৃত জাকের মাহমুদ আকন্দ	শাখারিয়া	
১৪৪.	মৃত মজিবুর রহমান	মৃত রইচ উদ্দিন	নিশিন্দারা	
১৪৫.	মোঃ বদিউজ্জামান মন্টু	মৃত আবুল হোসেন	ঠনঠনিয়া	
১৪৬.	মোঃ সামছুল আলম	মৃত আছির উদ্দিন	ধমকপাড়া	
১৪৭.	মোঃ আবু জাফর	মৃত আলীম উদ্দীন	বারপুর	
১৪৮.	মোঃ দৌলত জামান	মৃত মছির উদ্দিন	কাদিমপাড়া	
১৪৯.	সদরুল আনাম রঞ্জু	মৃত আবুল কাসেম	সেইজগাড়ী	
১৫০.	মৃত গোলাম হোসেন	মৃত কাশেম আলী পাইকার	শিকারপুর	
১৫১.	মৃত ফজলুল হক	মোঃ জিল্লুর রহমান	কর্ণপুর	
১৫২.	মোঃ জুলফিকার রহমান	মৃত আশরাফ আলী প্রাং	চালিতাবাড়ী	
১৫৩.	এম আর রেনু	মৃত নাছির উদ্দিন	মালতীনগর	
১৫৪.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মোঃ মোজাম্মেল হক	ডাবরচক	
১৫৫.	এস এম সামছুল ইসলাম	মৃত এস এম মর্তুজা	বৃন্দাবনপাড়া	
১৫৬.	মোঃ নজমল হক খান	মৃত নইম উদ্দিন খান	মন্ডল ধরন	
১৫৭.	মোঃ আনসার আলী	মৃত কিনা মন্ডল	গোপালবাড়ী	
১৫৮.	মোঃ বেলাল উদ্দিন	মৃত কুড়ানু সরকার	ডাকুরচক	
১৫৯.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত তাহির উদ্দিন	সুত্রাপুর	
১৬০.	মোঃ আবু সিদ্দিক	মৃত ইজার উদ্দিন প্রাং	ঘোলাগাড়ী	
১৬১.	মাহফুজার রহমান	মৃত আলহাজ্ব বজলুর রহমান	সাতশিমুলিয়া	
১৬২.	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মৃত মোজাম্মেল হোসেন	গোকুল	
১৬৩.	একেএম নুরুল ইসলাম সরকার	মৃত মোজাম্মেল হোসেন সরকার	রহমান নগর	
১৬৪.	মোঃ এনামুল হক	মৃত হাছির উদ্দিন	বাহরতলা	
১৬৫.	মোস্তফা পাইকার (খোকন)	মৃত মোজাম পাইকার	মালতীনগর	
১৬৬.	আজিজার চান	মৃত নাজিমুদ্দিন ফকির	সুত্রাপুর	
১৬৭.	রমজান আলী	মৃত নইম উদ্দিন	সুত্রাপুর	
১৬৮.	মোঃ আব্দুর রহমান	মৃত মহির উদ্দিন ফকির	মালতীনগর	
১৬৯.	মোঃ সামসুল হক	মৃত হাফিজ উদ্দিন	চকসুত্রাপুর	
১৭০.	মোঃ সামসুল আলম	মৃত কছিম উদ্দিন মন্ডল	গোকুল	
১৭১.	মোঃ রেজাউল করিম	রইচ উদ্দিন	গোকুল	
১৭২.	মোঃ মাহামুদুল আমিন	মৃত হামিদুর রহমান	জলেশ্বরীতলা	
১৭৩.	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	মৃত মোহাম্মদ বদেল গফুর মিয়া	মালতীনগর	
১৭৪.	মোঃ হায়দার আলী	মৃত ফকির উদ্দিন	নিশিন্দারা	
১৭৫.	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	মৃত মবারক আলী	কাটনার পাড়া	
১৭৬.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন মোফা	মৃত মমতাজ উদ্দিন	ফুলবাড়ী উত্তর পাড়া	
১৭৭.	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মৃত মমতাজ উদ্দিন	ফুলবাড়ী উত্তর পাড়া	
১৭৮.	মোঃ মাসুদার রহমান হেলাল	মৃত মোশারফ হোসেন মন্ডল	কাটনার পাড়া	
১৭৯.	মোঃ কামাল পাশা	মৃত আব্দুর রহমান	কাজী নুরইল	
১৮০.	মোঃ ইদ্রিস আলী	মোঃ মফিজ উদ্দিন	আমবাড়িয়া	
১৮১.	মোঃ আঃ গনি	মৃত রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	নামাজগড়	
১৮২.	মোঃ জয়নাল আবেদনী	মৃত তমিজ উদ্দিন	শিববাটি	
১৮৩.	মোঃ আব্দুর রশিদ বাচ্চু	আলহাজ্ব রইচ উদ্দিন ফকির	ঠনঠনিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৮৪.	মোঃ বদিউল আলম	মৃত মোবাশ্বর উদ্দিন	সবুজবাগ	
১৮৫.	মোঃ আব্দুল লতিফ	মোঃ আইয়ুব আলী প্রাং	দারুলী	
১৮৬.	মোঃ আব্দুর রউফ	মৃত আকবর হোসেন আকন্দ	সেউজগাড়ী	
১৮৭.	মৃত আব্দুল গোফফার খান	মৃত দলিল উদ্দিন খান	ফৈচর	
১৮৮.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত খনিজ উদ্দিন শেখ	ফুলবাড়ী উত্তর পাড়া	
১৮৯.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত মোজাম্মেল হক	সুত্রাপুর	
১৯০.	মোঃ এনামুল হক তপন	মৃত জহুরুল হক	কাটনারপাড়া	
১৯১.	মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	মৃত শেখ এজাহার আলী	মালতীনগর	
১৯২.	মোঃ আনছার আলী	হাজী কাউয়ুম উদ্দিন	বারুইপাড়া	
১৯৩.	আব্দু রহমান	মৃত ওসমান গনি	মালগ্রাম	
১৯৪.	মোঃ আবু সালেক	ময়েজ উদ্দিন	ইসলামপুর হরিগাড়ী	
১৯৫.	এএফএম ফজলে রাব্বি	মৃত ইলাহী বকস	শিববাটি	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৯৬.	মোঃ আহম্মেদুর রহমান	মৃত হাজী আজিজুর রহমান	রাধানগর	
১৯৭.	খন্দকার আবু নছর	মোঃ শাহাদৎ খন্দকার	কৈগাড়ী	
১৯৮.	মৃত সহিদুল হাসান	মোঃ হুরমতুল্যা মন্ডল	লক্ষীকোলা	
১৯৯.	মোঃ আঃ ছাত্তার প্রাং	মৃত গানাউল্যা প্রাং	কৌলধুকুরী	
২০০.	নৃপেন্দ্র নাথ দাস	মৃত নরেন্দ্র নাথ দাস	গন্ডগ্রাম	
২০১.	শ্রী হরিপদ দাস	মৃত শ্রীকান্ত দাস	গন্ডগ্রাম	
২০২.	শ্রী গৌর গোপাল গোস্বামী	শ্রী বিনয়ভূষণ গোস্বামী	মাদলা	
২০৩.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মোঃ তছলিম উদ্দিন ফকির	লক্ষীকোলা	
২০৪.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ ইয়াছিন আলী	রহিমাবাদ	
২০৫.	মোঃ আব্দুল মান্নান	হাবিবর রহমান ফকির	ডেমাজানী	
২০৬.	মোঃ রমজান আলী	মৃত আনিছ উদ্দিন ফকির	খরনা	
২০৭.	শহীদ খন্দকার আবু সুফিয়ান	মৃত সাদত আলী খন্দকার	কৈগাড়ী	
২০৮.	মৃত এলাহী বক্স	মৃত মোবারক আলী প্রাং	শৈলধুকুরী	
২০৯.	এফ.এম.এ ফজল মৌলভী	মোঃ হবিবর রহমান ফকির	জোড়াফকিরপাড়া	
২১০.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত কছিম উদ্দিন মন্ডল	খাদিড়া	
২১১.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ	মৃত আবের শাহ মন্ডল	কেশপাথার	
২১২.	মোঃ মিছবাহুল মিল্লাত	মৃত সিরাজুল ইসলাম	চকরোকমান	
২১৩.	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত ওমেদ আলী	জোড়ামালিপাড়া	
২১৪.	মোঃ নুরুজ্জামান	মৃত আবু তাহের প্রাং	বয়রাদিঘী	
২১৫.	মোঃ হজরত আলী	মৃত গেন্দু সোনার (গদিবুল্লা)	জোড়ামালিপাড়া	
২১৬.	মোঃ আফছার আলী	মৃত কিসমতুল্যা	মনসেরপুর	
২১৭.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার মান্না	খলির উদ্দিন মান্না	জোড়াদামড়াপাড়া	
২১৮.	মোঃ হাছেন আলী কাজী	মৃত কায়েম উদ্দিন কাজী	জোমনপুকুর	
২১৯.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ কাবেজ উদ্দিন প্রাং	মাদলা	
২২০.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন মন্ডল	মোঃ ময়েজ উদ্দিন মন্ডল	নন্দিনন্দগ্রাম	
২২১.	মোঃ মোখলেছুর রহমান	মোঃ পরশউল্যা মন্ডল	মালিপাড়া	
২২২.	মোঃ লিয়াকত আলী	মোঃ বশির উদ্দিন ফকির	বৃকুষ্টিয়া	
২২৩.	মোঃ আব্দুল হালিম	মৃত আঃ আজিজ প্রাং	বৃকুষ্টিয়া	
২২৪.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত নায়েব আলী প্রাং	আড়িয়াবাজার	
২২৫.	মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার	মৃত মফিজ উদ্দিন সরকার	মাদলা	
২২৬.	মোঃ রেজাউল করিম	হাবিবর রহমান	জোড়া	
২২৭.	মোঃ হোসেন আলী	মোঃ হুরমতুল্যা	লক্ষীকোলা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২২৮.	শ্রী নিরঞ্জন চন্দ্র মোহন্ত	মৃত ক্ষুদীরাম মোহন্ত	গড্ডাম	
২২৯.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন আজাদ	মৃত হাফিজুর রহমান ফকির	জোড়া	
২৩০.	মোঃ আব্দুর রহমান	নিজাম উদ্দিন	কৈগাড়ী	
২৩১.	নীরেন্দ্র মোহন শাহা	মৃত নপেন্দ্র মোহন সাহা	চাচাইভায়া	
২৩২.	মোঃ আঃ সাত্তার	হাফিজার রহমান	ফুলতলা	
২৩৩.	মোফলেছুর রহমান	মৃত মফিজ উদ্দিন আকন্দ	সাজাপুর	
২৩৪.	মোকলেছুর রহমান	মৃত হাবিবুর রহমান ফকির	বৃ-কুষ্টিয়া	
২৩৫.	মোঃ নজিবুর রহমান	মৃত আলঃ আজিজুর রহমান	রাধানগর	
২৩৬.	মোঃ আব্দুর রহমান আকন্দ	আব্বাস আলী আকন্দ	শেল ধুকড়া	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা

উপজেলা : সারিয়াকান্দী, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২৩৭.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত আবুল হোসেন ফকির	পাইকপাড়া	
২৩৮.	মোঃ দৌলতজ্জামান	মৃত আকালু ফকির	পাইকপাড়া	
২৩৯.	মৃত আব্দুস সাত্তার	মৃত ওমেদ আলী প্রাং	পাইকপাড়া	
২৪০.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মৃত আয়তুল্যা ফকির	শালুখা	
২৪১.	এ এস এম মোসা	মৃত সামসুর রহমান	চরবাটিয়া	
২৪২.	মোঃ মোকলেছার রহমান	মৃত আঃ করিম ফকির	চরবাটিয়া	
২৪৩.	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	মৃত সৈয়দ আলী প্রাং	ডচলাপাড়া	
২৪৪.	মোঃ জিল্লার রহমান	মৃত সৈয়দ আলী প্রাং	ডচলাপাড়া	
২৪৫.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মোঃ জালাল উদ্দিন মন্ডল	ডচলাপাড়া	
২৪৬.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত আলেফ উদ্দিন প্রাং	ডচলাপাড়া	
২৪৭.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত আব্দুর রহমান মন্ডল	ডচলাপাড়া	
২৪৮.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত জহির উদ্দিন প্রাং	ডচলাপাড়া	
২৪৯.	মোঃ তফিজ উদ্দিন আহম্মেদ	মোঃ আলতাব আলী প্রাং	ডচলাপাড়া	
২৫০.	মোঃ মোকছেদ আলী	মৃত মতিয়ার রহমান	ডচলাপাড়া	
২৫১.	মোঃ আব্দুল আজিজ	মৃত শুকুর মাহমুদ প্রাং	ডচলাপাড়া	
২৫২.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত আঃ হামিদ সরকার	কারণান্দিয়ার পাড়া	
২৫৩.	একেএম হাসিনুর রহমান	মৃত আঃ হামিদ সরকার	কারণান্দিয়ার পাড়া	
২৫৪.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত মোজাম্মেল হক	গোদাখালী	
২৫৫.	মোঃ আব্দুর রহমান	মৃত তমিজ উদ্দিন	গোদাখালী	
২৫৬.	মোঃ আবু তাহের সরকার	মৃত জসিম উদ্দিন	কামালপুর	
২৫৭.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত আজগর আলী মন্ডল	গোদাখালী	
২৫৮.	মোঃ হায়দার আলী	মৃত আছমত আলী	হাওড়াখালী	
২৫৯.	মোঃ আব্দুল বারী	মৃত খোদা বক্স মন্ডল	ইছানারা	
২৬০.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মোঃ মজিবুর রহমান আকন্দ	নাড়ুপাড়া	
২৬১.	মৃত নায়েব আলী	মৃত তুফানু প্রাং	হাওড়াখালী	
২৬২.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত সৈয়দ আলী প্রাং	নাড়ুপাড়া	
২৬৩.	মোঃ ছোলাইমান	মৃত রহিম উদ্দিন	পাইকরতলী	
২৬৪.	মোঃ আব্দুল বারী মন্ডল	মৃত দরতুল্যাহ মন্ডল	ফুলবাড়ী	
২৬৫.	মোঃ মোজাম্মেল হক	জসিম উদ্দিন	কাটাখালী	
২৬৬.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	মৃত দারাছ উদ্দিন	ছাগলধরা	
২৬৭.	মোঃ আব্দুস ছালাম	মৃত আজিম উদ্দিন পাং	ছাগলধরা	
২৬৮.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মৃত দরতুল্যাহ মন্ডল	ফুলবাড়ী	
২৬৯.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত আব্বাছ প্রাং	ছাগলধরা	
২৭০.	মোঃ আব্দুস ছালাম	মৃত বাহার উদ্দিন আকন্দ	বয়ড়াকান্দি	
২৭১.	মোঃ শরিফ হোসেন	মৃত ইসার উদ্দিন শাহ	বড়ইকান্দি	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২৭২.	মোঃ আব্দুল হান্নান	মৃত গোলাম মোমেন মন্ডল	ধলইকান্দি	
২৭৩.	মোঃ ছামছুল হক	মৃত সাহার আলী প্রাং	সোলারতইড়	
২৭৪.	মোঃ আব্দুস ছালাম	মৃত মহির উদ্দিন প্রাং	সোলারতইড়	
২৭৫.	মোঃ ফজলুল করিম	মৃত ইলাহী বক্স সরকার	বড়ইকান্দি	
২৭৬.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত জসিম উদ্দিন মঃ	তেলাবাড়ী	
২৭৭.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত মফিজ উদ্দিন প্রাং	গোদাগাড়ী	
২৭৮.	মোঃ জোনাব আলী	মৃত আজর উদ্দিন প্রাং	ফকির পাড়া	
২৭৯.	মোঃ খাহায় উদ্দিন	মৃত কলিম উদ্দিন আহম্মদ	ফকির পাড়া	
২৮০.	মোঃ মহসীন আলী	মৃত দানিছ উদ্দিন সরকার	ফকির পাড়া	
২৮১.	মোঃ খোরশেদ আলম	মৃত আলিম উদ্দিন প্রাং	গোদাগাড়ী	
২৮২.	মোঃ ছামছুল আলম	মৃত ঈমান উদ্দিন প্রাং	ফকির পাড়া	
২৮৩.	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত জাহা বক্স মন্ডল	কুপতলা	
২৮৪.	মোঃ জিল্লুর রহমান	মৃত আয়েজ ইদ্দন প্রাং	কুপতলা	
২৮৫.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	মৃত সৈয়দ আলী	কুপতলা	
২৮৬.	মোঃ জামিরুল ইসলাম	মৃত মহাসিন আলী	গোদাগাড়ী	
২৮৭.	মোঃ মোকছেদুর রহমান	মৃত মনির উদ্দিন মন্ডল	গোদাগাড়ী	
২৮৮.	মৃত দৌলত জামাল	ইজ্জতুল্যা মন্ডল	নারচী	
২৮৯.	মোঃ মোজাহারুল হান্নান	মৃত নয়ন উদ্দান মন্ডল	শাহানবান্দা	
২৯০.	মোঃ আঃ কুদ্দুস আকন্দ	মৃত বয়েজ উদ্দিন আকন্দ	পারতিত পরল	
২৯১.	মোঃ সাহাদত হোসেন	মৃত ফয়েজ উদ্দিন মন্ডল	পারতিত পরল	
২৯২.	মোঃ আঃ লতিফ	মৃত বসির উদ্দিন	চরবাটিয়া ইউপি	
২৯৩.	মোঃ আঃ হামিদ	মৃত মনজ উদ্দিন সরদার	কালুখা	
২৯৪.	মোঃ আঃ বাছেদ	মৃত কামাল উদ্দিন	ভাটিয়া	
২৯৫.	মোঃ বজলুর রহমান	মৃত ছাদেক আলী প্রাং	হিপুকান্দা	
২৯৬.	মোঃ আঃ রউফ	মৃত কফিল উদ্দিন	দায়লা	
২৯৭.	মোঃ আঃ গফুর	মৃত নজির হোসেন প্রাং	দায়লা	
২৯৮.	মোঃ মুনছুর রহমান	মৃত হানিফ উদ্দিন সাহ	ইউপি	
২৯৯.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত আঃ কাদের বকস আঃ	পারতিত পরল	
৩০০.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত গমির উদ্দিন	চরবাটিয়া	
৩০১.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত আঃ হাকিম সরদার	কালুখা	
৩০২.	মোঃ কাজী তফিকুল ইসলাম	মৃত কাজী রইচ উদ্দিন	চরপাড়া	
৩০৩.	মোঃ কাজী মুনজুরুল হক	মৃত কাজী মুস্তাফিজার রহমান	চরপাড়া	
৩০৪.	মোঃ কাজী জহুরুল ইসলাম	কাজী মতিয়ার রহমান	চরপাড়া	
৩০৫.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মোজাম্মেল হক মন্ডল	চরপাড়া	
৩০৬.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মোঃ মুনছের আলী আকন্দ	কাশিয়াহাটা	
৩০৭.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মৃত রিয়াজ উদ্দিন মন্ডল	কাশিয়াহাটা	
৩০৮.	মোঃ সোবহান আলী সরকার	মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার	নান্দিয়ার পাড়া	
৩০৯.	মোঃ বায়েছ উদ্দিন আকন্দ	মৃত কাজেম উদ্দিন আকন্দ	নান্দিয়ার পাড়া	
৩১০.	মোঃ ইজ্জত আলী	মৃত জমসের আলী মোল্লা	নান্দিয়ার পাড়া	
৩১১.	মোঃ আশরাফ আলী	ফলিম উদ্দিন প্রাং	চরপাড়া	
৩১২.	মৃত ফজলার রহমান	মৃত মহির উদ্দিন মন্ডল	চরপাড়া	
৩১৩.	মোঃ কাজী আঃ রহিম	মৃত কাজী ইফাজ উদ্দিন	চরপাড়া	
৩১৪.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত জসিম উদ্দিন আহম্মেদ	উল্যাডাঙ্গা	
৩১৫.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত রহিমুদ্দিন মন্ডল	উল্যাডাঙ্গা	
৩১৬.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত আফছার আলী প্রাং	চরকুমার পাড়া	
৩১৭.	মোঃ মন্তেজার রহমান	মৃত মজিতুল্যা প্রাং	চরকুমার পাড়া	
৩১৮.	মোঃ নবির উদ্দিন	মৃত লোকমান মোল্লা	ছুনপচা	
৩১৯.	মোঃ খায়রুল ইসলাম	মৃত ফজলার রহমান মন্ডল	নান্দিয়ার পাড়া	
৩২০.	মোঃ খোরশেদ আলী	মৃত বছর উদ্দিন মন্ডল	ছুনপচা	
৩২১.	মোঃ ওসমান গনি	মৃত আহম্মদ আলী	অন্তরপাড়া	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৩২২.	মোঃ আছালতজ্জামান	মৃত আঃ রহমান আকন্দ	পারতিত পরল	
৩২৩.	মৃত গিয়াস উদ্দিন	মৃত নাজির হোসেন আকন্দ	পারতিত পরল	
৩২৪.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত রাজিব উদ্দিন	দারুন্দা	
৩২৫.	মোঃ আঃ কদ্দুস সরকার	মৃত মুনছের আলী সরকার	পাইকরতলী	
৩২৬.	মোঃ আঃ করিম	মৃত আহম্মেদ আলী	দারুন্দা	
৩২৭.	এ কে মোহাম্মদ আলী	মৃত ইব্রাহিম প্রাং	বাটিয়া	
৩২৮.	মোঃ আজাহারুল ইসলাম	মৃত নিজাম উদ্দিন	ঘুঘুমারী	
৩২৯.	মোঃ আব্দুর রহিম	মোঃ ইউনুছ আলী	গোদাখালী	
৩৩০.	মোঃ রোস্তম আলী	মৃত তমিজ উদ্দিন	বিবির পাড়া	
৩৩১.	মোঃ মনোয়ার হোসেন	মৃত আব্দুল কদ্দুছ মন্ডল	কামালপুর	
৩৩২.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত আজগর আলী মন্ডল	ইছামারা	
৩৩৩.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত ইয়াতুল্যা মন্ডল	কামালপুর	
৩৩৪.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মৃত মাজেম উদ্দিন প্রাং	গোদাখালী	
৩৩৫.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত মাজেম উদ্দিন প্রাং	বিবির পাড়া	
৩৩৬.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত ছামছুর রহমান	ইছামারা	
৩৩৭.	মোঃ হাবিবর রহমান	মৃত মানিক সোনার	গোদাখালী	
৩৩৮.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মোহাম্মদ আলী প্রাং	দড়িপাড়া	
৩৩৯.	মোঃ আঃ কদ্দুছ	মৃত রহিম উদ্দিন মন্ডল	গোদাখালী	
৩৪০.	মোঃ আব্দুল মান্নাফ	মৃত নরেশ আলী মন্ডল	গোদাখালী	
৩৪১.	মোঃ মোতাহার আলী	মৃত নফুর	ফুলবাড়ী	
৩৪২.	মোঃ দুদু মিয়া	খিদির প্রাং	ফুলবাড়ী	
৩৪৩.	মোঃ চান মিয়া	কয়েজ প্রাং	ফুলবাড়ী	
৩৪৪.	মোঃ দৌলত জামান	মৃত আব্বাছ আলী মন্ডল	হরিনা	
৩৪৫.	মোঃ সাহেব আলী	জোনাব আলী মন্ডল	গোয়ালবাতান	
৩৪৬.	মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রাং	মৃত নেদু প্রাং	নিউসোনাতলা	
৩৪৭.	মোঃ নজরুল ইসলাম	ঈমান উদ্দিন প্রাং	ফুলবাড়ী	
৩৪৮.	মোঃ ফজলুল রহমান	মৃত জসিম উদ্দিন প্রাং	ছাগলধরা	
৩৪৯.	মোঃ ছামছুল হক	মৃত আলা বক্স ফকির	কুতুবপুর	
৩৫০.	মোঃ রমজান আলী	মৃত জসিম উদ্দিন সাকিদার	কুতুবপুর	
৩৫১.	মোঃ হাতেম আলী	মৃত ইজার উদ্দিন তরফদার	বয়ড়াকান্দি	
৩৫২.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত মকবুল হোসেন আকন্দ	বয়ড়াকান্দি	
৩৫৩.	মোঃ হবিবর রহমান	কাদের বক্স প্রাং	ধলিরকান্দি	
৩৫৪.	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	মৃত কাদের বক্স ফকির	দেবডাংগা	
৩৫৫.	মোঃ আব্দুর রেজাজ্জাক	মৃত দিদার উদ্দিন আকন্দ	ধলিরকান্দি	
৩৫৬.	মোঃ আনছার আলী ফকির	মৃত আব্দুল ফকির	কুতুবপুর	
৩৫৭.	মোঃ বেলাল হোসেন	মৃত ওছমান গনি মন্ডল	কুতুবপুর	
৩৫৮.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মৃত হাজী ইলাহী বক্স মঃ	ছাইহাটা	
৩৫৯.	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত হাজী কছির উদ্দিন প্রাং	ছাইহাটা	
৩৬০.	মোঃ মান্নান	মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রাং	ছাইহাটা	
৩৬১.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আবুল হোসেন প্রাং	ছাইহাটা	
৩৬২.	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত রমজান আলী মঃ	ছাইহাটা	
৩৬৩.	মোঃ ছামাদ	মৃত আসকর প্রাং	ছাইহাটা	
৩৬৪.	মোঃ আঃ আজিজ	মৃত রহিম বক্স প্রাং	ছাইহাটা	
৩৬৫.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত মজিবর রহমান প্রাং	ছাইহাটা	
৩৬৬.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত রহিম	তেলাবাড়ী	
৩৬৭.	মোঃ লুতফর রহমান	মৃত আবুল হোসেন মঃ	তেলাবাড়ী	
৩৬৮.	মোঃ বাবর আলী	মৃত নছিম উদ্দিন	বাঁশহাটা	
৩৬৯.	মৃত আজিজুল হক	মৃত এবাকার হোসেন	বাঁশহাটা	
৩৭০.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত আয়েন উদ্দিন	জোড়গাছা	
৩৭১.	মোঃ শহীদুর রহমান	মৃত জশমতুল্যা	জোড়গাছা	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৩৭২.	মোঃ ইকবাল হোসেন	মৃত জশমতুল্যা	জোড়গাছা	
৩৭৩.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত হামেদ আলী	বাঁশহাটা	
৩৭৪.	মোঃ সালিফ উদ্দিন	মৃত তালেব উদ্দিন	খোন্দবলাইল	
৩৭৫.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত মজিবুর রহমান	নিজবলাইল	
৩৭৬.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত মজিবুর রহমান	নিজবলাইল	
৩৭৭.	মোঃ আছালত জামান	মৃত ফানাতুল্যা প্রাং	নিজবলাইল	
৩৭৮.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত নয়েন উদ্দিন মন্ডল	সাহানবান্দা	
৩৭৯.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত সাইতুল্যা সরকার	হাটশেরপুর	
৩৮০.	মোঃ ওয়াজেদ আলী	মৃত মোবারক আলী	নিজবলাইল	
৩৮১.	মোঃ আবুল কাসেম	মৃত মোতরাজ আলী	হাটশেরপুর	
৩৮২.	শ্রী গোপাল দাস	মৃত দৌলত রাম দাস	দীঘাপাড়া	
৩৮৩.	মোঃ মহসীন আলী	মৃত মুনছের আলী	নিজবলাইল	
৩৮৪.	মোঃ রফিকুল	মৃত আলতাব আলী	নিজবলাইল	
৩৮৫.	মোঃ হাসেম আলী	মৃত আলিম উদ্দিন প্রাং	গনকপাড়া	
৩৮৬.	মোঃ আবুল হাসিম	মৃত আবদুল হাফিজ মন্ডল	নারচী	
৩৮৭.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত হায়দার আলী	গোদাগাড়ী	
৩৮৮.	মোঃ বজলার রহমান	মৃত আজিম উদ্দিন প্রাং	গোদাগাড়ী	
৩৮৯.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত কালু প্রাং	কুপতলা	
৩৯০.	মোঃ নজীর উদ্দিন	মৃত কাজেম উদ্দিন	কুপতলা	
৩৯১.	মোঃ দৌলত জামান	মৃত মন্তেজার রহমান	গোদাগাড়ী	
৩৯২.	মোঃ কামাল পাশা	মৃত মফিজ উদ্দিন প্রাং	নারচী	
৩৯৩.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত রইচ উদ্দিন তরফদার	চরহরিণা	
৩৯৪.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত আনছার আলী	শেখাহাতী	
৩৯৫.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত নের আলী বেপারী	ফাজিলপুর	
৩৯৬.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত রহমান আকন্দ	পারতিত পরল	
৩৯৭.	মোঃ সিরাজুল	মৃত লেছার	অন্তারপাড়া	
৩৯৮.	মৃত মোকছেদ আলী	করম আলী আকন্দ	পারতিত পরল	
৩৯৯.	মোঃ আনিছুর রহমান	মৃত রহিম উদ্দিন সরকার	পারতিত পরল	
৪০০.	ইব্রাহিম আলী	মৃত জিন প্রাং	পারতিত পরল	
৪০১.	মৃত মাহবুবুর রহমান	মৃত মুনছের আলী হানাদার	পারতিত পরল	
৪০২.	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত গোফার আকন্দ	পারতিত পরল	
৪০৩.	মৃত আঃ মালেক	মৃত নিজাম উদ্দিন মোল্যা	পারতিত পরল	
৪০৪.	মোঃ বদিউজ্জামান	মৃত আবুল কাসেম সরকার	পারতিত পরল	
৪০৫.	মৃত ছোলাইমান মন্ডল	মৃত নাদির মন্ডল	পারতিত পরল	
৪০৬.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত হামেদ আলী প্রাং	পারতিত পরল	
৪০৭.	শহিদুল হক	মৃত পরব আলী প্রাং	শালুকা	
৪০৮.	মোঃ আঃ ছালাম	মৃত ছাবেত আলী প্রাং	ধাপ	
৪০৯.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত আবুল হোসেন প্রাং	দারুন্দা	
৪১০.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মৃত চশমত প্রাং	বাঘবের	
৪১১.	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত কছিম আকন্দ	আন্তারপাড়া	
৪১২.	মোঃ এমদাদুল হক	মৃত মল্লিক উদ্দিন আকন্দ	দারুন্দা	
৪১৩.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত গোলাম উদ্দিন আকন্দ	বাঘবের	
৪১৪.	শ্রী দিলীপ কুমার	মৃত প্রভাত কুমার সাহা	বাঘবের	
৪১৫.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মৃত তৈয়াব আলী প্রাং	বাটিয়া	
৪১৬.	মোঃ ফারাজ উদ্দিন	মৃত পানজাব আলী	সারিয়াকান্দী	
৪১৭.	মোঃ আব্দুল আওয়াল	মৃত মোজাহার আলী মন্ডল	নিজতিত পরল	
৪১৮.	মৃত ফরহাদ হোসেন	মৃত জসিম উদ্দিন	সারিয়াকান্দী	
৪১৯.	মৃত মকছেদ আলী	মৃত কাজেম উদ্দিন প্রাং	ডচলাপাড়া	
৪২০.	মোঃ ছোহরাফ আলী	মৃত আয়েজ উদ্দিন সরকার	নান্দিয়ার পাড়া	
৪২১.	মোঃ ফরিদুল ইসলাম	মৃত জসিমুদ্দিন সরকার	নান্দিয়ার পাড়া	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৪২২.	মোঃ আমিনুল হক	মৃত মফিজ উদ্দিন সরকার	চরপাড়া	
৪২৩.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত জোব্বার আলী সরকার	চরপাড়া	
৪২৪.	মোঃ ইউনুছ আলী	মৃত আহম্মদ আলী মন্ডল	চরপাড়া	
৪২৫.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মোঃ নুরুল হোসেন সরকার	চরপাড়া	
৪২৬.	মোঃ নুরুল হক	মৃত মফিজ উদ্দিন আকন্দ	চরপাড়া	
৪২৭.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত নজির হোসেন সরকার	চরপাড়া	
৪২৮.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত দেরাছ উদ্দিন মন্ডল	উল্যাডাঙ্গা	
৪২৯.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত আজিজার রহমান প্রাং	উল্যাডাঙ্গা	
৪৩০.	মোঃ সেলিম উদ্দিন	মৃত কালিয়া প্রাং	উটার্কিয়ামারী	
৪৩১.	এ এইচ এম আবু ইসা	মৃত আঃ রহিম মন্ডল	উটার্কিয়ামারী	
৪৩২.	মোঃ সাজেদুল করিম	মৃত সিরাজুল ইসলাম মন্ডল	উটার্কিয়ামারী	
৪৩৩.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত পয়ান উদ্দিন সরদার	উটার্কিয়ামারী	
৪৩৪.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত নুরুল হোসেন প্রাং	মথুরাপাড়া	
৪৩৫.	মৃত সুরুত জ্জামান	মৃত ছিফাতুল্যা আকন্দ	মথুরাপাড়া	
৪৩৬.	মোঃ আব্দুল বাছেদ	মৃত আজিমুদ্দিন মন্ডল	চরপাড়া	
৪৩৭.	মোঃ ইয়াকুব আলী	আজিজার রহমান আকন্দ	নান্দিয়ার পাড়া	
৪৩৮.	ছাইদুর রহমান	মৃত চান প্রাং	নান্দিয়ার পাড়া	
৪৩৯.	ছোহরাফ আলী	মোঃ আঃ আজিজ সরকার	নান্দিয়ার পাড়া	
৪৪০.	এম এ ওয়াদুদ	মৃত খবির উদ্দিন মন্ডল	তালতলা	
৪৪১.	তবিবুর রহমান	মৃত মালেক সরকার	তালতলা	
৪৪২.	আঃ হামিদ	মৃত জরিতুল্যা প্রাং	উল্যাডাঙ্গা	
৪৪৩.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত তছির উদ্দিন	নিজপাটিয়া	
৪৪৪.	এস. এম সিরাজুল ইসলাম	মোঃ ছিফাতুল্লা মন্ডল	গারিয়াকান্দী	
৪৪৫.	এ এস এম সিরাজুল ইসলাম	মোঃ আবুল হায়াত	গারিয়াকান্দী	
৪৪৬.	শাহ রেজাউর রহমান	মৃত শাহ হামিদুর রহমান	আদবাড়ীয়া	
৪৪৭.	মোঃ তোজাম্মেল হোসেন	মৃত কাজেম উদ্দিন প্রাং	চরচন্দনবাইশা	
৪৪৮.	মোঃ মির্জা সাইফুল ইসলাম	মৃত মির্জা সিরাজুল হক বেগ	ঘুঘুমারী	
৪৪৯.	মোঃ শহীদ সরোয়ার	মৃত শমসের মন্ডল	ফাকদহ	
৪৫০.	মোঃ আঃ গাফফার	মৃত আফছার আলী খন্দকার	আদবারীয়া	
৪৫১.	মোঃ শাহ আব্দুল খালেক	মৃত শাহ আব্দুল জলিল	আদবারীয়া	
৪৫২.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত জসিম উদ্দিন খান	আওলাকান্দী	
৪৫৩.	মোঃ সাইদুর রহমান	মৃত তমিজ উদ্দিন সরকার	বোহাইল	
৪৫৪.	মোঃ আবুর হোসেন	মৃত নইম উদ্দিন	বোহাইল	
৪৫৫.	মোঃ সামছুল হক	মহির উদ্দিন আকন্দ	কুড়িপাড়া	
৪৫৬.	মোঃ চান মিয়া	মৃত খানু ফকির	কুড়িপাড়া	
৪৫৭.	মোঃ আলী	মৃত জোব্বার মন্ডল	কাজলা	
৪৫৮.	মোঃ আব্দুল হামিদ	মৃত মহি উদ্দিন আহম্মেদ	বেনীপুর	
৪৫৯.	মোঃ সোলায়মান আলী	মৃত পন্ডিত ফকির	কুড়িপাড়া	
৪৬০.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত আহম্মদ আলী	বিবির পাড়া	
৪৬১.	মৃত আব্দুল মান্নান	মৃত গিয়াস উদ্দিন সোনার	কামালপুর	
৪৬২.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মৃত হাজী জমসের প্রাং	গোদাখালী	
৪৬৩.	মৃত মতিয়ার রহমান	মৃত বসির প্রাং	কামালপুর	
৪৬৪.	মোঃ সামচুল বারী	মৃত আবদুল বারী	গোদাখালী	
৪৬৫.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত কলিম উদ্দিন মন্ডল	কামালপুর	
৪৬৬.	মোঃ আব্দুল কাদের	মৃত হাজী নঈমুদ্দিন	গোদাখালী	
৪৬৭.	মোঃ মহসীন আলী	মৃত নিজাম উদ্দিন প্রাং	গোদাখালী	
৪৬৮.	মোঃ নুর মোহাম্মদ	মোঃ মোজাম্মেল হক	মোহাদহ	
৪৬৯.	মৃত জাহাঙ্গীর আলম	মোঃ নজিবর রহমান	নাড়ুপাড়া	
৪৭০.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত ফয়েজ উদ্দিন	সুতানারা	
৪৭১.	মোহাম্মদ আলী	মৃত আমানত আলী প্রাং	হাওড়াখালী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৪৭২.	মোঃ আব্দুল সামাদ	মৃত রসুল মামুদ প্রাং	গোদাখালী	
৪৭৩.	মোঃ ওয়াজেদ আলী	মৃত নাজেম আলী মন্ডল	নিউ সোনাতলা	
৪৭৪.	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত মন্তেজার রহমান	ফুলবাড়ী	
৪৭৫.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত জব্বার আলী খা	দহপাড়া	
৪৭৬.	মৃত ছানা মিয়া	মৃত সর উদ্দিন	ফুলবাড়ী	
৪৭৭.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত মোসলেম উদ্দিন	ফুলবাড়ী	
৪৭৮.	মোঃ আঃ কাসেম	মৃত আলেম উদ্দিন প্রাং	ছাগলধরা	
৪৭৯.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত রমজান আলী প্রাং	কুতুবপুর	
৪৮০.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত মাছির উদ্দিন প্রাং	কুতুবপুর	
৪৮১.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত হাজী আহম্মদ আলী	কুতুবপুর	
৪৮২.	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত কাদের বকস প্রাং	ধলিরকান্দি	
৪৮৩.	মোঃ জর্জিস হোসেন	মৃত ছোলায়মান আলী প্রাং	সোনারতাইড়	
৪৮৪.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত কাদের বকস প্রাং	সোনারতাইড়	
৪৮৫.	মোঃ আব্দুর রেজ্জাক	মৃত ইব্রাহীম আকন্দ	দেবডাংগা	
৪৮৬.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত তছের উদ্দিন প্রাং	মাছির পাড়া	
৪৮৭.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত করিম বকস ফকির	বড়ইকান্দি	
৪৮৮.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মোঃ মোজাম্মেল হক প্রাং	বড়ইকান্দি	
৪৮৯.	মোঃ সহিদুল ইসলাম	মৃত সুবার উদ্দিন মন্ডল	বড়ইকান্দি	
৪৯০.	মোঃ দৌলতজ্জামান	মৃত আছমত উল্যা প্রাং	দেবডাংগা	
৪৯১.	মোঃ দিলবর রহমান	মৃত মহির উদ্দিন প্রাং	দেবডাংগা	
৪৯২.	মোঃ নজির হোসেন	মৃত মইচ উদ্দিন আকন্দ	বয়ড়াকান্দি	
৪৯৩.	মোঃ সাইদুল হক	মৃত হোসেন আলী প্রাং	ধলিরকান্দি	
৪৯৪.	মোঃ সওকত আলী	মৃত শুকুর মামুদ	মাছির পাড়া	
৪৯৫.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত জলিল বকস সঃ	পিজনর্দিবাড়ী	
৪৯৬.	মোঃ হজরত আলী	মৃত সমশের আলী	পিজনর্দিবাড়ী	
৪৯৭.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত মইচ উদ্দিন আকন্দ	দেবডাংগা	
৪৯৮.	মোঃ তোজ্জল হোসেন	মৃত ইছাহাক উদ্দিন	মাছিরপাড়া	
৪৯৯.	মোঃ সিকেন্দার আলী	মৃত ইংরেজ আলী প্রাং	মাছিরপাড়া	
৫০০.	মৃত আব্দুল হামিদ	মৃত বাহার উদ্দিন	জোড়গাছা	
৫০১.	মোঃ একরামুল হক	মৃত ফজলার রহমান	ছাইহাটা	
৫০২.	মোঃ শাহাদত হোসেন	মৃত আঃ ছামাদ মঃ	ছাইহাটা	
৫০৩.	মোঃ জহুরুল হক	মৃত মজিবর রহমান মঃ	ছাইহাটা	
৫০৪.	মোঃ ছামছুল আলম	মৃত জসিম প্রাং	ছাইহাটা	
৫০৫.	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত সাহার আলী প্রাং	ছাইহাটা	
৫০৬.	মৃত আঃ বাছেদ	মৃত সিদ্দিক মঃ	ছাইহাটা	
৫০৭.	মোঃ ইব্রাহীম খলিল	মৃত রহিম উদ্দিন প্রাং	ছাইহাটা	
৫০৮.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত ইলাহী বক্স মঃ	ছাইহাটা	
৫০৯.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত নুর মোহাম্মদ	বাঁশহাটা	
৫১০.	গিয়াস উদ্দিন	মৃত জসিম উদ্দিন	জোড়গাছা	
৫১১.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত জসিম উদ্দিন ফকির	জোড়গাছা	
৫১২.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত ইয়াকুব আলী	জোড়গাছা	
৫১৩.	মোঃ আফতাব হোসেন	মৃত মৌঃ মফিজ উদ্দিন প্রাং	সাতবেকী	
৫১৪.	মোঃ জহুরুল হক	মৃত আফাজ উদ্দিন	খোর্দ্দবলাইল	
৫১৫.	মোঃ আমিরুল ইসলাম	মৃত আবুল হোসেন	খোর্দ্দবলাইল	
৫১৬.	মোঃ ছোলায়মান আলী	মৃত নজির হোসেন	তাজুর পাড়া	
৫১৭.	মোঃ ছামছুল হক	মৃত রবিয়া বেপারী	তাজুর পাড়া	
৫১৮.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত আব্বাস আকন্দ	হাটশেরপুর	
৫১৯.	মোঃ গোলজার	মৃত মজিবুর	দাখাপাড়া	
৫২০.	মোঃ জলিল	মৃত মোতরাজ	খোর্দ্দবলাইল	
৫২১.	মোঃ আঃ বাছেদ	মৃত আজগর প্রাং	নিজলাইল	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৫২২.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত ফহিম প্রাং	নিজবলাইল	
৫২৩.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত ছাফাওয়াত	তাজুর পাড়া	
৫২৪.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত খোদা বক্স মন্ডল	দীঘাপাড়া	
৫২৫.	মোঃ আঃ ছালাম	মৃত ময়েন মন্ডল	হাটেশেরপুর	
৫২৬.	মোঃ কামরুল	মৃত আঃ গনী সরকার	নিজবরুরবাড়ী	
৫২৭.	ওয়াজেদ	মৃত জসিম উদ্দিন প্রাং	খোর্দ্দবলাইল	
৫২৮.	মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন	মৃত এনায়েতুল্যা	খোর্দ্দবলাইল	
৫২৯.	মোঃ খয়রাত জামান	মৃত আব্বাস উদ্দিন প্রাং	নয়াপাড়া	
৫৩০.	মোঃ সামচুল আলম	মৃত নছিম উদ্দিন আকন্দ	হাটশেরপুর	
৫৩১.	মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন	মৃত আছমত আকন্দ	খোর্দ্দবলাইল	
৫৩২.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত মফিজ উদ্দিন প্রাং	খোর্দ্দবলাইল	
৫৩৩.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত হায়দার প্রাং	চকরতিনাথ	
৫৩৪.	মোঃ আঃ সামাদ	মৃত আকালু বেপারী	তাজুর পাড়া	
৫৩৫.	মোঃ ছাখাওয়াত	মৃত রহিম খান	ধন্যারপাড়া	
৫৩৬.	মোঃ ফেরদৌস	মৃত নছিম উদ্দিন আঃ	হাটশেরপুর	
৫৩৭.	শ্রী জয়নাথ রাম দাস	মৃত যমুনা রাম দাস	দীঘাপাড়া	
৫৩৮.	এ কে এম মাকসুদার রহমান	মৃত মিজানুর রহমান আকন্দ	নারচী	
৫৩৯.	মোঃ জাবেদ আলী	মৃত কাবেজ	গনকপাড়া	
৫৪০.	মোঃ ফুল মিয়া	মৃত আকবার আলী আকন্দ	গনকপাড়া	
৫৪১.	মোঃ ইউসুফ আলী	মৃত আবদিন মন্ডল	গনকপাড়া	
৫৪২.	মোঃ টাইবুল হোসেন	মৃত আফতাব হোসেন	নারচী	
৫৪৩.	মোঃ জামাল উদ্দিন	মৃত ফয়িম উদ্দিন	গনকপাড়া	
৫৪৪.	মোঃ ফজলার রহমান	মোঃ গেফার উদ্দিন প্রাং	ফকির পাড়া	
৫৪৫.	মৃত আব্দুর রশিদ	মৃত লুৎফর রহমান	নারচী	
৫৪৬.	মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন	মৃত সামছ উদ্দিন প্রাং	চরগোদাগাড়ী	
৫৪৭.	মোঃ মজনুর রহমান	মৃত মোনছের আলী মন্ডল	চরগোদাগাড়ী	
৫৪৮.	মোঃ আহসান উল্যাহ	মোঃ চাঁন মিয়া প্রাং	কুপতলা	
৫৪৯.	মোঃ য়িকোবাদ	মৃত কাফুর উদ্দিন প্রাং	গোদাগাড়ী	
৫৫০.	মোঃ ফজলার রহমান	মৃত ময়েজ আহমেদ মন্ডল	চরগোদাগাড়ী	
৫৫১.	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মৃত ময়েজ উদ্দিন প্রাং	গোদাগাড়ী	
৫৫২.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত ময়েজ উদ্দিন প্রাং	গোদাগাড়ী	
৫৫৩.	মোঃ ছাইফুল ইসলাম	মৃত মোশারফ হোসেন	গোদাগাড়ী	
৫৫৪.	মোঃ লিয়াকত আলী	হাজী ছামেদ আলী প্রাং	গোদাগাড়ী	
৫৫৫.	এ এস রহমান	মৃত আতোয়ার হোসেন	নারচী	
৫৫৬.	মোঃ ইন্তেজার রহমান	মৃত রহমতুল্যা মন্ডল	নারচী	
৫৫৭.	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত কেরামত আলী	ফকির পাড়া	
৫৫৮.	মোঃ রইছ উদ্দিন	মৃত কিসমত সরকার	ফকিরপাড়া	
৫৫৯.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ কাটু মিয়া মন্ডল	চরহরিণা	
৫৬০.	মোঃ আব্দুল বারীক	মোঃ আহমতুল্যা	কুপতলা	
৫৬১.	মোঃ ইউনুছ আলী	মৃত আলতাব হোসেন	শেখাহাটী	
৫৬২.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সরকার	নায়েব আলী	মালিফদাইড়	
৫৬৩.	মোঃ আজিজার রহমান ফকির	মৃত হোসেন আলী	মালিফদাইড়	
৫৬৪.	মোঃ ছবলুল প্রাং	মৃত লালমিয়া প্রাং	চরহরিণা	
৫৬৫.	মোঃ আঃ বারী	মোঃ গোলাম উদ্দিন সরকার	নারচী	
৫৬৬.	মোঃ খাইরুল ইসলাম	মৃত আকছার (ভোলা ডাঃ)	নারচী	
৫৬৭.	মোঃ সাইদুল ইসলাম	মৃত ইজার উদ্দিন প্রাং	নারচী	
৫৬৮.	মোঃ মাহবুবর রহমান	মৃত জহুদর রহমান মন্ডল	নারচী	
৫৬৯.	মোঃ ফজলুল হক	মৃত আজিম উদ্দিন	গনকপাড়া	
৫৭০.	মোঃ জামাল উদ্দিন	মৃত লুৎফর রহমান প্রাং	গনকপাড়া	
৫৭১.	মোঃ আব্দুল বারীক	মৃত মহব্বত আলী	শেখাহাটী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৫৭২.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মৃত মালেক উদ্দিন সরকার	গনকপাড়া	
৫৭৩.	মোঃ সামছুজ্জোহা	মৃত আলীম উদ্দিন মন্ডল	গনকপাড়া	
৫৭৪.	একেএম সেলিম আহাম্মেদ	মৃত আছর উদ্দিন	ফকিরপাড়া	
৫৭৫.	মোঃ বদিউজ্জামান	মৃত আকবর আলী ফকির	ফকিরপাড়া	
৫৭৬.	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মৃত আমিরা মোল্লা	চরহরিণা	
৫৭৭.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মহির উদ্দিন প্রাং	টিউর পাড়া	
৫৭৮.	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত মোনছের আলী খন্দকার	স্বরতী	
৫৭৯.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত জাবেদ আলী	শেখাহাতী	
৫৮০.	একেএম আজাদ	মৃত মহসীন আলী	শেখাহাতী	
৫৮১.	মাহবুবুর রহমান	মৃত দৌলতজ্জামান প্রাং	শেখাহাতী	
৫৮২.	মৃত মাহ্মুদুর রহমান	মৃত দৌলতজ্জামান	শেখাহাতী	
৫৮৩.	মৃত আঃ মজিদ	মৃত দৌলতজ্জামান	শেখাহাতী	
৫৮৪.	মৃত ফারাজুল ইসলাম	মৃত ইলাম উদ্দিন প্রাং	বাঁশগাড়ী	
৫৮৫.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত জব্বার প্রাং	নিজ বলাইল	
৫৮৬.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত আহাম্মদ আলী	নিজ বলাইল	
৫৮৭.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত সোলাইমান আলী প্রাং	খোর্দ্দবলাইল	
৫৮৮.	মোঃ ফুল মিয়া	মৃত কাশু প্রাং	নিজবলাইল	
৫৮৯.	মোঃ আতাউর রহমান	মোঃ খয়রাত জামান	খোর্দ্দবলাইল	
৫৯০.	মোঃ নুরুননবী	মোঃ তহছিন প্রাং	খোর্দ্দবলাইল	
৫৯১.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত সামস উদ্দিন	নিজ বরুরবাড়ী	
৫৯২.	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত আয়েজ উদ্দিন	দিঘাপাড়া	
৫৯৩.	মোঃ নবির উদ্দিন	মৃত খলিলুর রহমান	নিজ বলাইল	
৫৯৪.	সোহরাব হোসেন	মৃত আঃ ছাত্তার	দিঘাপাড়া	
৫৯৫.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত তহির উদ্দিন	হাটশেরপুর	
৫৯৬.	মোঃ আব্দুর রহিম	মৃত বেলায়েত	হাটশেরপুর	
৫৯৭.	মোঃ ছায়েদুজ্জামান	মৃত রবিয়া বেপারী	তাজুরপাড়া	
৫৯৮.	মোঃ ছালেক উদ্দিন	মৃত রবিয়া বেপারী	তাজুরপাড়া	
৫৯৯.	মোঃ সামছুল হক	মৃত রবিয়া বেপারী	তাজুর পাড়া	
৬০০.	মোঃ সফিকুল ইসলাম	মৃত আবদুল হামিদ মন্ডল	নিজবরুরবাড়ী	
৬০১.	আঃ জলিল	মৃত জসিম উদ্দিন সরকার	নিজবলাইল	
৬০২.	মোঃ সাহাবুল	মোঃ নুরুল ইসলাম	নিজবলাইল	
৬০৩.	নইম উদ্দিন	মোঃ কেরামত মোল্লা	নিজবলাইল	
৬০৪.	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মৃত মজিতুল্যা সরকার	দিঘাপাড়া	
৬০৫.	মৃত মোস্তেজার রহমান	মৃত তছলিম আঃ	নিজ বরুরবাড়ী	
৬০৬.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত কইম উদ্দিন	নিজ বলাইল	
৬০৭.	মোঃ আশরাফুল আলম	মৃত আবুল হোসেন প্রাং	খোর্দ্দবলাইল	
৬০৮.	মৃত এ এস এম ইবনে আজিজ	মৃত আঃ আজিজ	তাজুর পাড়া	
৬০৯.	আবু তৈয়ব খান	মৃত এনায়েতুল্লা খান	শাকদহ	
৬১০.	মশিউর রহমান	মৃত শাহ মুনছুর রহমান	আদবাড়ীয়া	
৬১১.	এ কে এম ফিরোজ উদ্দিন	মৃত আব্দুল হক	আদবাড়ীয়া	
৬১২.	মোঃ বেলাল হোসেন	মৃত কোববাদ আলী	চন্দনবাইশা	
৬১৩.	শাহ আঃ মাজেদ	মৃত আঃ মালেক	শাকদহ	
৬১৪.	মোঃ ছাইফুল ইসলাম	মৃত আব্দুল মজিদ আকন্দ	চরচন্দনবাইশা	
৬১৫.	মোঃ জিল্লুর রহমান	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার	পারতিত পরল	
৬১৬.	মোঃ তাছিকুল ইসলাম	মোঃ আলতাফ হোসেন প্রাং	পারতিত পরল	
৬১৭.	মোঃ আলী আজগর	মোঃ হাবিবুর রহমান প্রাং	চরবাটিয়া	
৬১৮.	মোঃ মাহফুজার রহমান	মোঃ হোসেন আলী মন্ডল	পাইকপাড়া	
৬১৯.	মোঃ শাহাদত হোসেন	মোঃ নজিবর হোসেন সরকার	পারতিত পরল	
৬২০.	মৃত হাফিজার রহমান	মোঃ খাজা প্রাং	দেলুয়াবাড়ী	
৬২১.	মোঃ আঃ করিম	মোঃ তৈয়ব আলী প্রাং	শলুখা	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৬২২.	মোঃ আজিজুর রহমান	মোঃ তৈয়ব আলী প্রাং	শালুখা	
৬২৩.	মোঃ এমদাদুল হক	মোঃ ছাদেক আলী প্রাং	পারতিত পরল	
৬২৪.	আফতাব হোসেন	রফাতুল্লাহ বেপারী	অন্তারপাড়া	
৬২৫.	মোঃ আঃ মালেক	মোঃ মজিবর রহমান	বাগবেড়	
৬২৬.	মো' আজিজার রহমান	মৃত ছাফর উদ্দিন	বাটিয়া	
৬২৭.	আব্দুল মান্নান	মৃত ময়েন প্রাং	বাটিয়া	
৬২৮.	মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ	মৃত মহিউদ্দিন	বাড়ইপাড়া	
৬২৯.	ফিরোজ উদ্দিন	মৃত বাদিজ উদ্দিন মন্ডল	বাড়ইপাড়া	
৬৩০.	মোঃ জিল্লুর রহমান	সাইতুল্যাহ প্রাং	চান্দিনা নোয়ারপাড়া	
৬৩১.	মাহফুজার রহমান	মৃত আছর প্রাং	ঐ	
৬৩২.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত মফিজ উদ্দিন	গোজারিয়া	
৬৩৩.	আবু জালাল	মৃত রিয়াজ উদ্দিন আকন্দ	ধনতলা	
৬৩৪.	মোঃ আব্দুল বারী	মৃত আজিম উদ্দিন প্রাং	ছাগলধরা	
৬৩৫.	মোঃ মাহফুজার রহমান	মৃত মনছুর প্রাং	ধনতলা	
৬৩৬.	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত আছির উদ্দিন	দারসনা	
৬৩৭.	মোঃ আঃ বাছেত	মৃত সারাফাত উল্যাহ	পারতিত পরল	
৬৩৮.	মোঃ মফিজুর রহমান	মৃত সমসের আকন্দ	দেলুয়াবাড়ী	
৬৩৯.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত আঃ রহমান আকন্দ	পারতিত পরল	
৬৪০.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত ফানাতুল্লাহ প্রাং	বারুইপাড়া	
৬৪১.	মোঃ সুরুজ্জামান	মৃত ছহির উদ্দিন প্রাং	বাগবের	
৬৪২.	মোঃ মোখলেছুর রহমান	মৃত আহম্মেদ আলী	ধাপ	
৬৪৩.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত তছির উদ্দিন আকন্দ	নিজবাটিয়া	
৬৪৪.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত আছির উদ্দিন সরকার	পারতিত পরল	
৬৪৫.	একেএম শুরুজ্জামান	ছাদেক আলী প্রাং	চরবাটিকা	
৬৪৬.	মোঃ আব্দুল ছাত্তার	মোঃ ঈমান আলী	মাকবাড়ী	
৬৪৭.	মোঃ বাবলু মিয়া	মৃত মনছের আলী	রামচন্দ্রপুর	
৬৪৮.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত ইফাজ উদ্দিন	চরতুমকান্দি	
৬৪৯.	এবিএম রেজাউল করিম মতিন	মোঃ তছলিম উদ্দিন মন্ডল	রামনগর	
৬৫০.	মোঃ জিল্লুর রহমান	মৃত আছমত আলী	চাপীবাড়ী	
৬৫১.	মৃত খাদেমুল ইসলাম	মৃত কাদের বক্স	ফুলবাড়ী	
৬৫২.	মোঃ শফিউল ইসলাম	মৃত এতেয়াম হোসেন মন্ডল	রামনগর	
৬৫৩.	মোঃ রেজাউল করিম মন্টু	মৃত আজিম উদ্দিন	রামনগর	
৬৫৪.	মোঃ মতিউর রহমান (মহছিন)	মৃত ইফাজ মন্ডল	ফুলবাড়ী	
৬৫৫.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মৃত কাজেম উদ্দিন মন্ডল	ছাগলধরা	
৬৫৬.	মৃত আঃ ছালাম (দুলু)	মৃত গনি ফকির	ফুলবাড়ী	
৬৫৭.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মৃত নায়েব আলী মন্ডল	তুমকান্দি	
৬৫৮.	মৃত সাইদুর রহমান প্রাং	মৃত ফয়েজ প্রাং	তুমকান্দি	
৬৫৯.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত তপিল উদ্দিন	তুমকান্দি	
৬৬০.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত রইচ উদ্দিন	ছাগলধরা	
৬৬১.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত ছামেদ আলী মন্ডল	হরিণা	
৬৬২.	মোঃরফিকুল ইসলাম	মৃত ইছাহাক প্রাং	চরপাড়া	
৬৬৩.	মোঃ মকছেদ আলী	মৃত নজির হোসেন সরকার	চিলাপাড়া	
৬৬৪.	মোঃ মকছেদ আলী	মৃত নজির হোসেন সরকার	চিলাপাড়া	
৬৬৫.	মোঃ আঃ গনি	মৃত মজিবর রহমান	নান্দীয়ার পাড়া	
৬৬৬.	মোঃ আঃ হাকিম মোল্লা	মৃত ইলাহী বকস মোল্লা	ফটকিয়ামারী	
৬৬৭.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত ইছারতুল্যাহ প্রাং	চরপাড়া	
৬৬৮.	মোঃ বজলুর রহমান	মৃত গোলাম রহমান সরকার	নান্দীয়ার পাড়া	
৬৬৯.	মৃত শাহজাহান আলী	মৃত নজির হোসেন সরকার	চরপাড়া	
৬৭০.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত নরুল হক সরকার	নান্দিয়ার পাড়া	
৬৭১.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত ওছমান গনি আকন্দ	নায়াপালা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৬৭২.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত কালিম উদ্দিন প্রাং	চরপাড়া	
৬৭৩.	মোঃ আব্দুর রশীদ মন্ডল	মৃত সরাফত আলী মন্ডল	ইছামারী	
৬৭৪.	কেএম মোখলেছুর রহমান	মৃত আকিম উদ্দিন	রোহাদহ	
৬৭৫.	মোঃ শাহাজাহান আলী	মৃত আলহাজ্ব সামসুর রহমান	রোহাদহ	
৬৭৬.	মোঃ কফিল উদ্দিন	মৃত কলিম উদ্দিন	কামালপুর	
৬৭৭.	মোঃ ফারুক খান	আঃ মজিদ খান	রোহাদহ	
৬৭৮.	মোঃ আবু আশরাফ	মৃত মোবারক আলী	খিথিরপাড়া	
৬৭৯.	মোঃ নুরুন্নবী	মৃত কাদের বকস প্রাং	বড়ইকান্দি	
৬৮০.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত ইছাহাক উদ্দিন আকন্দ	দেবডাংগা	
৬৮১.	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	মৃত লোকমান সাকিদার	ধলীকান্দি	
৬৮২.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত মনছের আলী মন্ডল	মাছির পাড়া	
৬৮৩.	মৃত আনিছার রহমান	মৃত আব্দুল প্রাং	মাছির পাড়া	
৬৮৪.	মোঃ আনিছার রহমান	মৃত মহিতা উদ্দিন প্রাং	দেবডাংগা	
৬৮৫.	মোঃ বদিউজ্জামান	মৃত আকবর হোসেন সরকার	সোনারতাইড়	
৬৮৬.	মোঃ ইনছার আলী	মৃত জয়েন উদ্দিন	দেবডাংগা	
৬৮৭.	আবু আশরাফ সরকার	মৃত জহির উদ্দিন	কুতুবপুর	
৬৮৮.	মৃত দবির উদ্দিন	মৃত আহম্মেদ আলী	মাছির পাড়া	
৬৮৯.	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত পিয়ার আলী প্রাং	মাছির পাড়া	
৬৯০.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত ছাহির উদ্দিন	মাছির পাড়া	
৬৯১.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত বায়তুল্যাহ মোল্লা	মাছির পাড়া	
৬৯২.	মৃত হামদাদ হেলাল	মৃত তফের উদ্দিন মন্ডল	ধলিরকান্দি	
৬৯৩.	মোঃ দিলবার রহমান	মৃত মহির উদ্দিন প্রাং	দেবডাংগা	
৬৯৪.	মোঃ সাহেব আলী	মৃত আজগর আলী মন্ডল	মাছিরপাড়া	
৬৯৫.	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত মফিজ উদ্দিন মন্ডল	মাছিরপাড়া	
৬৯৬.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত ইংরেজ প্রাং	মাছিরপাড়া	
৬৯৭.	মৃত দৌলতজামান	মৃত বাবু সরকার	কুড়িপাড়া	
৬৯৮.	মোঃ আঃ লতিফ	মৃত নফের খান	কুড়িপাড়া	
৬৯৯.	মোঃ লাল মিয়া ফকির	মৃত খানু ফকির	কুড়িপাড়া	
৭০০.	মোঃ আঃ ছালেক	মৃত ইয়াছিন আলী	বেনীপুর	
৭০১.	মোঃ শামছুল হক	মৃত ইয়ানত আলী প্রাং	কাজলা পশ্চিমপাড়া	
৭০২.	মোঃ আব্দুল আলী শেখ	মৃত ইদ্রিস আলী শেখ	চর ঘাগুয়া	
৭০৩.	মোঃ শামছুল হক	মৃত মহির উদ্দিন প্রাং	কুড়িপাড়া	
৭০৪.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত আসফর আলী সরকার	ছাইহাটা	
৭০৫.	মোঃ ছাদেক আলী	মৃত ইলাহী প্রাং	ছাইহাটা	
৭০৬.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত নাজেম উদ্দিন	ছাইহাটা	
৭০৭.	মোঃ শের আলী	মৃত জাহের আলী প্রাং	ছাইহাটা	
৭০৮.	মোঃ আঃ বারী	মৃত ডাঃ আঃ জব্বার মন্ডল	ছাইহাটা	
৭০৯.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত মছিম উদ্দিন প্রাং	জোড়গাছা	
৭১০.	মোঃ আবেদুর রহমান	মৃত ডাঃ মোঃ মসলেম উদ্দিন	জোড়গাছা	
৭১১.	একেএম শামসুউদ্দিন	মৃত আবু মেছের সরকার	বোহালী	
৭১২.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত আবু তৈয়ব সরকার	বোহালী	
৭১৩.	মোঃ ছাইফুল ইসলাম	মৃত নওশের আলী সরকার	বোহালী	
৭১৪.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত আমজাদ হোসেন সরকার	বোহালী	
৭১৫.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত ময়েন উদ্দিন সরকার	বোহালী	
৭১৬.	মোঃ রফিকুল ইসলাম (বাচ্চু)	মৃত আঃ গনি খান	কোটিয়া	
৭১৭.	মোঃ আমিনুর ইসলাম	মৃত হোসেন আলী	আওলাকান্দি	
৭১৮.	মোঃ রেজাউল করিম নবা	মৃত রহিম বকস আকন্দ	আওলাকান্দি	
৭১৯.	এনামুল হক বুলু	মোঃ আলহাজ কছির উদ্দিন	আওলাকান্দি	
৭২০.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত নওজেশ আলী	আওলাকান্দি	

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৭২১.	মোঃ হুমায়ন আলম (চান্দু)	মৃত মজিবর রহমান	জয়ভোগ	
৭২২.	মোঃ মোরতোজা আলী (মজনু)	মোঃ মোজাম্মেল হক	হামিদপুর	
৭২৩.	মোঃ আঃ মালেক	মৃত লতিফুল্যাহ মন্ডল	হামিদপুর	
৭২৪.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত রবিয়া আকন্দ	জয়ভোগ	
৭২৫.	মোঃ শামছুল আলম	মৃত মহসিন আলী	নারুয়ামালা	
৭২৬.	মোঃ আঃ রহমান	মৃত রমজান আলী	হোসেনপুর	
৭২৭.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত আফসার উদ্দিন	ধলিরচড়	
৭২৮.	মোঃ মোজাহার আলী	মৃত কাজেম উদ্দিন প্রাং	উচচুলখী	
৭২৯.	মোঃ আয়েন উদ্দিন	মৃত নবির উদ্দিন মোল্লা	ক্ষিদ্রপেড়ী	
৭৩০.	এটিএম আমিরুল ইসলাম	মোঃ আফজাল হোসেন	গোড়দহ উঃ পাড়া	
৭৩১.	মোঃ আমিরুল মমিন (মুক্তার)	মোঃ আফজাল হোসেন	গোড়দহ	
৭৩২.	মোঃ আনিছার রহমান	মৃত বয়েজউদ্দিন	সোন্দাবাড়ী	
৭৩৩.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত ডাঃ আঃ কাদের	উনচুরখী	
৭৩৪.	মোঃ দুলু মিয়া মন্ডল	মৃত ইজ্জতউল্লাহ	উনচুরখী	
৭৩৫.	মোঃ আলী হায়দার	মৃত তৈয়ব উদ্দিন	ক্ষিদ্রপেড়ী	
৭৩৬.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত আকামুদ্দিন	গোড়দহ	
৭৩৭.	মোঃ মতিউর রহমান	মোঃ জব্বার ফকির	সোন্দাবাড়ী	
৭৩৮.	যুদ্ধাহত ভুলু মিয়া	মৃত তছিম মোল্লা	দুর্গাহাটা	
৭৩৯.	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	মোঃ আজিমুদ্দিন মোল্লা	দুর্গাহাটা	
৭৪০.	শ্রী ধরেন্দ্র নাথ রায়	মৃত কর্নধর রায়	নিশিন্দারা	
৭৪১.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত আজগর আলী	নিশিন্দারা	
৭৪২.	মোঃ হাবিবুল হক	মোঃ আলতাফ হোসেন	বাগবাড়ী	
৭৪৩.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত গিয়াস উদ্দিন মন্ডল	নশীপুর	
৭৪৪.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত নাছির উদ্দিন	নশিপুর	
৭৪৫.	মোঃ গোলাম সুলতান	মৃত জসিমউদ্দিন	নশিপুর	
৭৪৬.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত খেজমতুল্লাহ	উজগ্রাম	
৭৪৭.	মোঃ নাছিম উদ্দিন	মৃত কছিমদ্দিন সরকার	উজগ্রাম	
৭৪৮.	মোঃ তফিয়ার রহমান	মৃত হযরত আলী	উজগ্রাম	
৭৪৯.	মোঃ মোস্তেজার রহমান	মৃত সোলেমান আলী	উজগ্রাম	
৭৫০.	মোঃ ফজলুল হক	মৃত হাবিবুর রহমান	উজগ্রাম	
৭৫১.	মোঃ আঃবাছেদ	মৃত নাজিমুদ্দিন	উজগ্রাম	
৭৫২.	মোঃ মোহাম্মদ আলী	মৃত মোসলেমুদ্দিন	উজগ্রাম	
৭৫৩.	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	মৃত খয়বর আলী	উজগ্রাম	
৭৫৪.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত নাসির উঃ আকন্দ	উজগ্রাম	
৭৫৫.	শ্রী সেবেন চন্দ্র রায়	মৃত দীন বন্ধু রায়	নিশিন্দারা	
৭৫৬.	মোঃ ফুল মিয়া	মৃত তছিম উদ্দিন	হাতী বান্দা	
৭৫৭.	মৃত ইসমাইল হোসেন	মৃত ইব্রাহিম আলী	লাদুরা পাড়া	
৭৫৮.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত ইউসুপ আলী	সালিয়ান ডাংগা	
৭৫৯.	মোঃ জয়নাল আবেদিন	মৃত ইয়াদ আলী	সাহাপুর	
৭৬০.	শ্রী রনজিত কুমার	মৃত রামলাল	বেলতলা	
৭৬১.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত বাবন আলী	বেলতলা	
৭৬২.	মোঃ লাল মিয়া	মৃত মফিজউদ্দিন	গজারিয়া	
৭৬৩.	মোঃ মহসিন আলী	মৃত রহিজ উদ্দিন	আটাপাড়া	
৭৬৪.	মৃত সাবেদ আলী	মৃত মতেজার রহমান	সাবেক পাড়া	
৭৬৫.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত ইমান উদ্দিন	তেলিহাটী	
৭৬৬.	মোঃ ইব্রাহিম আলী	মৃত মহর উল্লাহ	ঢকমান্না	
৭৬৭.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত মফর উদ্দিন	জাগুলী	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৭৬৮.	মোঃ ইউনুছ আলী	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	মাঝপাড়া	
৭৬৯.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত আফজাল হোসেন	জাগুলী	
৭৭০.	মোঃ আব্দুল গফুর মোল্লা	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	নিতপাড়া	
৭৭১.	মোঃ মন্তেজার রহমান	মৃত খুদ মাহমুদ	জাগুলী	
৭৭২.	মোঃ ইব্রাহিম আলী	মৃত তমির উদ্দিন	মাঝপাড়া	
৭৭৩.	মোঃ শাহজাহান (বাবলু)	মোঃ আফজাল হোসেন	মাঝপাড়া	
৭৭৪.	মোঃ লাল মিয়া	মোঃ ছমির উদ্দিন	পূর্বতেজপাড়া	
৭৭৫.	মোঃ আফাজ উদ্দিন	মোঃ রমজান আলী	পূর্ব তেজপাড়া	
৭৭৬.	মোঃ চান মিয়া	মোঃ ইজার উদ্দিন	মাঝপাড়া	
৭৭৭.	মোঃ আফছার আলী	মোঃ রবিয়া মন্ডল	পূর্ব তেজপাড়া	
৭৭৮.	মোঃ আকবর আলী	মৃত আছির উদ্দিন	নিতপাড়া	
৭৭৯.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত নাছির উদ্দিন	হোসেনপুর	
৭৮০.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত নবির উদ্দিন সরকার	হামিদপুর	
৭৮১.	খাজা নাজিমদ্দিন (খাজা)	মৃত হাছেন আলী আঃ	জয়ভোগা	
৭৮২.	মোঃ আবুল কালাম	মৃত মোহাম্মদ আলী	জয়ভোগা	
৭৮৩.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত মজিবর রহমান	জয়ভোগা	
৭৮৪.	শহিদুল ইসলাম খোকা	মৃত লাল মোহাম্মদ	জয়ভোগা	
৭৮৫.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোসলেম উদ্দিন	বাহাদুরপুর	
৭৮৬.	শ্রী বিনয় কুমার মন্ডল	মৃত নরেশ চন্দ্র মন্ডল	নারুল্যামালা	
৭৮৭.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত সমজান আলী	চাকলা	
৭৮৮.	মোঃ আবুল কাসেম	মৃত জসিম উদ্দিন	মেন্দিপুর	
৭৮৯.	মোঃ আনিছার রহমান	মৃত আফছার আলী	বাহাদুরপুর	
৭৯০.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মৃত জহির উদ্দিন	জয়ভোগা	
৭৯১.	মোঃ মোতাহার আলী	মৃত আহালতজ্জামান	সয়াতলা	
৭৯২.	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	মৃত দিদার উদ্দিন	বুরুজ	
৭৯৩.	মৃত গোলাম হোসেন	মৃত লেছার উদ্দিন	বুরুজ	
৭৯৪.	মোঃ মাহবুব আলম	মৃত লুৎফর রহমান	বুরুজ	
৭৯৫.	মোঃ ফজলুল করিম	মৃত আঃ গফুর	বুরুজ	
৭৯৬.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত রশমতুল্লাহ	বুরুজ	
৭৯৭.	মোঃ আব্দুল আজিজ	মৃত ইয়াছিন আলী	জাতহলিদা	
৭৯৮.	শ্রী সন্তোষ কুমার	মৃত হেমন্ত কুমার	দেওনাই	
৭৯৯.	মৃত রসুল মাহমুদ	মৃত ধন মাহমুদ খান	চকসেকেন্দার	
৮০০.	মৃত আব্দুল মজিদ	মৃত আব্দুল মালেক	গোড়দহ	
৮০১.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মোঃ হযরত মন্ডল	উনচুরখী	
৮০২.	মৃত হানিফ সরকার	মৃত মফিজ সরকার	উনচুরখী	
৮০৩.	মোঃ মন্তেজার রহমান	মৃত হোসেন প্রাং	উনচুরখী	
৮০৪.	মোঃ ছায়েদ আলী মন্ডল	মৃত শফাতুল্লাহ মন্ডল	গাবতলী	
৮০৫.	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	মৃত সাহেবুল্লাহ	বাইগুনী	
৮০৬.	মৃত আঃ রহিম (তোতা)	মৃত রমজান আলী	নালন্দা পাড়া	
৮০৭.	মৃত সালেক উদ্দিন	মৃত রজিব উদ্দিন ফকির	দুর্গাদিয়া	
৮০৮.	মৃত মোসলেম উদ্দিন	মৃত আব্বাস আলী	নড়ের বাড়ী	
৮০৯.	মৃত ফজলুর রহমান	মৃত জাগিলা সরকার	দুর্গাহাটা	
৮১০.	মৃত আব্দুল জলিল	মৃত কয়মান আলী	দুর্গাহাটা	
৮১১.	মৃত কবির হোসেন	মৃত আব্দুল হোসেন	কালায় হাটা	
৮১২.	মৃত নুরুল ইসলাম	মৃত মনছের আলী প্রাং	তল্লাতলা	
৮১৩.	মৃত সোলায়মান	মৃত মোসলেম উদ্দিন	কালায়হাটা	
৮১৪.	মৃত মোফাজ্জল হোসেন	মোঃ মোবারক আলী	কালায়হাটা	
৮১৫.	মোঃ আমির হোসেন	মৃত সোনাউল্লাহ	কালায়হাটা	
৮১৬.	মোঃ খলিলুর রহমান	মোঃ মনছের আলী	তল্লাতলা	
৮১৭.	মোঃ বদিউজ্জামান	মৃত কয়ম উদ্দিন	কালায়হাটা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৮১৮.	মোঃ মোখলেছুর রহমান	মৃত কিনু প্রাং	কালায়হাটা	
৮১৯.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত এবারক আলী	কালায়হাটা	
৮২০.	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মনছের আলী	কালায়হাটা	
৮২১.	মোঃ আব্দুল মালেক	মৃত মত্তলা বক্স	সালিয়ান ডাংগা	
৮২২.	মোঃ আব্দুল করিম	মৃত সোবহান উদ্দিন	পেড়ী	
৮২৩.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মৃত হাবিবুর রহমান	উজগ্রাম	
৮২৪.	মোঃ শৈলেস চন্দ্র	মৃত জগবন্দু রায়	নিশিন্দারা	
৮২৫.	মোঃ ভবানি চরন সিংহ	মৃত গনেশ চন্দ্র	নিশিন্দারা	
৮২৬.	মোঃ হামিদুর রহমান	মৃত মজিবর রহমান	নশিপুর	
৮২৭.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মৃত ইছাহাক মন্ডল	হোড়ার দিঘী	
৮২৮.	মোঃ আলতাফ আলী	মোঃ মোবারক আলী	উজগ্রাম	
৮২৯.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত মোজাহার আলী	উজগ্রাম	
৮৩০.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত তছলিম উদ্দিন	কৃষ্ণচন্দ্রপুর	
৮৩১.	মোঃ হাফিজার রহমান (১)	মৃত আমির উদ্দিন মোল্লা	উজগ্রাম	
৮৩২.	মোঃ হাফিজার রহমান (২)	মৃত মোহাম্মদ আলী	কৃষ্ণচন্দ্রপুর	
৮৩৩.	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	মৃত মন্তেজার রহমান	জাতিহালিদা	
৮৩৪.	মোঃ সাহালত হোসেন	মৃত আছির উদ্দিন	সাহাপুর	
৮৩৫.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত নবীর উদ্দীন	মীরপুর	
৮৩৬.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত তালেবালী	হিজলী	
৮৩৭.	মোঃ আমিনুল হক	মোঃ ইউনুছ মন্ডল	দেওনাই	
৮৩৮.	এ টি এম মান্নান	মৃত আবেদ আলী	কবির পাড়া	
৮৩৯.	শ্রী শংকর কুমার রায়	মৃত বিনোদ রায়	নুতুরপড়া	
৮৪০.	মৃত আজগর আলী	মৃত নঈমুদ্দিন	তেলিহাটা	
৮৪১.	মোঃ তোবারক হোসেন	মৃত রমজান আলী	তাতুড়া	
৮৪২.	মোঃ আতাউর রহমান	মোঃ আব্বাছ আলী	তেলিহাটা	
৮৪৩.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত মোহাম্মদ আলী	তাতুড়ীয়া	
৮৪৪.	মোঃ হাছেন আলী	মৃত ময়েজ উদ্দিন	আটাপাড়া	
৮৪৫.	মোঃ আনছার আলী	মৃত আবুল কাশেম	পারসরদনকুটি	
৮৪৬.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	সখলকুটি	
৮৪৭.	মোঃ ইব্রাহিম আলী	মৃত আফছার আলী	লশকুড়ি পাড়া	
৮৪৮.	মৃত হাফিজার রহমান (গামা)	মৃত হারেজ উদ্দিন	আটবাড়িয়া	
৮৪৯.	মোঃ আঃ রশিদ (খাজা)	মৃত ইব্রাহিম আলী প্রাং	শুভপাড়া	
৮৫০.	মোঃ রবিউল করিম	মৃত ছইমুদ্দিন মন্ডল	শুভপাড়া	
৮৫১.	মোঃ ইউনুছ আলী	মৃত গোলাম রহমান	কামারচর	
৮৫২.	মোঃ খেয়াল উদ্দিন	মৃত গোলাম রহমান	কামারচর	
৮৫৩.	মোঃ আঃ গফুর সাকিদার	মৃত গিয়াস উদ্দিন	দিতপাড়া	
৮৫৪.	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মৃত মহির উদ্দিন	হোসেনপুর	
৮৫৫.	মোঃ ইছাহাক আলী	মৃত বিরাজ উদ্দিন	হোসেনপুর	
৮৫৬.	মোঃ কোব্বাদ আলী	মৃত জসিম উদ্দিন	উত্তর পাড়া	
৮৫৭.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত বাহার উদ্দিন	জাগুলী	
৮৫৮.	মোঃ আমান উল্লাহ	হ্মমত মজিবর রহমান	জাগুলী	
৮৫৯.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত ভোলাজুল হক	জাগুলী	
৮৬০.	মোঃ মনজুর মোর্শেদ (সাজু)	মৃত সাবির উদ্দিন	হামিদপুর	
৮৬১.	মৃত নুরুল ইসলাম (খাজা)	মৃত ইব্রাহিম মন্ডল	হামিদপুর	
৮৬২.	মোঃ আবেশ আলী	মৃত হাতেম আলী	বাবুইতৌলা	
৮৬৩.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত রমজান আলী	বাহাদুরপুর	
৮৬৪.	মোঃ শামছুল ইসলাম	মৃত তৈয়ব উদ্দিন	বাহাদুরপুর	
৮৬৫.	মোঃ আমির হোসেন	মৃত আজগর আলী	বাহাদুরপুর	
৮৬৬.	শ্রী গোকুল চন্দ্র দাস	মৃত গৌড় চন্দ্র দাস	নারুয়ামালা	
৮৬৭.	শ্রী অনিল চন্দ্র দাস	মৃত গৌড় চন্দ্র দাস	নারুয়ামালা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৮৬৮.	মোঃ মোজাফফর হোসেন	মৃত কিয়ামতুল্লাহ প্রাং	মধাকাতুলী	
৮৬৯.	মোঃ শামছুল হক	মৃত মফিজ উঃ সাকিদার	যুগুজ	
৮৭০.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আহম্মেদ আলী মোল্লা	চকড়াধিকা	
৮৭১.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত আবুল কাশেম	যুগুজ	
৮৭২.	মোঃ তছলিম উদ্দিন	মৃত ছলিমদ্দিন	শালুকগাড়ী	
৮৭৩.	মোঃ ইউনুছ উদ্দিন	মৃত আহম্মদ আলী	যুগুজ	
৮৭৪.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মোঃ রাজিব উদ্দিন	যুগুজ	
৮৭৫.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত আয়েন উদ্দিন	যুগুজ	
৮৭৬.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত আয়েন উদ্দিন	কাজলাপাড়া	
৮৭৭.	মোঃ ছয়েদুজ্জামান	মৃত ইসমাইল হোসেন	চকড়াধিকা	
৮৭৮.	মোঃ তহসিন আলী	মোঃ মাছিম উদ্দিন	যুগুজ	
৮৭৯.	একেএম ফজলুল হক	মৃত তছিম উদ্দিন	যুগুজ	
৮৮০.	মোঃ আলতাফ হুসাইন	মৃত আলীমুদ্দিন মন্ডল	শাহাবাজপুর	
৮৮১.	মোঃ মোছলেম উদ্দিন	মৃত রহিমদ্দিন	ফলমতলী	
৮৮২.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত ছালামতুল্লাহ	ধলিরচড়	
৮৮৩.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত মোহাম্মদ আলী	ধলিরচড়	
৮৮৪.	মোঃ শাহ আলম	মৃত আঃ গফুর আলী	সুখান পুকুর	
৮৮৫.	মোঃ আমিরুল ইসলাম	মৃত হোসেন মন্ডল	জাতহলিদা	
৮৮৬.	মোঃ চাঁন মিয়া	মৃত মিনহাজ উদ্দিন	চকরাদিয়া	
৮৮৭.	মোঃ জাহেরুল ইসলাম	মৃত নওশের আলী	ধলিরচড়	
৮৮৮.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত আমির উদ্দিন	চকভওড়	
৮৮৯.	মোঃ আবদুল আজিজ	মৃত গোলাম রহমান	সাতিটিকড়ী	
৮৯০.	মোঃ লাল মিয়া	মৃত নঈম উদ্দিন	ফলমতলী	
৮৯১.	মোঃ জাফর আলী	মৃত আজিমুদ্দিন	চকভওর	
৮৯২.	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত মকছের আলী	চকড়াদিয়া	
৮৯৩.	মোঃ আলী আকবর	ছুই তুল্লাহ প্রাং	ধলিরচড়	
৮৯৪.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত রজব উদ্দিন	ধলিরচড়	
৮৯৫.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত মোতরাজ আলী	সুখানি পুকুর	
৮৯৬.	নারায়ন রবিদাস	মৃত রতন চন্দ্র রবিদাস	জাত হলিদা	
৮৯৭.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মৃত সোলেমান সরকার	গোড়দহ	
৮৯৮.	মোঃ আব্দুল হক	মোঃ তৈয়ব উঃ মোল্লা	চকসেকেন্দার	
৮৯৯.	শহীদ জাহেদুর রহমান	মৃত মোস্তাফিজার রহমান	উনচুরখী	
৯০০.	মোঃ আব্দুস সোবহান	মৃত মফিজউদ্দিন	তরফসর তাজ	
৯০১.	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত আবু সুফিয়ান	চকঘোড়াই	
৯০২.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত ফরিদ উদ্দিন	উনচুরখী	
৯০৩.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মৃত মশার তুল্লাহ	তাজার	
৯০৪.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত রহিম বক্স	বাইগুনী	
৯০৫.	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	মৃত ফয়েজ উদ্দিন	কৃতিনিয়া	
৯০৬.	মোঃ আঃ রশিদ	মোঃ ইয়াকুব আলী	বটিয়াভাংগা	
৯০৭.	তবিবর রহমান	মৃত শুবার প্রাং	দুর্গাহাটী	
৯০৮.	মোঃ আঃ জোব্বার	মৃত কছিমদ্দিন সরকার	শোলারটার	
৯০৯.	মোঃ ফজলুল হক	মোঃ মজিবর রহমান	শোলারটার	
৯১০.	মোঃ ওয়াদুদ	মৃত জসিম সরকার	বটিয়াভাংগা	
৯১১.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত গোলাম হোসেন	কৃতিনিয়া	
৯১২.	মৃত নজরুল ইসলাম	মৃত আজিমুদ্দিন	ভান্ডারিয়া	
৯১৩.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত জয়েন উদ্দিন প্রাং	বাইগুনী	
৯১৪.	মোঃ আজাহার আলী	মৃত শমসের আলী	ভান্ডারিয়া	
৯১৫.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত নাইম উদ্দিন	দুর্গাহাটি	
৯১৬.	মোঃ জিল্লার রহমান	মৃত খানা প্রাং, যাত্রা প্রাং	বটিয়াভাংগা	
৯১৭.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত ছালেক প্রাং	কৃতিনিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৯১৮.	মোঃ বজলার রহমান	মৃত আকবর হোসেন	হাতীবান্দা	
৯১৯.	মোঃ জাবেদ আলী	মৃত সোনা প্রাং	হাতীবান্দা	
৯২০.	মোঃ মহসিন আলী	মৃত মকবুল হোসেন	কালায়হাটা	
৯২১.	মোঃ তৌরাৎ হোসেন	মৃত খলিলুর রহমান	কালায়দিঘী	
৯২২.	মোঃ দৌলতজ্জামান	মৃত আঃ জলিল মন্ডল	কলাকোপা	
৯২৩.	মোঃ আব্দুল বারী	মৃত অছিমদ্দিন মন্ডল	বালিয়াদিঘী	
৯২৪.	শ্রী অনিল চন্দ্র সরকার	মৃত রনজিৎ চন্দ্র সরকার	নিশিন্দারা	
৯২৫.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত আঃ জব্বার	মহিষাবান	
৯২৬.	শহীদ আঃ মান্নান	মোঃ হাফিজার রহমান	মাড়িয়া	
৯২৭.	মোঃ আঃ জোব্বার	হাজী আবুল কাশেম	নিশিন্দারা	
৯২৮.	মোঃ দীন মোহাম্মদ	মৃত নজির উদ্দিন	নিশিন্দারা	
৯২৯.	মোঃ আরিফুর রহমান	মৃত সৈয়দ হোসেন	উজগ্রাম	
৯৩০.	মোঃ শাহ নেওয়াজ	মৃত আমিনুর রহমান	উজগ্রাম	
৯৩১.	মোঃ আয়েজ উদ্দিন	মৃত অজমুদ সরদার	উজগ্রাম	
৯৩২.	মোঃ আফছার আলী	মৃত বয়েন উদ্দিন	কৃষ্ণচন্দ্রপুর	
৯৩৩.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত এবারক আলী	উজগ্রাম	
৯৩৪.	মোঃ আলমগীর হোসেন	মৃত মন্তেজার রহমান	কেশবপাড়া	
৯৩৫.	মোঃ জিন্নাতুল ইসলাম	মৃত রশনতুল্লাহ	বাইতনী	
৯৩৬.	মোঃ ইউনুছ উদ্দিন	মৃত গোলাম উদ্দিন	ফাতহালিদা	
৯৩৭.	মোঃ আব্দুর রহমান	মৃত তমিজ উদ্দিন	বাইতনী	
৯৩৮.	মোঃ কলিমুদ্দিন	মৃত শহিদউল্লাহ মোল্লা	নিশিন্দারা	
৯৩৯.	মোঃ শফিউল আলম	মৃত শাহাদৎ জামান	মাস্টার পাড়া	
৯৪০.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত জালাল উদ্দিন	কালায়হাটা	
৯৪১.	মোঃ জহির উদ্দিন	মৃত মগলা আকন্দ	কলাকোপা	
৯৪২.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মৃত মহির উদ্দিন	কৃষ্ণচন্দ্রপুর	
৯৪৩.	শংকর কুমার দাশ	শ্রী শর্ব্বেশ্বর চন্দ্র দাশ	যামুনিয়া	
৯৪৪.	মোঃ রজব আলী	মোঃ আব্দুর রহমান	সরদলকুটি	
৯৪৫.	ডাঃ আব্দুল করিম	নঈম উদ্দিন	নিওপাড়া	
৯৪৬.	মোঃ আজিম উদ্দিন	মোঃ আছির উদ্দিন মোল্লা	মাঝপাড়া	
৯৪৭.	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মোঃ মজিবুর রহমান	পূর্বতেজপাড়া	
৯৪৮.	মোঃ জিল্লুর রহমান	মোঃ আব্দুল গনি	মাঝপাড়া	
৯৪৯.	মোঃ আফছার আলী	মোঃ আলাবকস	নিওপাড়া	
৯৫০.	মোঃ মজিবর রহমান	হায়দার আলী প্রাং	নিওপাড়া	
৯৫১.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মোঃ জয়েন উদ্দিন	মাঝপাড়া	
৯৫২.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোয়াজ্জেম সরকার	উত্তর পাড়া	
৯৫৩.	মোঃ তহিদুল ইসলাম	মোঃ তোফাজ্জল সরকার	নিওপাড়া	
৯৫৪.	মোঃ আনিছুর রহমান	মোঃ খুদ মাহমুদ	জাগুলী	
৯৫৫.	মোঃ আব্দুল লতিফ	মৃত আলিমুদ্দিন	নিওপাড়া	
৯৫৬.	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ আব্দুল মন্ডল	বাউইঢোনা	
৯৫৭.	মোঃ আঃ কামাল আজাদ	মোঃ অছিমুদ্দিন সরকার	বুরুজ	
৯৫৮.	মৃত আবেদ আলী	মোঃ তজুমর প্রাং	শালুকগাড়া	
৯৫৯.	মৃত আবেদ আলী	মোঃ ময়েজ উদ্দিন আকন্দ	সাগাটিয়া দঃ পাড়া	
৯৬০.	টি এম নুসা পেন্তা	মোঃ আসাদুজ্জামান	ত্রিমোহনী	
৯৬১.	শ্রী গুরুপদ রাং	শ্রী গ্রীস চন্দ্র রায়	আকন্দ পাড়া	
৯৬২.	মৃত নাহারুল ইসলাম	মোঃ আঃ সামাদ	ধলিয়চর	
৯৬৩.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত কায়েবুল্লাহ প্রাং	সয়াতলী	
৯৬৪.	মৃত দৌলতজামান	মৃত দবির উদ্দিন মন্ডল	শালুকগাড়া	
৯৬৫.	মোঃ আবু সাইদ সরকার	মোঃ হযরত আলী সরকার	সুখানপুকুর	
৯৬৬.	কাজী আঃ মান্নান	কাজী জসিম উদ্দিন	নেপালতলী	
৯৬৭.	কাজী নুর আলম	মোঃ মমতাজুর রহমান	নেপালতলী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
৯৬৮.	মৃত ছলেমান আলী	মোঃ শমসের মোল্লা	উনচুরখী	
৯৬৯.	মোঃ আশরাফ আলী	মোঃ বেলায়েত আলী	দাড়াইল	
৯৭০.	মোঃ শাহজাহান	মোঃ আফতাব হোসেন	উনচুরখী	
৯৭১.	আঃ ছাত্তার	মোহাম্মদ মুন্সি	বাটিয়াভাঙ্গা	
৯৭২.	মোঃ শাহজাহান আলী	মমতাজুর রহমান	হাতিবান্দা	
৯৭৩.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	মোঃ তছিম উদ্দিন	হাতিবান্দা	
৯৭৪.	মোঃ ইসমাইল	মোঃ আঃ জব্বার	হাতিবান্দা	
৯৭৫.	মোঃ ওহেদুজ্জামান	মোঃ হুসেন আলী	হাতিবান্দা	
৯৭৬.	আব্দুল হামিদ ধলু	মোঃ আছর উদ্দিন	ভান্ডারিয়া	
৯৭৭.	মৃত সিরাজুল ইসলাম	মোঃ মকবুল উদ্দিন	বাটিয়াভাঙ্গা	
৯৭৮.	মোঃ আতাউর রহমান	হাজী ফজলার রহমান	কলাকোপা	
৯৭৯.	কম উদ্দিন	মৃত শরাফ উদ্দিন	কালাইহাটা	
৯৮০.	মোঃ কামরুজ্জামান	শরাফ আলী	সোনামুয়া	
৯৮১.	মৃত হাফিজার রহমান প্রাং	মোঃ পিয়ার মাহমুদ	পাররানীর পাড়া	
৯৮২.	মোঃ শাহজালাল	মোঃ ছহির উদ্দিন	পায়রানীর পাড়া	
৯৮৩.	মোঃ আব্দুর রশিদ সরকার	এলাহী বক্স	মাইষাখান	
৯৮৪.	আফছার আলী	মোঃ কাদের বকস	রানীরপাড়া	
৯৮৫.	মোঃ কামরুল হাসান	মোঃ তছলিম উদ্দিন	চকভওর	
৯৮৬.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মোঃ কমর উদ্দিন	সাগাটিয়া দঃ পাড়া	
৯৮৭.	মৃত সাইদুর ইসলাম	জসিম উদ্দিন প্রাং	বাইগুনী	
৯৮৮.	মোঃ লোকমান হাকিম	মোঃ জরিমতুল্লা	বড় ইটালি	
৯৮৯.	মোঃ আইয়ুব হোসেন	মোঃ ওসমান গনি	জাতহালিদা	
৯৯০.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ	মোঃ কিয়ামতুল্লা	উনচুরখী	
৯৯১.	মোঃ নুরুল হুদা	মোঃ আজিজুল বারী	বাগবাড়ী	
৯৯২.	মোস্তাফিজার রহমান	তোফাজ্জল হোসেন	নিওপাড়া	
৯৯৩.	মোঃ বদিউজ্জামান	নবির উদ্দিন	বাটিয়াভাঙ্গা	
৯৯৪.	মৃত অনার্থ	প্রশান্ত	মাটিয়ান চড়া	
৯৯৫.	ছালেক	মহিতুল্লা	ভান্ডারা	
৯৯৬.	আব্দুর রাজ্জাক	ফরিজ উদ্দিন	জয়ভোগা	
৯৯৭.	জয়নাল আবেদনী	লাল মোহাম্মদ	ধলিরচর	
৯৯৮.	মৃত নারায়ন	সিয়াভন চন্দ্র	জাতহালিদা	
৯৯৯.	তোজাম্মেল হক	ছলাইমান আলী	জাতহালিদা	
১০০০.	মোঃ আতাউর রহমান	কাজী ফজলার রহমান	কলাকোপা	
১০০১.	মোঃ মিজানুল রহমান	মৃত মজিবুর রহমান	যাদুরপুর	
১০০২.	মোঃ মোজাহার আলী	মোঃ আফজাল হোসেন	শরাতলী	
১০০৩.	মোঃ মিরাজুল করিম	মৃত আবুল হোসেন	জাতহালিদা	
১০০৪.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মোঃ হামিদ আলী	মাস্টারপাড়া	
১০০৫.	মোঃ আব্দুর রহিম	মোঃ কলিম উদ্দিন	সারটিয়া	
১০০৬.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ হামেদ আলী	মাস্টারপাড়া	
১০০৭.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত নছির উদ্দিন প্রাং	ক্ষিদ্র পেরী	
১০০৮.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত নছির উদ্দিন প্রাং	ক্ষিদ্র পেরী	
১০০৯.	মোঃ আব্দুল হামিদ	মৃত আহম্মেদ আলী	ক্ষিদ্র পেরী	
১০১০.	মোঃ আব্দুল গফুর	মৃত আবুল হোসেন	নাশিপুর	
১০১১.	মোঃ শাহাদত জামান	মৃত আব্দুর রহমান	হাতিবান্দা	
১০১২.	মৃত মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত এম এ জলিল	আটবাড়িয়া	
১০১৩.	মোঃ আব্দুল মালেক	মৃত তছলিম উদ্দিন	খুপী	
১০১৪.	মোঃ আফজাম হোসেন	মৃত খেজমতুল্লাহ	তেজপাড়া	
১০১৫.	মোঃ আলী আজগর খান	মৃত হাফিজার রহমান	জাগুনী	
১০১৬.	মোঃ আব্দুল মোতালিব	মৃত আজিজার রহমান	জয়ভোগা	
১০১৭.	শ্রী লক্ষণ চন্দ্র রায়	মৃত নকুল চন্দ্র রায়	মধ্যকাতুলী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১০১৮.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ জামাল উদ্দিন	চকয়াধিকা	
১০১৯.	মোঃ হায়েজ উদ্দিন	মৃত এলম উদ্দিন	বামুনিয়া	
১০২০.	মোঃ গোলাম রসুল	মৃত শাহদৎ জামান	বটিয়াভাঙ্গা	
১০২১.	মোঃ আব্দুল মতিন	হাজী আব্দুল কদ্দুস	বটিয়াভাঙ্গা	
১০২২.	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত মবারক আলী	গোয়ালপাড়া	
১০২৩.	মাহফুজার রহমান	মৃত তোছাদ্দেক খাঁ	জাগুলী	
১০২৪.	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	মৃত মোসলেম উদ্দিন	শুভপাড়া	
১০২৫.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত আজিম উদ্দিন মন্ডল	লঠিমারঘোন	
১০২৬.	মোঃ মতিউর রহমান	মৃত ময়েন উদ্দিন সরদার	ইশ্বরপুর	
১০২৭.	ডাঃ এম জহুরুল ইসলাম	মৃত মিছির উদ্দিন	বাইগুনী	
১০২৮.	মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা	মৃত আব্বাস আলী মোল্লা	ভুলিগাতী	
১০২৯.	মৃত তছলিম উদ্দিন ঘুটু	মৃত আঃ কুদ্দুছ মুন্সি	বটিয়াভাঙ্গা	
১০৩০.	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত ছহির উদ্দিন	গাবতলী	
১০৩১.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত আহম্মদ আলী খা	বালিয়াদিঘী	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১০৩২.	মৃত আব্দুস ছালাম	মৃত রহিম বক্স	গোসাইবাড়ী	
১০৩৩.	মোঃ মতিউর রহমান	মৃত পানাউল্যা মন্ডল	চুনিয়াপাড়া	
১০৩৪.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত আজিজ মন্ডল	গোসাইবাড়ী	
১০৩৫.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন তাং	মৃত গোমশের আলী তাং	দিঘলকান্দী	
১০৩৬.	মোঃ ইলিয়াস হোসেন	মৃত আব্দুল আজিজ সরকার	শহরাবাড়ী	
১০৩৭.	এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত রইচ উদ্দিন সরকার	চরপাড়া	
১০৩৮.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত মন্তেজার রহমান	বিলচাপড়ী	
১০৩৯.	মৃত খোরশেদ আলম	মৃত হাজি খোদাবক্স	বিলচাপড়ী	
১০৪০.	মৃত খোরশেদ আলম	মৃত নবীর উদ্দিন	বিলচাপড়ী	
১০৪১.	এস এম আঃ কুদ্দুস	মোঃ ইছাহাক আলী	বিলচাপড়ী	
১০৪২.	মোঃ ইদ্রিস আলী	মোঃ মহির উদ্দিন	রাঙ্গামাটি	
১০৪৩.	এস এম রফিকুল ইসলাম	মৃত গোলাম রহমান শহা	বিলচাপড়ী	
১০৪৪.	মোঃ বদিউল আলম	মোঃ জলিল বক্স সরকার	বিলচাপড়ী	
১০৪৫.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মোঃ গোলাম গোফফার	বিলচাপড়ী	
১০৪৬.	মোঃ মহসীন আলী	মোঃ মছির উদ্দিন সরকার	বিলচাপড়ী	
১০৪৭.	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	মোঃ গোলাম গোফফার	বিলচাপড়ী	
১০৪৮.	মোঃ সামছুল হক	মোঃ হফুরুদ্দিন প্রাং	হাঁসাপটল	
১০৪৯.	মোঃ হযরত আলী	মৃত মফিজ উদ্দিন	বিলচাপড়ী	
১০৫০.	মোঃ হামিদুর রহমান	মোঃ আজাহার আলী	বিলচাপড়ী	
১০৫১.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত তোমজেদ আলী	রাঙ্গিলা	
১০৫২.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত শাহার উদ্দিন	পঃ কান্তনগর	
১০৫৩.	মোঃ আফসার আলী	মৃত এশার আকন্দ	পঃ কান্তনগর	
১০৫৪.	মোঃ আমির হোসেন	মৃত কাজেম উদ্দিন সরকার	রামনগর	
১০৫৫.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত লুৎফর রহমান সরকার	কালেরপাড়া	
১০৫৬.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত রহিম উদ্দিন	ভালুকাতলা	
১০৫৭.	মোঃ কোমর উদ্দিন	মৃত মালেক উদ্দিন	শিয়ালী	
১০৫৮.	মোঃ আব্দুল হামিদ	মৃত ফয়েজ উদ্দিন	চিথুলিয়া	
১০৫৯.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আব্দুল জলিল মন্ডল	গোসাইবাড়ী	
১০৬০.	মোঃ আলতাব হোসেন	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	মবুয়াখালী	
১০৬১.	মোঃ ফজলে দাইয়ান	মোঃ ফজলার রহমান মন্ডল	জোড়খালী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১০৬২.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত নছিম উদ্দন	মবুয়াখালী	
১০৬৩.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত নছিম উদ্দিন	মবুয়াখালী	
১০৬৪.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত সেকান্দার মন্ডল	জোড়খালী	
১০৬৫.	মোঃ সামছুল ইসলাম	মৃত অছিম উদ্দিন মন্ডল	চিথুলিয়া	
১০৬৬.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত রহিম বক্স	জোড়খালী	
১০৬৭.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মোঃ আয়েত উল্লা মন্ডল	গোসাইবাড়ী	
১০৬৮.	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মৃত ছামসুর রহমান	কালেরপাড়া	
১০৬৯.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত সেকান্দার আলী	সুলতানহাটা	
১০৭০.	মোঃ হাসেম আলী	মোঃ ইউসুব আলী	সুলতানহাটা	
১০৭১.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত আছাতুল্লা আকন্দ	লিন্তিপোতা	
১০৭২.	মোঃ জয়নাল আবেদনী	মৃত আজাহার আলী	সুলতানহাটা	
১০৭৩.	মোঃ নজির হোসেন	মৃত আব্দুল জলিল প্রাং	সরগাম	
১০৭৪.	মোঃ মোখলেসুর রহমান	মৃত মোজাহার আলী	রাঙ্গামাটি	
১০৭৫.	এস এম ফেরদৌস আলম	মৃত গোলাম হেমান শাহ	ঝিলচাপড়ী	
১০৭৬.	শাহ মোহাম্মদ আমজাদ	শাহ মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন	ঝিলচাপড়ী	
১০৭৭.	মোঃ শহিদুর রহমান	মোঃ নছিম উদ্দিন মন্ডল	হাঁসাপোটল	
১০৭৮.	মোঃ আব্দুর রহিম	মোঃ কলম আলী	ঝিলচাপড়ী	
১০৭৯.	মোঃ আব্দুর রহমান	মোঃ যাহায় উদ্দিন	রাঙ্গামাটি	
১০৮০.	মোঃ ইউনুছ আলী	মোঃ রিয়াজ আলী	ঝিলচাপড়ী	
১০৮১.	মোঃ সামছুল হক	আজাহার আলী	ঝিলচাপড়ী	
১০৮২.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মোঃ আব্বাস আলী তাং	ঝিলচাপড়ী	
১০৮৩.	মোঃ তজিবুর রহমান	মোঃ বিনত মন্ডল	ঝিলচাপড়ী	
১০৮৪.	মোঃ আজাহার আলী ভুঞা	মোঃ মোজদার হোসেন	উজাল সিং	
১০৮৫.	মোঃ আব্বাস আলী	মৃত মুনুরুদ্দিন	পালহাটী	
১০৮৬.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত বুজুর আলী	পালহাটী	
১০৮৭.	মোঃ হযরত আলী	মৃত লেলোয়ার হোসেন	জাবারীপাড়া	
১০৮৮.	মৃত সোহরাব হোসেন	মোঃ আছাব উদ্দিন	গোবিন্দপুর	
১০৮৯.	মোঃ ফয়িদ উদ্দিন	মৃত বক্স প্রাং	শহরাবাড়ী	
১০৯০.	মোঃ মসলিম উদ্দিন	মৃত গেন্দা প্রাং	শহরাবাড়ী	
১০৯১.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত মুনসুর রহমান	শিমুলবাড়ী	
১০৯২.	মোঃ আব্দুল্লাহ হেল কাফী	মৃত যাছির উদ্দিন প্রাং	সাতবেকী	
১০৯৩.	ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত মজিবর রহমান মন্ডল	মেভেরবাড়ী	
১০৯৪.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত জখনী প্রাং	সাতবেকী	
১০৯৫.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত জসমত উল্লা	শিয়ালী	
১০৯৬.	এস এম আব্দুস সাত্তার	মোঃ মালিক মোল্লা	রাঙ্গিলা	
১০৯৭.	শ্রী অধির চন্দ্র সাহা	শ্রী সুধির চন্দ্র সাহা	রাঙ্গিলা	
১০৯৮.	শ্রী রনজিৎ চন্দ্র সাহা	শ্রী সুধির চন্দ্র সাহা	রাঙ্গিলা	
১০৯৯.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত চান্দুল্লা শেখ	বুধারগাঁতি	
১১০০.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ আব্দুল হামিদ	ধুনট	
১১০১.	মোঃ গোলাম ওহাব	মোঃ জাবেদ আলী শেখ	জিঞ্জিরতলা	
১১০২.	মোঃ আব্দুর রফিক	মৃত নওলেয় আলী	উল্লাপাড়া	
১১০৩.	মোঃ আফজাল হোসেন	মোঃ আলতাফ আলী	চিকাশী	
১১০৪.	মোঃ মফিজ উদ্দিন সরকার	মৃত গেন্দা সরকার	চৌকিবাড়ী	
১১০৫.	মৃত মমতাজ উদ্দিন সরকার	মৃত গেন্দা সরকার	চৌকিবাড়ী	
১১০৬.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মোজাহার আলী	জলতকা	
১১০৭.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	নানেশ উদ্দিন সরকার	গুয়ভহরী	
১১০৮.	মোঃ গোলাম রহমান	মৃত সোহরাব আলী সরকার	চিথুলিয়া	
১১০৯.	মোঃ নুরুন্নবী বাহাদু	মোঃ আজিজুল ইসলাম	বড়বিলা	
১১১০.	মোঃ আব্দুস সামাদ আকন্দ	মৃত ময়েজ উদ্দিন আকন্দ	চিথুলিয়া	
১১১১.	মোঃ নুরুজ্জামান	মোঃ মোবারক আলী	নাটাবাড়ী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১১১২.	মৃত আব্দুস ছাত্তার তালুকদার	মৃত খাজা গোলাম শফিউদ্দিন তাং	চালাপাড়া	
১১১৩.	মোঃ হাসেম আলী তাং	মৃত তোজাম্মেল হক তাং	চালাপাড়া	
১১১৪.	এস এম ইউসুফ হারুন	মৃত ডাঃ খলিলুর রহমান	পশ্চিম ভরণশাহী	
১১১৫.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত রহিম উদ্দিন	ধুনট	
১১১৬.	মোঃ সামছুল হক	হায়দার আলী	চালাপাড়া	
১১১৭.	মোঃ আব্দুর রহমান	মোঃ নওকড়ি আকন্দ	পশ্চিম কান্তনগর	
১১১৮.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত ওবায়দুল্লা	কালেপাড়া	
১১১৯.	মোঃ মোজাফফর আলী	মৃত আজিমুদ্দিন খান	সুলতান হাটা	
১১২০.	কে.এম মোজাম্মেল হক	মৃত আজিমুদ্দিন	সুলতানহাটা	
১১২১.	মোঃ ঈমান আলী	আফসার আলী	সুলতানহাটা	
১১২২.	মোঃ মোকছেদ আলী	নঈম উদ্দিন	সরুগ্রাম	
১১২৩.	মোঃ মুনসুর আলী	মোহাম্মদ আলী	সুলতানহাটা	
১১২৪.	মোঃ জনাব আলী	মৃত আজিজার রহমান	ধানাচানা	
১১২৫.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত ঈমাম উদ্দিন	নান্দিয়ারপাড়া	
১১২৬.	মোঃ মেহের আলী	মোঃ আব্বাস আলী	নান্দিয়ারপাড়া	
১১২৭.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত জালাল উদ্দিন	শিয়ালী	
১১২৮.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত আব্দুর রহমান	শিয়ালী	
১১২৯.	মোঃ লুৎফর রহমান	মোঃ হাসেন আলী	ধানাচানা	
১১৩০.	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মোঃ দালেল উদ্দিন	জয়সিং	
১১৩১.	মোঃ শাহজাহান আলী	খোশ মাহমুদ	সাতবেকী	
১১৩২.	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	জসমত উল্লাহ	সাতবেকী	
১১৩৩.	মোঃ ইউনুস আলী	জাহের আলী প্রাং	সাতবেকী	
১১৩৪.	মোঃ আবতাব হোসেন	মোঃ মফিজ উদ্দিন	সাতবেকী	
১১৩৫.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মৃত করিম বক্স	শিয়ালী	
১১৩৬.	মোঃ ইয়াসীন আলী আকন্দ	মহির উদ্দিন আকন্দ	নান্দিয়ারপাড়া	
১১৩৭.	মোঃ আব্দুর রশিদ	আব্দুল আকন্দ	নিমগাছী	
১১৩৮.	মোঃ সেজাব আলী	চান্দুল্লা শেখ	সাতটিকরী	
১১৩৯.	শ্রী সুবোল চন্দ্র সাহা	শ্রী সুধির চন্দ্র সাহা	রাজিলা	
১১৪০.	মোঃ নুরুল ইসলাম মিয়া	মৃত মোজাহার আলী মিয়া	রাজিলা	
১১৪১.	মোঃ আজাহার আলী	মোহাম্মদ আলী	বানিয়াগাতি	
১১৪২.	মৃত জেল হোসেন	মৃত মোজাহার আলী	সাতটিকরী	
১১৪৩.	মোঃ আলতাফ	মৃত আহম্মাদ আলী	সাতটিকরী	
১১৪৪.	মোঃ খবির উদ্দিন	মৃত কলি উদ্দিন	শিমুলবাড়ী	
১১৪৫.	মোঃ হযরত আলী	মৃত গফুর সরকার	শহরাবাড়ী	
১১৪৬.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত সাফাত উল্লা সরকার	শ্যামগাতি	
১১৪৭.	মোঃ শহিদুল্লাহ	মোঃ নাজিম উদ্দিন	পীরহাটী	
১১৪৮.	মোঃ ছাবেদ আলী	মোঃ আবেদ আলী	খেরুয়াহাটী	
১১৪৯.	শেখ মোঃ জালাল উদ্দিন	মোঃ মেহেরুল্লা	গোয়ালভাগ	
১১৫০.	মোঃ মোহসীন আলম	মোঃ মসলিম উদ্দিন	পীরহাটা	
১১৫১.	শহীদ গোলাম হোসেন	মৃত বিরুজুল্লা	গোপালপুর	
১১৫২.	মোঃ আলী আজাহার শেখ	মৃত মাহমুদ আলী শেখ	ছাতিয়ানী	
১১৫৩.	মৃত আমজাদ হোসেন	মৃত জাহান বক্স তালুকদার	জোলাগাতি	
১১৫৪.	মৃত আব্দুর রাজ্জাক	মৃত ছানোয়ার হোসেন	ভুবনগাতি	
১১৫৫.	মোঃ আব্দুল জলিল সরকার	মোঃ পর্বত আলী সরকার	চৌকিবাড়ী	
১১৫৬.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত মোজাহার আলী	জালশুকা	
১১৫৭.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত মজিবুর রহমান	পাঁচথুপি	
১১৫৮.	মোঃ নুরুল ইসলাম	হোসেন আলী ভুঞা	বিলপাথিয়া	
১১৫৯.	মোঃ জাফর আলী প্রাং	হাসেন আলী	হাঁসাপোটল	
১১৬০.	এস এম সাইদুর রহমান তাং	মৃত জালালুর রহমান	বিলচাপড়ী	
১১৬১.	মোঃ আফসার আলী	মোঃ আব্বাস আলী মন্ডল	চরপাড়া	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১১৬২.	আলী মোহাম্মদ	কোরবান আলী	রাঙ্গামাটি	
১১৬৩.	বি এম আজিজুর রমান	মৃত মফাজল হোসেন ভুঁইয়া	উজালসিং	
১১৬৪.	মোঃ আসমত আলী সরকার	মোঃ নাজিম উদ্দিন সরকার	ছাতিয়ানি	
১১৬৫.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত ছবুর উদ্দিন মল্লিক	উজালসিং	
১১৬৬.	আব্দুর রউফ	মৃত আব্দুর রাজ্জাক মল্লিক	গোঁয়হাটি	
১১৬৭.	মোঃ শাহজাহান আলী	আব্দুল কদ্দুস তালুকদার	খালুলি	
১১৬৮.	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত আলতাফ হোসেন	পূর্ব গুয়ার্ডছড়ি	
১১৬৯.	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	মৃত সামছুজ্জামান তাং	শিমুলবাড়ী	
১১৭০.	মোঃ মাহফুজুর রহমান	মোঃ রহিম উদ্দিন সরকার	বৈশাখী	
১১৭১.	মোঃ আব্দুল বাছেদ শেখ	মৃত রবিয়া শেখ	শহরাবাড়ী	
১১৭২.	ওসমান গনি	মৃত আজিজুর রহমান	ভাডারবাড়ী	
১১৭৩.	মোঃ আমির হোসেন	মৃত আমর আলী	বড়ইতলী	
১১৭৪.	মোঃ রেজাউল ইসলাম	গফুর প্রাং	বাঁড়িয়া	
১১৭৫.	কে এম আজিজুর রহমান	মুসা মন্ডল	পূর্বভরনশাহী	
১১৭৬.	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	ময়েন উদ্দিন	ধুনট অফিসারপাড়া	
১১৭৭.	মৃত আমজাদ হোসেন সরকার	মৃত ওয়াহেদ আলী সরকার	বহালগাছা	
১১৭৮.	মোঃ আল মাহমুদ	মিজানুর রমান	ভুবনগাঁতি	
১১৭৯.	মৃত মাসুদ ইকবাল	মৃত হোসেন আলী	বিশ্ব হরিগাছা	
১১৮০.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত আবেশ উদ্দিন	দিঘলকান্দি	
১১৮১.	মোঃ আমীর হোসেন	মোঃ আব্দুল আজিজ	রুদ্রবাড়িয়া	
১১৮২.	মোঃ আবু তাহের	মৃত হাবিবুর রহমান	ভুবনগাঁতি	
১১৮৩.	মোঃ মোবারক আলী সরকার	আবেশ উদ্দিন	দিঘলকান্দি	
১১৮৪.	মৃত ডাঃ গোলাম সরোয়ার	মৃত আব্দুল গফুর সরকার	কাদেরপাড়া	
১১৮৫.	মৃত কাফি আলম	মৃত খলিলুর রহমান	হেউটনগর	
১১৮৬.	মোঃ শাহাদৎ হোসেন	মৃত হাফিজার রহমান মন্ডল	সুরুগ্রাম	
১১৮৭.	মোঃ মহসীন আলী	মজিবুর রহমান	বেড়েরবাড়ী	
১১৮৮.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	তমিজ উদ্দিন	প্রতাপখালুলী	
১১৮৯.	কমর উদ্দিন আহম্মেদ	মৃত সরাফত উল্লা প্রাং	নিমগাছী	
১১৯০.	মোঃ হাবিবুল হক	মৃত রফিউল হক	বানিয়াজান	
১১৯১.	মোঃ মাহববুর রহমান	হায়ফত উল্লা	ধামাচামা	
১১৯২.	মোঃ আমজাদ হোসেন	জান্নত উল্লা	সাতবেকী	
১১৯৩.	মৃত হামিদুর রহমান	মৃত ফরহাদ আলী	মাঝবাড়ী	
১১৯৪.	মোঃ মোজাফফর রহমান	করিম বকস	শিহালী	
১১৯৫.	মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	রাউতা	
১১৯৬.	মোঃ আবু তাহের	আফছার আলী	সাতটিকরি	
১১৯৭.	মোঃ আব্দুল হামিদ তালুকদার	মোঃ ছমির উদ্দিন তালুকদার	খাটিয়ামারী	
১১৯৮.	মোঃ শহীদুল ইসলাম	আব্দুল লতিফ	জোড়খালি	
১১৯৯.	মোঃ লিয়াকত আলী	মৃত মোস্তফা	গোসাইবাড়ী	
১২০০.	মোঃ গোলাম রহমান	মৃত সোহরাব উদ্দিন	চিথুলিয়া	
১২০১.	আব্দুল কাদের	মৃত জসিম উদ্দিন আকন্দ	চিথুলিয়া	
১২০২.	মোঃ মোজাম্মেল হক	ইসমাইল সরকার	চান্দারপাড়া	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা

উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১২০৩.	মোঃ বদিউজ্জামান	মৃত রিয়াজ উদ্দিন বেঃ	নামাজখালী	
১২০৪.	মৃত আঃ ছালেক	মৃত কান্দু প্রামাণিক	ঐ	
১২০৫.	মোঃ মোফাজ্জল হোসনে	মৃত লিয়াকত আলী বেঃ	ঐ	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১২০৬.	মোঃ আব্দুস সালাম	মৃত মিয়াজান আলী	ঐ	
১২০৭.	মোঃ কফিল উদ্দিন	মৃত মিয়াজান আলী মন	সুজাইতপুর	
১২০৮.	মোঃ আব্দুল হক	মৃত আবুল কাসেম মুন্সী	ঐ	
১২০৯.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত ফকির মাহমুদ শেখ	রানীরপাড়া	
১২১০.	মোঃ আবুল কালাম খান	মৃত করিম বক্স খান	ঐ	
১২১১.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত ছমির উদ্দিন	ঐ	
১২১২.	মোঃ আয়েজ উদ্দিন	মৃত কলিম উদ্দিন শেখ	নিত্যানন্দনপুর	
১২১৩.	মোঃ আব্দুল বাকী আকন্দ	মৃত তমিজ উদ্দিন আকন্দ	গড়ফতেপুর	
১২১৪.	মোঃ ইউনুস আলী	মৃত কাছিম উদ্দিন শেখ	ঐ	
১২১৫.	নুর মোহাম্মদ	মৃত ফাজলা শেখ	চমরগাছা	
১২১৬.	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মৃত মোস্তেজার রহমান	বামুনিয়া	
১২১৭.	মোঃ নইম উদ্দিন	মৃত আব্দুস ছামাদ	উঃ আটকরিয়া	
১২১৮.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত জাহাবক্স প্রাং	ধর্মকুল	
১২১৯.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত নুর মোহাম্মদ	দাউদপুর	
১২২০.	মোঃ খাতের উদ্দিন প্রাং	মৃত নবেছ আলী প্রাং	নুরালপটন	
১২২১.	মোঃ নুরুল আব্দুর রহমান	মৃত আব্দুল জোব্বার	নুরালপটন	
১২২২.	মোঃ তহসিন আলী	মৃত আকতার আলী মোল্লা	চারালকান্দি	
১২২৩.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	মৃত মফিজ উদ্দিন প্রাং	চারালকান্দি	
১২২৪.	মোঃ ছায়োয়ার হোসেন	মৃত ইজার উদ্দিন মন্ডল	ভেলুরপাড়া	
১২২৫.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মৃত তফিজ উদ্দিন	ভেলুরপাড়া	
১২২৬.	মোঃ সোনা মিয়া	মৃত ছহির উদ্দিন প্রাং	জোড়গাছা	
১২২৭.	মোঃ মোস্তাফিজ্জামান	মৃত ইলাহী বক্স প্রাং	ঠাকুরবাড়ী	
১২২৮.	মোঃ আব্দুল হালিম	মৃত মোজাম্মেল হক	জোড়গাছা	
১২২৯.	মোঃ আব্দুল মতিন	মৃত ময়েজ উদ্দিন	ঠাকুরপাড়া	
১২৩০.	মোঃ আব্দুল গনি	মৃত আবেদীন কাজী	সোনাকানিয়া	
১২৩১.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত কেরামত আলী বেপাঃ	মধুপুর	
১২৩২.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত ফরেক মন্ডল	দাড়িহাসরাজ	
১২৩৩.	মোঃ বজলুর রহমান করিম	মৃত গোলাম হোসেন মন্ডল	চুকাইনগর	
১২৩৪.	তোফাজ্জল হোসেন	মৃত তাবিজ উদ্দিন বেপারী	চুকাইনগর	
১২৩৫.	মোঃ নাজিম উদ্দিন	মৃত মোস্তেজার রহমান প্রাং	মাইচেন হাট	
১২৩৬.	মোঃ ছায়েদু জামান	মৃত নাযির উদ্দিন প্রাং	ঐ	
১২৩৭.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত নাসির উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১২৩৮.	মোঃ বদিউজামান	মৃত হাসেন আলী প্রাং	ঐ	
১২৩৯.	মোঃ হযরত আলী	মৃত রহমত আলী প্রাং	রাধাকান্তপুর	
১২৪০.	মোঃ নওয়াব আলী	মৃত বদু রহমান মন্ডল	গাবুল্যা	
১২৪১.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত আবেদ আলী কাজী	নিশ্চিন্তপুর	
১২৪২.	মোঃ বাচ্চু মিয়া	মৃত সিরাজ বেপারী	কাবিলপুর	
১২৪৩.	মোঃ শুকুর আলী	মৃত হেকমুতুল্যা	ঐ	
১২৪৪.	মৃত সিরাজুল ইসলাম	মৃত আবুল হোসেন আকন্দ	ঐ	
১২৪৫.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মোঃ সমচ উদ্দিন আকন্দ	কাবিলপুর	
১২৪৬.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মোঃ আব্দুস সাত্তার আকন্দ	কাবিলপুর	
১২৪৭.	মোঃ বাদশা মিয়া	মৃত ময়েজ উদ্দিন মন্ডল	রানীর পাড়া	
১২৪৮.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত নজর উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১২৪৯.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত নজর উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১২৫০.	মোঃ কছিম উদ্দিন বেপারী	মৃত কফুর উদ্দিন বেপারী	ঐ	
১২৫১.	মোঃ অছিম উদ্দিন	মৃত মুসাদত জামান সরকার	ঐ	
১২৫২.	মোঃ তফিজ উদ্দিন	মৃত বজর আলী প্রাং	ঐ	
১২৫৩.	মোঃ নজমল হক	মৃত নছিম উদ্দিন বেপারী	ঐ	
১২৫৪.	মোঃ ছায়ফুল ইসলাম	মৃত লুৎফর রহমান সরকার	ঐ	
১২৫৫.	মৃত আজিজার রহমান	মৃত আব্দুল গফুর মন্ডল	ঐ	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১২৫৬.	মৃত রফিকুল ইসলাম	মৃত তফিজ উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১২৫৭.	মৃত রফিকুল ইসলাম	মৃত ফয়েজ উদ্দিন মন্ডল	খিতাবের পাড়া	
১২৫৮.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত কছিম উদ্দিন	শাহবাজপুর	
১২৫৯.	মোঃ রেজাউল করিম বাবলু	মৃত লাল মোহাম্মদ তালুকদার	কামার পাড়া	
১২৬০.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মৃত লাল মাহমুদ	কামার পাড়া	
১২৬১.	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	মৃত আছাদুজ্জামান	ঐ	
১২৬২.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত এরফান আলী	ঐ	
১২৬৩.	মোঃ আব্দুস সালাম	মৃত এবারত আলী বেপারী	নামাজখালী	
১২৬৪.	মোঃ সাহার আলী	মৃত কালু বেপারী	ঐ	
১২৬৫.	মোঃ আব্দুল্যা	মৃত নওশের	ঐ	
১২৬৬.	মোঃ ছারোয়ার জাহান	মৃত কাজী আব্দুল গফুর	গড় ফতেপুর	
১২৬৭.	মোঃ আব্দুল ছাত্তার	মৃত রইচ উদ্দিন সরকার	ঐ	
১২৬৮.	মোঃ ফজলুল করিম	মৃত আব্দুস সাত্তার সরকার	আগুনিয়াতাইড়	
১২৬৯.	মোঃ মাহমুদুর রহমান	মৃত মমতাজুর রহমান	ঐ	
১২৭০.	মোঃ নুরুল আনোয়ার বাদশা	মৃত ডাঃ সাবেক আলী	সোনাতলা বন্দর	
১২৭১.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত জামাল উদ্দিন মন্ডল	চামুরপাড়া	
১২৭২.	এ.টি.এম জুলফিকার	মৃত আফছার আলী মন্ডল	আগুনিয়াতাইড়	
১২৭৩.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত ইছাহাক মন্ডল	ঐ	
১২৭৪.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত ইজ্জত তুল্যা মন্ডল	নারীর পাড়া	
১২৭৫.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মৃত ওমর উদ্দিন	চকসৈয়দপুর	
১২৭৬.	মোঃ হাতেমুজ্জামান	মৃত আয়েজ উদ্দিন	বামুনিয়া	
১২৭৭.	মোঃ মন্তেজার রহান	মৃত নুরুল ইসলাম	চকসৈয়দপুর	
১২৭৮.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত রমজান আলী	বালুয়াপাড়া	
১২৭৯.	মোঃ রস্তম মন্ডল	মৃত আব্দুল লতিফ মন্ডল	ঘুঘারঘোপ	
১২৮০.	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত শাহাদৎ জামান	ছোট বালুয়া	
১২৮১.	মোঃ জাহেদুল ইসলাম	মৃত হাবিবর রহমান	রশিদপুর	
১২৮২.	মোঃ ছাদেক আলী	মৃত অছিম উদ্দিন	রশিদপুর	
১২৮৩.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মজিবর রহমান	আটকড়িয়া	
১২৮৪.	মোঃ আব্দুল করিম	মৃত মোহাম্মদ আলী	আটকড়িয়া	
১২৮৫.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত কেয়ামত আলী	ধর্মকুল	
১২৮৬.	মোঃ আব্দুল আজিজ	মৃত মোজাম্মেল হক	উঃ আটকড়িয়া	
১২৮৭.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত মিছির উদ্দিন আকন্দ	কলসদহ	
১২৮৮.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত ইসমাইল হোসেন	কলসদহ	
১২৮৯.	মোঃ চাঁদ মিয়া	মৃত মিছির উদ্দিন আকন্দ	ঐ	
১২৯০.	মোঃ আকবর আলী	মৃত কছিম উদ্দিন প্রাং	ঐ	
১২৯১.	মৃত শাহাদৎ হোসেন	মৃত মহির উদ্দিন মন্ডল	নুয়ারপটল	
১২৯২.	মৃত আব্দুল মজিদ	মৃত মিছির প্রাং	ঐ	
১২৯৩.	মৃত আজিজার রহমান	মৃত ইব্রাহীম মন্ডল	ঐ	
১২৯৪.	মৃত জাবেদ আলী	মৃত আশরাফ আলী মন্ডল	মহিচরন হাটি	
১২৯৫.	মোঃ আব্দুল আলীম মন্ডল	মৃত আলতাব হোসেন	ঐ	
১২৯৬.	মোঃ ধলুবর রহমান	মৃত হাসেন আলী প্রাং	ঐ	
১২৯৭.	মৃত আব্দুল গনি	মৃত তছিম উদ্দিন	নুরপুর	
১২৯৮.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত কছিম উদ্দিন	ঐ	
১২৯৯.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত আলিম উদ্দিন প্রাং	উত্তর বাঁশহাটা	
১৩০০.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত আজিজার রহমান	গনিয়াকান্দি/মহিচরন	
১৩০১.	মোঃ চাঁদ মিয়া	মৃত আজিম উদ্দিন	লোহপাড়া	
১৩০২.	মোঃ ছামছুল হুদা	মৃত অবেবছ আলী	ঐ	
১৩০৩.	মোঃ ফরিদুজ্জামান	মৃতআক্কাস উদ্দিন প্রাং	ঐ	
১৩০৪.	মোঃ ছায়েদ আলী আকন্দ	মৃত আলীম উদ্দিন	ঐ	
১৩০৫.	মোঃ আবেদ আলী	মৃত তফিজ উদ্দিন	ঐ	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৩০৬.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত আফছার উদ্দিন	মাইচরন	
১৩০৭.	মোঃ আফতাব হোসেন	মৃত সিরাজ উদ্দিন	জোড়গাছা	
১৩০৮.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত আজগড় আলী মোল্যা	ঐ	
১৩০৯.	মোঃ আফতাব হোসেন	মৃত ছহির উদ্দিন	ঐ	
১৩১০.	মোঃ ইমতিয়াজ আলী	মৃত আজগর আলী মন্ডল	শিচারপাড়া	
১৩১১.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত হোসেন আলী সরকার	ঐ	
১৩১২.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত দরবার উদ্দিন সরকার	ঐ	
১৩১৩.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত হবিবর রহমান	চরপাড়া	
১৩১৪.	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	মৃত মনছের আলী মন্ডল	ঐ	
১৩১৫.	মোঃ সোলাইমান আলী	মৃত ছহির উদ্দিন প্রাং	ঐ	
১৩১৬.	মোঃ আব্দুল গফুর	মৃত গোলাম হোসেন	ঐ	
১৩১৭.	মোঃ ছালেক উদ্দিন	মৃত ইছাহাক আলী	ঐ	
১৩১৮.	মোঃ মোহাম্মদ আলী	মৃত জনাব আলী বেপারী	মোন্নারপটল	
১৩১৯.	মোঃ মোকলেছার রহমান	মৃত হাতেম উদ্দিন সরকার	তেলুরপাড়া	
১৩২০.	মোঃ তারাজুল ইসলাম	মৃত মিজানুর রহমান	গোলাসিলপাড়া	
১৩২১.	আমির হোসেন	মৃত কছিম উদ্দিন মন্ডল	সোনাকান্দিয়া	
১৩২২.	মোঃ খায়রুত জামান	মৃত মজিবর রহমান	ঐ	
১৩২৩.	মোঃ কামাল উদ্দিন	মৃত গোলাম উদ্দিন	ঐ	
১৩২৪.	মোঃ জিয়াদুর রহমান	মৃত রজব আলী মন্ডল	ঐ	
১৩২৫.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত মোতরাজ আলী মন্ডল	হলিদাবগা	
১৩২৬.	মোঃ ছানছুল ইসলাম	মৃত মোসলেম উদ্দিন প্রাং	শিচারপাড়া	
১৩২৭.	মোঃ তারাজুল ইসলাম	মৃত জশমতুল্যা সাহ	চরপাড়া	
১৩২৮.	মোঃ আব্দুল জলিল প্রাং	মৃত আছর উদ্দিন প্রাং	নওদাবগা	
১৩২৯.	মোঃ জমির উদ্দিন	মৃত ইজার উদ্দিন	হলিদাবগা	
১৩৩০.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত ইজার উদ্দিন	ঐ	
১৩৩১.	মোঃ নুরুল আমিন	মৃত জোকার বেপারী	ঐ	
১৩৩২.	মোঃ আব্দুল কাদের	মৃত শুকুর আলী	চরপাড়া	
১৩৩৩.	মোঃ হযরত আলী	মৃত ছাবেদ আলী আকন্দ	ভাকুরপাড়া	
১৩৩৪.	মোঃ হামিদুল হক	মৃত মহসেন আলী আকন্দ	ভাকুরপাড়া	
১৩৩৫.	মোঃ আব্দুল বাছেদ	মৃত মীর বক্স	ভাকুরপাড়া	
১৩৩৬.	মোঃ লাল মিয়া	মৃত হাদী মন্ডল	সোনাকান্দিয়া	
১৩৩৭.	মোঃ আব্দুল মজিদ শেখ	মোঃ নইম উদ্দিন শেখ	নিমেরপাড়া	
১৩৩৮.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	মৃত বজলার রহমান সরকার	নিমেরপাড়া	
১৩৩৯.	মোঃ শাহজাহান আলী প্রাং	মৃত নজির হোসেন প্রাং	গোলাইবাড়ী	
১৩৪০.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মৃত উমেদ আলী আকন্দ	ঐ	
১৩৪১.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত কিছমতুল্যা প্রাং	ঐ	
১৩৪২.	মৃত দুদু শেখ	মৃত হোসেন শেখ	ঐ	
১৩৪৩.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত মনির উদ্দিন আকন্দ	ঐ	
১৩৪৪.	মোঃ তাইদুর রহমান	মৃত হাজী তছলিম উদ্দিন	দক্ষিণ বয়ড়া	
১৩৪৫.	শ্রী শুসান্ত কুমার ঘোষ	মৃত শশী ভূষন ঘোষ	চরপাড়া	
১৩৪৬.	মোঃ আব্দুল হালিম	মৃত আছিম উদ্দিন মন্ডল	গোলাইবাড়ী	
১৩৪৭.	মোঃ ওলিলুর রহমান	মৃত ইব্রাহীম আলী	বয়ড়া	
১৩৪৮.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মৃত আজিজার রহমান	সোনাকান্দিয়া	
১৩৪৯.	মোঃ এনামুল হক	মৃত আজিজার রহমান	ঐ	
১৩৫০.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত দিদারত আলী সরকার	মধুপুর	
১৩৫১.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মৃত জমির উদ্দিন প্রাং	হাসয়াজ	
১৩৫২.	মোঃ মহাতাব উদ্দিন	মৃত মজিবর রহমান মন্ডল	ঐ	
১৩৫৩.	মোঃ শাহ আলম প্রধান	মৃত বাছির উদ্দিন প্রধান	ঐ	
১৩৫৪.	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	মৃত ছহির উদ্দিন	ঐ	
১৩৫৫.	মৃত মকবুল হোসেন আকন্দ	মৃত ইজার উদ্দিন আকন্দ	পাঁচুম তেকান্দী	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৩৫৬.	মোঃ মওজা হোসেন মুন্সী	মৃত একরাম হোসেন মুন্সী	ঐ	
১৩৫৭.	মৃত ইশারত আলী	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	দড়িহাসরাজ	
১৩৫৮.	মৃত মোঃ লুৎফর রহমান সরকার	মৃত কছিম উদ্দিন সরকার	ফুলবাড়িয়া	
১৩৫৯.	মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন আহ	মৃত মনাহাজ্জ সবদেব প্রাং	ঐ	
১৩৬০.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত জনাব আলী	চুকাইনগর/কোরণী	
১৩৬১.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত সাহেব আলী বেপারী	ঐ	
১৩৬২.	মোঃ নুরুল আজম	মৃত ময়েন উদ্দিন সেখ	পর্বতেকানী	
১৩৬৩.	মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী	মৃত নাজির উদ্দিন আকন্দ	চুকাইনগর	
১৩৬৪.	মোঃ আবু সায়েদ মিয়া	মৃত হোছেন আলী বেপারী	চুকাইনগর	
১৩৬৫.	মৃত এম এস মঞ্জুরুল	মৃত মহব্বত আলী সরকার	রাধাকান্তপুর	
১৩৬৬.	মৃত এটিএম আলতাফ হোসেন	মোঃ বচু রহমান মন্ডল	পাকুল্যা	
১৩৬৭.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আবেদ আলী আকন্দ	ঐ	
১৩৬৮.	মৃতহাফিজার রহমান	মৃত সৈয়দ আলী আকন্দ	নিশ্চিন্তপুর	
১৩৬৯.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত জাহা বক্স শেখ	ঐ	
১৩৭০.	মোঃ নয়া মিয়া	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	সাতবেকী	
১৩৭১.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত নাজির হোসেন মন্ডল	পদ্যপাড়া	
১৩৭২.	মৃত মোকলেছার রহমান	মৃত সৈয়দ জামান চৌধুরী	ঐ	
১৩৭৩.	মোঃ একরাম হোসেন প্রাং	মৃত হেজাম উদ্দিন প্রাং	শ্যামপুর	
১৩৭৪.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত তবিবর রহমান	নিশ্চিন্তপুর	
১৩৭৫.	মোঃ মোকলেছুর রহমান	মৃত ইউছুব আলী সরকার	সাতবেকী	
১৩৭৬.	মোঃ শহীদ মোজাম্মেল	মৃত আজিম উদ্দিন	ঐ	
১৩৭৭.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত নয়ন উদ্দিন	শ্যামপুর	
১৩৭৮.	মৃত আঃ ছালেক	কান্দু প্রামাণিক	নাগাজ খালী	
১৩৭৯.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত মহর উদ্দিন সরকার	রানীর পাড়া	
১৩৮০.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত অছিম উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১৩৮১.	মোঃ হারুনার রশিদ	মৃত মোকছেদুল হক	ঐ	
১৩৮২.	মোঃ সোলায়মান আলী	মৃত লাল মিয়া প্রাং		
১৩৮৩.	একেএম রেজাউল হক	মৃত ইমদাদুল হক	নিত্যানন্দনপুর	
১৩৮৪.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মোঃ আশরাফ আলী সরকার	ঐ	
১৩৮৫.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত বিশাশেখ	ঐ	
১৩৮৬.	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	মৃত মোজাহার উদ্দিন	সোনাতলা	
১৩৮৭.	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	ঐ	
১৩৮৮.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত সাহির উদ্দিন	আগুনিয়া	
১৩৮৯.	মোঃ আব্দুল বাকী	মৃত বচন উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১৩৯০.	মোঃ ফেরদৌস আলম	মোঃ আজিজুর রহমান	ঐ	
১৩৯১.	কলিম উদ্দিন	মোঃ মহব্বত তুল্যা	চকনন্দন	
১৩৯২.	আব্দুল করিম	পরশ উল্যা বেপারী	সুজাইতপুর	
১৩৯৩.	মোঃ আজাহার আলী	মোঃ নজর উদ্দিন	ঐ	
১৩৯৪.	মোঃ আঃ মালেক	মৃত আব্দুল খালেক	কামারপাড়া	
১৩৯৫.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত মজিবর রহমান মন্ডল	ঐ	
১৩৯৬.	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মৃত আব্দুর রহমান	চন্দরগাছা	
১৩৯৭.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত ওয়ারেছ মন্ডল	আড়িয়া চকন্দন	
১৩৯৮.	মোঃ মাহবুবুল আলম	মোঃ মোজাম্মেল হক	সুজাইতপুর	
১৩৯৯.	মোঃ জাহেদুল বারী	মৃত তফছির মোল্যা	কাবিলপুর	
১৪০০.	মোঃ সাইফুর রহমান	মৃত মতিয়ার রহমান	নিত্যনন্দনপুর	
১৪০১.	মোঃ শাহজাহান	মৃত বিলায়েত আলী	সুজাইতপুর	
১৪০২.	মোঃ মোছাদ্দেক হোসেন	মৃত ডাঃ দৌলতুল্যা মন্ডল	কামারপাড়া	
১৪০৩.	মোঃ মোহাম্মদ আলী	মৃত ছাদেক আলী	গড়ফতেপুর	
১৪০৪.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত আব্দুস ছাত্তার আঃ	ঘোচারপুকুর	
১৪০৫.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত দারাজ তুল্যা মন্ডল	কানুপুর	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৪০৬.	মোঃ এ.এফ.এম নুরুল ইসলাম	মৃত আব্বাস আলী আকন্দ	রশিদপুর	
১৪০৭.	মোঃ সৈয়দ নুরুল ইসলাম	মৃত সৈয়দ হাবিবুর রহমান	দাউদপুর	
১৪০৮.	মৃত জাহিদ হোসেন	মৃত মোজাম্মেল হক	রশিদপুর	
১৪০৯.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত বছের উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১৪১০.	মোঃ আব্দুস ছামাদ	মৃত ছমির উদ্দিন	উঃ দিঘলকান্দি	
১৪১১.	মোঃ জাহিদুল বারী	মৃত আঃ লতিফ মন্ডল	বড় বালুয়া	
১৪১২.	মৃত আনারুল ইসলাম	মৃত আঃ কাদের মন্ডল	ছোট বালুয়া	
১৪১৩.	মোঃ মফজুল হোসেন	মৃত সয়েফ উদ্দিন বেপারী	কানুপুর	
১৪১৪.	মোঃ ভাজা মিয়া	মৃত ওসমান গনি মোল্যা	কানুপুর	
১৪১৫.	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত মোহাম্মদ আলী	দঃ আটকরিয়া	
১৪১৬.	মোঃ মাজাহার আলী	মৃত হাসের আলী	রশিদপুর	
১৪১৭.	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত বিয়াজ উদ্দিন	দাউদপুর	
১৪১৮.	মোঃ ছায়েমার জাহান	মৃত জবেদ আলী	ঐ	
১৪১৯.	শ্রী ধম্মা চন্দ্র	মৃত শ্রী হরিদয়াল চন্দ্র	হরিয়াকান্দি	
১৪২০.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত আকবর আলী	নুরারপটল	
১৪২১.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত ছামছুল হক মোল্যা	ঐ	
১৪২২.	মোঃ এনাজুল হক	মৃত গোফার আলী শেখ	ঐ	
১৪২৩.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত সিরাজ উদ্দিন প্রাং	মহিচরনহাট	
১৪২৪.	মৃত ইদ্রিস আলী সরকার	মৃত হামেদ আলী সরকার	ঐ	
১৪২৫.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	মৃত আরজুল্লা বেপারী	ঐ	
১৪২৬.	মোঃ রবিয়া প্রাং	মৃত সারাফত উল্যা প্রাং	ঐ	
১৪২৭.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার বেপারী	মৃত হায়দার আলী বেপারী	ঐ	
১৪২৮.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত মজিবর রহমান প্রাং	ঐ	
১৪২৯.	মোঃ আনছার আলী	মৃত ছহিম উদ্দিন	ঐ	
১৪৩০.	মোঃ হামিদুল হক	মৃত হাফিজার রহমান	চারালকান্দি	
১৪৩১.	মোঃ শহীদ ছায়েদ আলী	মৃত মহির উদ্দিন	ঐ	
১৪৩২.	মোঃ শাহালৎ হোসেন	মৃত রমজান আলী প্রাং	ঐ	
১৪৩৩.	শ্রী অখিল চন্দ্র রায়	শ্রী অরঞ্জন চন্দ্র রায়	ঐ	
১৪৩৪.	মোঃ ফুল মিয়া	মৃত আছিম উদ্দিন মন্ডল	নুরপুর	
১৪৩৫.	মোঃ নাছির উদ্দিন	মৃত মজিবর রহমান	ঐ	
১৪৩৬.	শ্রী রমচন্দ্র রাং	মৃত হরিদয়াল রাং	হাড়িয়াকান্দি	
১৪৩৭.	মৃত ছামছুল আলম	মৃত ছিফাতুল্যা প্রাং	লোহাগাড়া	
১৪৩৮.	মোঃ খাজা নাজিম উদ্দিন	মৃত কছিম উদ্দিন	ঐ	
১৪৩৯.	মোঃ সামওয়াত হোসেন	মৃত ইউছুব উদ্দিন প্রাং	দিগদাইড়	
১৪৪০.	মোঃ ফনিম উদ্দিন	মৃত গোলাম উদ্দিন	বারঘরিয়া	
১৪৪১.	মোঃ ফেরদৌসি আলম	মৃত রজিব উদ্দিন	ঐ	
১৪৪২.	মোঃ মালেক	একে ফরিদুল হক	শিহিপুর	
১৪৪৩.	মোঃ আজিজুল ইসলাম	মৃত লেলোয়ার আলী	ভেলুরপাড়া	
১৪৪৪.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মৃত ভোলা আকন্দ	ঐ	
১৪৪৫.	মোঃ মোস্তেজার রহমান	মৃত করিম উদ্দিন প্রাং	ভলুরপাড়া	
১৪৪৬.	মোঃ মিয়াজান আলী	মৃত ইশারত আলী	চরপাড়া	
১৪৪৭.	মোঃ আব্দুল ফাদের	মৃত আবেশ আলী	ঠাকুরপাড়া	
১৪৪৮.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত গোফার আলী	চরপাড়া	
১৪৪৯.	মোঃ এনামুল হক	মৃত শওকত আলী আকন্দ	হালিদাবগা	
১৪৫০.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত আজিম উদ্দিন	কুশাহাটা	
১৪৫১.	মৃত জাহেদুর রহমান	মৃত মোজাহার আলী	হলিদাবগা	
১৪৫২.	মোঃ আব্দুল বাকী	মৃত আব্দুল করিম আকন্দ	ঐ	
১৪৫৩.	মোঃ মোজাফফর	মৃত শাহরউল্লা বেপারী	ঐ	
১৪৫৪.	মোঃ আজাহার আলী	মৃত মহাসেন আলী	ঐ	
১৪৫৫.	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত মীর উদ্দিন বেপারী	ঐ	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৪৫৬.	মোঃ ইউনুছ আলী	মৃত ওসমান আলী আকন্দ	ঐ	
১৪৫৭.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত গুল মোহাম্মদ প্রাং	গোসাইবাড়ী	
১৪৫৮.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত রমজান আলী	ঐ	
১৪৫৯.	মোঃ আব্দুল মান্নান	মৃত রকিউল্লা প্রাং	ঐ	
১৪৬০.	মোঃ তফিজ উদ্দিন	মৃত রজব আলী প্রাং	ঐ	
১৪৬১.	মোঃ সবদের আলী	মৃত কুদরত আলী প্রাং	ঠাকুরপাড়া	
১৪৬২.	মোঃ শামছ উদ্দিন	মৃত আবেশ আলী প্রাং	ঐ	
১৪৬৩.	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত শাহাদৎ জামান	ঐ	
১৪৬৪.	মোঃ খায়রুল ইসলাম	মৃত ইদ্রিস আলী	সোনাকানিয়া	
১৪৬৫.	মোঃ আয়েজ উদ্দিন	মৃত নাজিম উদ্দিন	ঐ	
১৪৬৬.	মোঃ সামছুল হক	মৃত আশরাফ আলী আকন্দ	মধ্য নিয়লকান্দি	
১৪৬৭.	মোঃ মোকাররম আলী	মৃত ভাদু ফকির	মধ্য নিয়লকান্দি	
১৪৬৮.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত ছাদেক আলী প্রাং	শিচারপাড়া	
১৪৬৯.	মোঃ হারুন অর রশিদ	মৃত আফছার আলী সরকার	ঐ	
১৪৭০.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত আব্দুল লতিফ মন্ডল	ঐ	
১৪৭১.	মোঃ আজব আলী	মৃত আশর উদ্দিন	ঐ	
১৪৭২.	মোঃ সামছুল হক	মৃত নাছিন উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১৪৭৩.	মোঃ শাহাদৎ জামান	মৃত মেয়েজ উদ্দিন প্রাং	সোনারপটল	
১৪৭৪.	মোঃ হারুন অর রশিদ	মৃত আবুল হোসেন মন্ডল	ঐ	
১৪৭৫.	মোঃ জাহেদুর রহমান	মৃত ইলাম উদ্দিন খন্দকার	বাইউটৌনা	
১৪৭৬.	মোঃ বাবলু মিয়া	মৃত আব্দুল গফুর খন্দকার	ঐ	
১৪৭৭.	মোঃ মোকছেদ আলী	মৃত কাসেম আলী	উঃ বয়ড়া	
১৪৭৮.	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মৃত আহাদ আলী প্রাং	ফোড়াডাংগা	
১৪৭৯.	মোঃ বুলু মিয়া	মৃত ইছাহাক আলী প্রাং	নওদাবগা	
১৪৮০.	মোঃ লিয়াকত আলী	মৃত মোসলেম উদ্দিন প্রাং	ঠাকুরপাড়া	
১৪৮১.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত তাহিন উদ্দিন	পঃ ফকরমজা	
১৪৮২.	মোঃ ছাবেবর রহমান	মৃত আশমতুল্যা	ঐ	
১৪৮৩.	মোঃ ছামছুল আলম	মৃত নাসির উদ্দিন প্রাং	ঐ	
১৪৮৪.	মোঃ কেরামত আলী	মৃত নাসির উদ্দিন	ঐ	
১৪৮৫.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মৃত কালু মন্ডল	পোড়াপাইকর	
১৪৮৬.	মোঃ হযরত আলী	মৃত রহমান মন্ডল	জোড়গাছা	
১৪৮৭.	আমজাদ হোসেন	মৃত রবিয়া প্রাং	ঐ	
১৪৮৮.	মোঃ আব্দুল কাদের	মৃত আনছার আলী কাজী	সোনাকানিয়া	
১৪৮৯.	মোঃ সৈয়দ জামান খন্দকার	মৃত আজিম উদ্দিন	বাউওটৌনা	
১৪৯০.	মোঃ আব্দুল জোব্বার	মৃত জমির উদ্দিন	জোড়গাছা	
১৪৯১.	মোঃ ইমদাদুল হক	মৃত ফজলুল রহমান	উঃ বয়ড়া	
১৪৯২.	মৃত আফছার আলী	মৃত নঈম উদ্দিন	জোড়গাছা	
১৪৯৩.	মোঃ মাসুদুল হোসেন	মৃত ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন	জোড়গাছা	
১৪৯৪.	শাহাদৎ জামান	মৃত হাবিবুর রহমান	জোড়গাছা	
১৪৯৫.	মোঃ মোজাহার আলী	মৃত আলেক উদ্দিন	জোড়গাছা	
১৪৯৬.	মোঃ নজমুল আহসান	মৃত ডাঃ লুৎফর রহমান	বয়ড়া	
১৪৯৭.	মোঃ ফজলুল বারী	মৃত ইসমাইল হোসেন আঃ	ঠাকুরপাড়া	
১৪৯৮.	মোঃ ইমদাদুল হক	মৃত ফজলুল রহমান	বয়ড়া	
১৪৯৯.	মোঃ রফিকুল বারী	মৃত ভুলু প্রাং	দাড়িহাসরাজ	
১৫০০.	মোঃ ছালজার রহমান	মৃত জয়নাল আবেদীন	দাড়িহাসরাজ	
১৫০১.	মোঃ ফেরদৌস জাহান	মৃত মনির উদ্দিন	হাসরাজ	
১৫০২.	মোঃ শহীদ ভোজা মিয়া	মৃত শের আলী বেপারী	ঐ	
১৫০৩.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত নাছির উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১৫০৪.	মোঃ ছামছুল হক মন্ডল	মৃত রইছ উদ্দিন মন্ডল	দাড়িহাসরাজ	
১৫০৫.	মোঃ জালাল উদ্দিন বেপারী	চশমত আলী বেপারী	দাড়িহাসরাজ	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৫০৬.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত মহসেন আলী মন্ডল	হাসরাজ	
১৫০৭.	মোঃ আব্দুল বাকী বেপারী	মৃত শুকুর আলী বেপারী	দাঁড়িয়াপসরাজ	
১৫০৮.	মোঃ আবু তাহের মুন্সী	মৃত তবিবর রহমান মুন্সী	পঃ তেকানী	
১৫০৯.	মোঃ হোসেন আকন্দ মকবুল	মৃত ইজার উদ্দিন আকন্দ	পঃ তেকানী	
১৫১০.	মোঃ এনামুল হক	মৃত জুবায়েত হোসেন মন্ডল	চুকাইনগর	
১৫১১.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত জহির উদ্দিন বেপারী	ঐ	
১৫১২.	মোঃ রুহুল আমিন	মৃত ইউনুস উদ্দিন আকন্দ	পূর্বতেকানী	
১৫১৩.	মৃত এনামুল হক	মৃত নাজিম উদ্দিন	পূর্বতেকানী	
১৫১৪.	মোঃ আব্দুল করিম বেপারী	মৃত কোব্বাদ হোসেন	জাত্তিয়ারপাড়া	
১৫১৫.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত দুজা মন্ডল	ঐ	
১৫১৬.	মোঃ আব্দুর রহিম	মৃত অছিম উদ্দিন সরকার	বালিয়াডাংগা	
১৫১৭.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত দৌলত জামান	পূর্বতেকানী	
১৫১৮.	মোঃ সিরাজুল হক	মৃত আলাউদ্দিন মন্ডল	চুকাইনগর	
১৫১৯.	মোঃ ইয়াকুব আলী আকন্দ	মৃত নুরুমিয়া আকন্দ	পূর্বতেকানী	
১৫২০.	মৃত আবুল কাশেম	মৃত বদিউজ্জামান	চুকাইনগর	
১৫২১.	মৃত আফজাল হোসেন	মৃত আলা বক্স সরকার	পূর্বতেকানী	
১৫২২.	মৃত আব্দুল হামিদ	মৃত বদিউজামান মন্ডল	চুকাইনগর	
১৫২৩.	মৃত আব্দুর রাজ্জাক	মৃত জোব্বার আকন্দ	পূর্বতেকানী	
১৫২৪.	মৃত আমজাদ হোসেন	মৃত খায়রত জামান	চুকাইনগর	
১৫২৫.	মোঃ আব্দুল মালেক	মৃত কোববাদ আলী	জাত্তিয়ারপাড়া	
১৫২৬.	মোঃ জহুরুল ইসলাম মন্ডল	মৃত খয়বর আলী মন্ডল	চুকাইনগর	
১৫২৭.	মোঃ ইউছার আলী	মৃত আম্বর আলী বেপারী	চুকাইনগর	
১৫২৮.	মোঃ ওয়াজেদ আলী	মৃত দুকুমিয়া আকন্দ	পূর্বতেকানী	
১৫২৯.	মোঃ বদরুল বাছেদ সরকার	মৃত মজিবর রহমান সরকার	পূর্বতেকানী	
১৫৩০.	মোঃ জাফর আলী	মৃত খলিলুর রহমান	পূর্বতেকানী	
১৫৩১.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত হারেজ উদ্দিন মন্ডল	রাধাকান্তপুর	
১৫৩২.	মোঃ জাহেদুল ইসলাম	মৃত রহিম উদ্দিন আহমেদ	রাধাকান্তপুর	
১৫৩৩.	মোঃ এস.এম তবিবুর রহমান	মৃত মহাতাব হোসেন খন্দকার	পাকুল্যা	
১৫৩৪.	মোঃ নকিবর রহমান	মৃত নিজাম উদ্দিন মন্ডল	পাকুল্যা	
১৫৩৫.	মৃত গোলাম ফারুক	মৃত ওসমান গনি	মিলনের পাড়া	
১৫৩৬.	মোঃ আব্দুল লতিফ	মৃত জনাব আলী	ফরমজা	
১৫৩৭.	মোঃ বাহার উদ্দিন	মৃত বাহির উদ্দিন	ঐ	
১৫৩৮.	মোঃ টুকু সরকার	মৃত তমিজ উদ্দিন	ঐ	
১৫৩৯.	মৃত আলীম উদ্দিন	মৃত আজাহার আলী	হয়াকুয়া	
১৫৪০.	মোঃ বাবর আলী	মৃত বাশাতুল্যা	হয়াকুয়া	
১৫৪১.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত মজিবর রহমান	ঐ	
১৫৪২.	মোঃ আখতার হোসেন	মৃত আলা বক্স	ঐ	
১৫৪৩.	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত ইসমাইল হোসেন	ঐ	
১৫৪৪.	মোঃ ফরিদুজ্জামান	মৃত জনাব আলী মন্ডল	সাতবেকী	
১৫৪৫.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত কিয়াছ উদ্দিন	সাতবেকী	
১৫৪৬.	মোঃ এইচ এম আমিনুল	মৃত কাবিল হোসেন	পরপাড়া	
১৫৪৭.	মোঃ আব্দুল হাই মন্ডল	মৃত হাসান আলী মন্ডল	ঐ	
১৫৪৮.	মোঃ বেলাল উদ্দিন	মৃত তরিকুল মোল্লা	ঐ	
১৫৪৯.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত কেরামত আলী	পূর্বসুজাইপুরহাট	
১৫৫০.	এটিএম জুলফিকার হায়দার	মৃত বাচ্চু মিয়া প্রাং	ঐ	
১৫৫১.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত আকরাম আলী	ঐ	
১৫৫২.	মোঃ গাওছুল আজম	মৃত আব্বাছ আলী	ঐ	
১৫৫৩.	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত আবুল হোসেন	ঐ	
১৫৫৪.	মোঃ আব্দুর রহমান	মৃত হাফিজার রহমান	ঐ	
১৫৫৫.	মোঃ সামাদ	মৃত মন্তেজার সরকার	শ্যামপুর	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৫৫৬.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত ফাইম উদ্দিন	উঃ কয়মজা	
১৫৫৭.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মৃত মোসলেম উদ্দিন	চারালকান্দি	
১৫৫৮.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত এফাজ উদ্দিন	আচারপাড়া	
১৫৫৯.	মোঃ শফিউল আলম	মৃত আঃ রহিম	পাকুল্লা	
১৫৬০.	মোঃ আঃ ওয়াহেদ	মৃত বচু রহমান	পাকুল্লা	
১৫৬১.	মোঃ শহীদ মোজাম্মেল হক	মৃত আজিম উদ্দিন	সাতবেকী	
১৫৬২.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত নয়ামিয়া	শ্যামপুর	
১৫৬৩.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত মুনছের আলী মন্ডল	শিচারপাড়া	
১৫৬৪.	তোফাজ্জল হোসেন	মৃত উমেদ আলী মৃধা	ঐ	
১৫৬৫.	এ জেড নুর মোহাম্মদ	মৃত আবেদ আলী সরকার	ঐ	
১৫৬৬.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত আব্দুস সামাদ মোল্লা	ঐ	
১৫৬৭.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত এবারত আলী সরকার	ঐ	
১৫৬৮.	মোঃ শফিকুল আলম	মৃত হোসেন আলী মন্ডল	ঐ	
১৫৬৯.	মোঃ রোস্তম আলী	মৃত তহলিম উদ্দিন সরকার	জোড়গাছা	
১৫৭০.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত জলাল উদ্দিন আকন্দ	ঐ	
১৫৭১.	মোঃ আব্দুল বাছেদ	মৃত নজের উদ্দিন মোল্লা	ঐ	
১৫৭২.	মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান	মৃত আব্দুল মজিদ সরকার	ঐ	
১৫৭৩.	মোঃ গোলাম হান্নান	মৃত বদর জামান	নওদাবগা	
১৫৭৪.	মৃত আব্দুল করিম	মৃত আহম্মেদ আলী সরকার	ঐ	
১৫৭৫.	মোঃ আনিছুর রমান	মৃত ছদরুল আলম	মধ্য দিঘলকান্দি	
১৫৭৬.	মোঃ শাহাদত হোসেন	মৃত কছিম উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১৫৭৭.	মোঃ আব্দুল গফুর	মৃত কালাম সরকার	দক্ষিন বয়ড়া	
১৫৭৮.	মোঃ সাহেব আলী মন্ডল	মৃত আব্দুস ছাত্তার মন্ডল	সোনাকান্দিয়া	
১৫৭৯.	মোঃ আব্দুল মান্নান খোকা	মৃত রফিকুল্লাহ	গোসাইবাড়ী	
১৫৮০.	মোঃ এ কে আজাদ	মৃত লবিয় উদ্দিন প্রামাণিক	পশ্চিম করমজা	
১৫৮১.	মোঃ আব্দুল গফুর মন্ডল	মৃত রহিম উদ্দিন মন্ডল	মোনার পোটল	
১৫৮২.	মোঃ শাহাদৎ জামান	মৃত মোসলেম উদ্দিন	উত্তর বয়ড়া	
১৫৮৩.	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত ওসমান আলী	চরপাড়া	
১৫৮৪.	মৃত ইসমাইল হোসেন	মৃত তছির উদ্দিন সরকার	উত্তর বয়ড়া	
১৫৮৫.	মৃত আবু বকর সিদ্দিক	মৃত মোহাম্মদ আলী	গণষারপাড়া	
১৫৮৬.	মোঃ আব্দুল ছালাম (রঞ্জু)	মৃত মকবুল হোসেন	বয়ড়া	
১৫৮৭.	আব্দুল খালেক	মৃত শুকুর আলী	দিনারপাড়া	
১৫৮৮.	আব্দুল ওয়াহেদ	মৃত ময়েজ উদ্দিন প্রাং	ঠাকুরপাড়া	
১৫৮৯.	মৃত জালাল উদ্দিন	মৃত গমির উদ্দিন	জোড়গাছা	
১৫৯০.	মৃত বেলায়েত হোসেন	মৃত খাদেমুদ্দিন	ঠাকুরপাড়া	
১৫৯১.	মোঃ হাবিবর রহমান	মৃত আজিজ উদ্দিন	শিচারপড়া	
১৫৯২.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মোঃ আবির উদ্দিন	গোসাইবাড়ী	
১৫৯৩.	মোঃ আব্দুল হান্নান	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	জোড়গাছা	
১৫৯৪.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত তফিজ উদ্দিন সরকার	শিচারপাড়া	
১৫৯৫.	মোঃ নজমল হোসেন	মোঃ জোবেদালী বেপারী	নাটমন্ডেকান্দি	
১৫৯৬.	মোঃ হুমায়ন কবীর মুন্সি	মৃত মতিয়ার রহমান মুন্সি	ঐ	
১৫৯৭.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মোঃ আবুল কাশেম	শালিখা	
১৫৯৮.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত হাফিজার রহমান	মধুপুর	
১৫৯৯.	তোতা মিয়া	মৃত শের আলী	ঐ	
১৬০০.	মোঃ মোস্তফা কামাল	খন্দকার মোজাম্মেল হোসেন	শিহিপুর	
১৬০১.	মোঃ নুর আলম	মোঃ ইউনুছ উদ্দিন	ঐ	
১৬০২.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত মাহাতাব উদ্দিন	ঐ	
১৬০৩.	মোঃ ফেরদৌস আলম	মোঃ ফজলুল করিম	ঐ	
১৬০৪.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত ময়ছা প্রাং	দিগলাইড়	
১৬০৫.	জিল্লুর রহমান	মৃত অছিম উদ্দিন	চারালকান্দি	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৬০৬.	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ মোস্তাফেজুর রহমান	ঐ	
১৬০৭.	মোঃ জাহেদুল ইসলাম	মৃত হায়পত আলী খান	কোয়ালিকান্দি	
১৬০৮.	মোঃ আব্দুল কাদের	ইসমাইল হোসেন	নুরায়পটল	
১৬০৯.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত ইছাহক প্রাং	ঐ	
১৬১০.	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত মহির উদ্দিন	ফাজিলপুর	
১৬১১.	মোঃ হাচেন আলী	মৃত আকবর আলী	শিহিপুর	
১৬১২.	মৃত হাফিজার রহমান	মৃত হারেছ উদ্দিন	মাইচরন	
১৬১৩.	মৃত শহীদুল আলম	মৃত ছামছুল আলম সরকার	ঐ	
১৬১৪.	মোঃ সিদ্দিক হোসেন	মৃত আবুল কাশেম মন্ডল	ঐ	
১৬১৫.	মোঃ দৌলতজামান (দুলু)	মৃত ইছাহক আলী	মহব্বতের পাড়া	
১৬১৬.	মোঃ সাহাজুল ইসলাম গাজী	মৃত আমিরুল ইসলাম	ঐ	
১৬১৭.	মৃত আফজান হোসেন	মৃত আবুল কাশেম মোল্লা	চুকাইনগর	
১৬১৮.	মৃত ফজলুল হক	মৃত চান্দু শেখ	পূর্বতেকানী	
১৬১৯.	মোঃ আব্দুর রহিম	মোঃ রাজিব উদ্দিন	খাবুলিয়া	
১৬২০.	মোঃ ফারাজুল হোসেন	মৃত আব্দুল জোব্বার মন্ডল	বড়বালুয়া	
১৬২১.	মোঃ আব্দুল আজিজ	মৃত আলতাফ উদ্দিন	দক্ষিণ আটকরিয়া	
১৬২২.	মোঃ রফিকুল ইসলাম খান	আব্দুল হামিদ খান	পুগলিয়া	
১৬২৩.	মৃত হাফিজুর রহমান	সৈয়দ আহম্মেদ	মহিষাবাড়ী	
১৬২৪.	মৃত আব্দুল বার্কী	মৃত আব্দুল কুদ্দুছ	উত্তর দিঘলকান্দি	
১৬২৫.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত ফইম উদ্দিন	উত্তর করমজা	
১৬২৬.	মোঃ মুক্তার মিয়া	মৃত আবুল হোসেন	আচারের পাড়া	
১৬২৭.	মোঃ সৈয়দ জামান	হামেদ আলী	আচারের পাড়া	
১৬২৮.	মোঃ আমজাদ হোসেন	নুরুল ইসলাম সরকার	শ্যামপুর	
১৬২৯.	নজরুল ইসলাম	চান মিয়া	পাকুল্যা	
১৬৩০.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মজিবুর রহমান	আগুনিয়াতাইন	
১৬৩১.	মোঃ মাহফুজার রহমান	মোহাম্মদ আলী খান	ঐ	
১৬৩২.	মোঃ রফিকুল আলম	মোঃ রমজান আলী মন্ডল	ঐ	
১৬৩৩.	মোঃ সাকোওয়াত হোসেন	মৃত হবিবর রহমান মোল্লা	নামাজখালি	
১৬৩৪.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত বিত্ত আলী	নিত্য নন্দনপুর	
১৬৩৫.	তাজুল ইসলাম	মৃত মহির উদ্দিন মন্ডল	চমরগাছা	
১৬৩৬.	মোস্তফা সুলতানুর	মৃত শাহাদৎ হোসেন	খানার পাড়া	
১৬৩৭.	দৌলতজামান	মোঃ রহিম উদ্দিন মন্ডল	রানীরপাড়া	
১৬৩৮.	মোঃ আব্দুল মালেক	মৃত আব্দুল খালেক বেপারী	কামারপাড়া	
১৬৩৯.	মোঃ খোরশেদ আলম	মোঃ সামছুদ্দিন আকন্দ	কাবিলপুর	
১৬৪০.	মোঃ মাহফুজুল হক	মৃত মোজাম্মেল হক	ছয়ঘড়িয়া পাড়া	
১৬৪১.	মৃত আব্দুল কুদ্দুছ	মৃত হাফেজ উদ্দিন	কাবিলপুর	
১৬৪২.	মৃত জসিম উদ্দিন	জাফর উদ্দিন তালুকদার	কামারপাড়া	
১৬৪৩.	আব্দুর রউফ	মফিজ উদ্দিন সরকার	চমরগাছা	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৬৪৪.	মোঃ নুরুল ইসলাম ফকির	মৃত কিতাব উদ্দিন ফকির	বিহার ফকিরপাড়া	
১৬৪৫.	মোঃ আবুল কাশেম মন্ডল	মৃত রমজান আলী	পূর্ব জাহাঙ্গীরাবাদ	
১৬৪৬.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত মেরাজ উদ্দিন	গোকুলপুর	
১৬৪৭.	মোঃ মোখলেছার রহমান	মৃত মমতাজ আলী	চাঁদনিয়া	
১৬৪৮.	মোঃ মাহফুজুল হক	মৃত আঃ জোব্বার	কুকি বাজিত	
১৬৪৯.	শ্রী ফনিভূষণ দাশ	শ্রী শশধর দাশ	কুকি জান্নাতপুর	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৬৫০.	মোঃ আঃ বারী সরদার	মোঃ কজিম উদ্দিন	চক পাড়া	
১৬৫১.	শ্রী শিবেন্দ্র মুস্তাফী	শ্রী শচিন্দ্র মুস্তাফী	শংকরপুর	
১৬৫২.	মোঃ আঃ আজিজ	মোঃ রমজান আলী	পদ্মটিকা	
১৬৫৩.	মোঃ আক্কাছুর রহমান	মৃত মনির উদ্দিন	পদ্মটিকা	
১৬৫৪.	মোঃ আবুল কাশেম ফকির	মৃত জবেদ আলী ফকির	মুরাদপুর	
১৬৫৫.	মোঃ আঃ মতিন	লস্কর আলী	মুরাদপুর	
১৬৫৬.	শ্রী খগেন্দ্র নাথ প্রাং	শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র প্রাং	রহবল	
১৬৫৭.	শরিফুল ইসলাম (জিন্না)	)মোঃ আজিমুদ্দিন	মহাস্থান	
১৬৫৮.	মোঃ সাইদুজ্জামান	হাজী সোলাইমান	হাবিবপুর	
১৬৫৯.	মোঃ আশরাফ আলী	আঃ ছাত্তার	রহবল	
১৬৬০.	মোঃ সোলাইমান আলী	মৃত ওয়াহেদ আলী	মহাস্থান	
১৬৬১.	শ্রী সন্তোষ কুমার মোহন্ত	ডাঃ প্রাণ বল্লভ মোহন্ত	সাদুল্লাপুর	
১৬৬২.	হাফিজার রহমান	মৃত খেজমতুল্যা শেখ	সাদুল্লাপুর	
১৬৬৩.	সৈয়দ মির্জারুল আলম চৌধুরী	সৈয়দ মোজাহার হোসেন	চাঁদনিয়া	
১৬৬৪.	মোঃ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার	মৃত শামসউদ্দিন তালুকদার	ধোনাকোলা	
১৬৬৫.	মোঃ আঃ সোবহান	মৃত কোরবান আলী মাস্টার	দোপাড়া	
১৬৬৬.	মোঃ ন বীর উদ্দিন আকন্দ	মৃত আরমান আলী আকন্দ	আটমূল	
১৬৬৭.	মোঃ শাহনওয়াজ (চুন্নু)	মৃত এ এইচ এম হজরত উল্লা	সোনাদেউল	
১৬৬৮.	মোঃ আজাহার আলী খান	মোঃ সাদেক আলী খান কুরাইশ	শিবগঞ্জ	
১৬৬৯.	শ্রী পরিমল সরকার	মৃত রমেশ চন্দ্র সরকার	কুলুপাড়া	
১৬৭০.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত সবারত উল্লা	গলিপাড়া	
১৬৭১.	মোঃ আমিনুর রহমান	মৃত নাসির উদ্দিন	বিহার	
১৬৭২.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত মমিন উদ্দিন	বিহার উঃ পাড়া	
১৬৭৩.	মোঃ তাহেরুল ইসলাম	মৃত সরাফত আলী	বিহার হাট	
১৬৭৪.	মৃত আঃ বারী স্বর্ণকার	মৃত রকিব উদ্দিন স্বর্ণকার	বিহার সোনারপাড়া	
১৬৭৫.	মোঃ আফছার আলী	মৃত বছির উদ্দিন	বিহারহাট	
১৬৭৬.	মোঃ মোজাফফর হোসনে	মৃত জহির উদ্দিন	সচিয়ানী	
১৬৭৭.	মৃত হবিবুর রহমান	হালিমুদ্দিন ফকির	বিহার ফঃ পাড়া	
১৬৭৮.	মোঃ আলতাব হোসেন	মৃত এনায়েত তুল্যা	সোনাপুরা	
১৬৭৯.	মোঃ হাবিবুর রহমান (গনি)	মৃত সরাফত আলী	শিচতপুর	
১৬৮০.	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মালেক উদ্দিন	বিলহামলা	
১৬৮১.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মৃত নাহির উদ্দিন	ঐ	
১৬৮২.	মোঃ সোলেমান আলী	মৃত তমিজ উদ্দিন	ঐ	
১৬৮৩.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত নিয়াজ উদ্দিন	ঐ	
১৬৮৪.	মোঃ মোখলেছার রহমান	মৃত মমতাজ উদ্দিন	খরকোনা	
১৬৮৫.	মোঃ আঃ কাদের	মৃত জাবেদ আলী	বিলহামলা	
১৬৮৬.	মোঃ নবির উদ্দিন	মৃত মহসিন	ঐ	
১৬৮৭.	মোঃ আ' ছাত্তার	মৃত জাহির উদ্দিন	ঐ	
১৬৮৮.	মোঃ ছাফায়েতুল্যা	মৃত ইউনুছ আলী	ঐ	
১৬৮৯.	মৃত নওফেল আলম	মৃত এস এম মইনুল হক	মোড়াইল	
১৬৯০.	মোঃ ফলযর রহমান	মৃত মানির উদ্দিন	ঐ	
১৬৯১.	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত ছমির উদ্দিন	ঐ	
১৬৯২.	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত সিরাজ সরকার	তাড়াহার	
১৬৯৩.	মোঃ ময়েন উদ্দিন খান	মৃত আবির উদ্দিন খান	ফেলুঞ্জা	
১৬৯৪.	মোস্তফা খান	মৃত আবীর উদ্দিন খান	ঐ	
১৬৯৫.	মোঃ মফিজ উদ্দিন মোল্লা	মৃত ছৈইমুদ্দিন মোল্লা	মাসিমপুর চালুঞ্জা	
১৬৯৬.	মোঃ হামিদুল ইসলাম	মৃত সফর উদ্দিন	ভালুঞ্জা	
১৬৯৭.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত শুকুর আলী তালুকদার	কেলুঞ্জা	
১৬৯৮.	মোঃ লুৎফর রহমান	মোবারক হোসেন ছাতুয়া	ছাতুয়া	
১৬৯৯.	মোঃ শাহাজাহান আলী	মৃত হাহির উদ্দিন মন্ডল	জানগ্রাম	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৭০০.	মোঃ ফজলুর রহমান মীর	মৃত আক্কাছ আলী	ঐ	
১৭০১.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত মফিজ উদ্দিন	পালিকান্দা	
১৭০২.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত অছিমদ্দিন মন্ডল	জীবনপুর	
১৭০৩.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত আঃ গফুর মন্ডল	কেশোরীপুর	
১৭০৪.	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	মৃত আজগর আলী	ইসলামপুর	
১৭০৫.	মোঃ একে এম ওবায়দুর	মৃত মস্তেজার রহমান	বড়িয়ারহাট	
১৭০৬.	শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	মৃত মনিন্দ্র নাথ সাহা	ঘাশিল্লা	
১৭০৭.	শ্রী নকুল্ল কুমার বর্মণ	মৃত নদীয়া চাঁদ বর্মণ	আলমপুর	
১৭০৮.	শ্রী অরুন কুমার বর্মণ	মৃত দেবেন্দ্র নাথ বর্মণ	আলমপুর	
১৭০৯.	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মৃত সাফি উদ্দিন	রহবল	
১৭১০.	এ এস এম আনোয়ারুল ইসলাম	মোঃ আঃ সাত্তার সরকার	রহবল	
১৭১১.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত জাহেদ আলী	বাঘশন	
১৭১২.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত ইজ্জত উল্লাহ	মুরাদপুর	
১৭১৩.	শ্রী কান্তি ভূষণ মিশ্র	মৃত ভবেশ চন্দ্র মিশ্র	ঐ	
১৭১৪.	মোঃ ফারুক আহম্মেদ	মোঃ সিরাজুল হক	শংকরপুর	
১৭১৫.	মোঃ সেলিম উদ্দিন	মৃত হবিবর রহমান	মহাস্থান	
১৭১৬.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মৃত ইশারাতুল্যা আকন্দ	সেকেন্দাবাদ	
১৭১৭.	মোঃ তোজাম্মেল হোসেন	মৃত নাছির উদ্দিন	ঐ	
১৭১৮.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত খোদা বক্স	পূর্ব সৈয়দপুর	
১৭১৯.	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত আব্দুর রশিদ মন্ডল	অতিরামপুর	
১৭২০.	ডাঃ মোঃ সারোয়ার হোসেন	মৃত আসির উদ্দিন	শংকরপুর	
১৭২১.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত আলিম উদ্দিন প্রাং	মহাস্থান	
১৭২২.	মোঃ আবুল কালাম প্রাং	মৃত কাজেম উদ্দিন	ঐ	
১৭২৩.	মোঃ ফজলুল হক	মৃত শুকুর আলী	ঐ	
১৭২৪.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত ওসমান আলী সরদার	পলিগাথী	
১৭২৫.	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত আসাদ আলী	কেল্লুজ্ঞ	
১৭২৬.	মোঃ আব্দুল খলিল আকন্দ	মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন	শনতালকী	
১৭২৭.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত বাহার উদ্দিন	জীবনপুর	
১৭২৮.	শ্রী শ্যামল চন্দ্র দাস	মৃত প্রফুল্ল চন্দ্র দাস (খগেন্দ্র)	পাকুরিয়া	
১৭২৯.	মোঃ মোজাফফর হোসেন	মৃত আলহাজ রহমতুল্লাহ	সোনাদেউল	
১৭৩০.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত বাছির উদ্দিন মন্ডল	চককানু	
১৭৩১.	শ্রী জিতেন্দ্র নাথ দাস	মৃত শ্রী রমেশ চন্দ্র দাস	সংসারদিঘী	
১৭৩২.	মোঃ ছোলাইমান আলী	মৃত সুজাত আলী	দহিদা	
১৭৩৩.	মোঃ শাহজাহান কবির (বাদশা)	মোঃ আলহাজ নাছির উদ্দিন	বানাইল	
১৭৩৪.	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত আছির উদ্দিন	বিহারহাট	
১৭৩৫.	মোঃ হাবিবুর রহমান খান	মৃত নাদির উদ্দিন খান	বিহার	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৭৩৬.	মোঃ আঃ সোবহান	মৃত গফুল ফকির	রামকৃষ্ণপুর	
১৭৩৭.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মফিজ উদ্দিন	ফোকপাল	
১৭৩৮.	মোঃ কবির উদ্দিন মন্ডল	মৃত কাবিল উদ্দিন	ত্তরাতাদিঘী	
১৭৩৯.	মৃত নাছির উদ্দিন প্রাং	মৃত কাদের আলী প্রাং	তরতেতুলিয়া	
১৭৪০.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত আয়েন উদ্দিন	তেঘরা	
১৭৪১.	মোঃ ইয়াকুব আলী চৌধুরী	মৃত রফাতুল্লা চৌধুরী	ভাগশিমলা	
১৭৪২.	মোঃ আলী আজগর	মৃত নাছির উদ্দিন	গুলিয়া	
১৭৪৩.	আঃ হাকিম	মৃত ডাঃ হোসেন আলী	নন্দীগ্রাম	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৭৪৪.	মোঃ আঃ রহমান	মৃত ময়েজ উদ্দিন	রায়পাড়া	
১৭৪৫.	মোঃ আনছার আলী	মৃত আফছার আলী	ফুলহলী	
১৭৪৬.	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত ইসমাইল শাহ	ভবতেতুলিয়া	
১৭৪৭.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত সাহেব উদ্দিন	রায়পাড়া	
১৭৪৮.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত আছির উদ্দিন মন্ডল	বিজরুল	
১৭৪৯.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত কাজেম উদ্দিন	কাথম	
১৭৫০.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত এজাতুল্লা প্রাং	নন্দীগ্রাম	
১৭৫১.	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মৃত রতন উল্লা প্রাং	নন্দীগ্রাম	
১৭৫২.	মোঃ মেহের আলী	মৃত এম হাকিম উদ্দিন	তৈয়বপুর	
১৭৫৩.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত ডাক্তার হযরা প্রাং	নন্দীগ্রাম	
১৭৫৪.	মোঃ মোমতাজুর রহমান মনতান	মৃত অছিমুদ্দিন আকন্দ	ভাটরা	
১৭৫৫.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত মোকছেদ আলী প্রাং	ঐ	
১৭৫৬.	মোঃ মজুর রহমান	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	ঐ	
১৭৫৭.	আঃ রশিদ	মৃত জসিম উদ্দিন আহমেদ	হাটকড়ই	
১৭৫৮.	মোঃ মফিজুর রহমান	মৃত ময়েজ উদ্দিন মন্ত	নুরারানিধী	
১৭৫৯.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত মোঃ সোনাউল্লা প্রাং	দমদমা	
১৭৬০.	কেএম মোকছেদ আলী	মৃত হাজী মফিজ উদ্দিন	বৈলগ্রাম	
১৭৬১.	মোঃ শহীদুল আলম দুদু	মৃত ডাঃ আশরাফ আলী আহম্মেদ	চৌদিঘী	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৭৬২.	মোঃ নুরুন্নবী	হাবিবুর রহমান	জগন্নাথপাড়া	
১৭৬৩.	মোঃ আব্দুল বারী	জমির উদ্দিন	চকধলী	
১৭৬৪.	মোঃ আব্দুল হামিদ	দলিল উদ্দিন	ঐ	
১৭৬৫.	মোঃ মতিউর রহমান	মমতাজ আলী	সুঘাট	
১৭৬৬.	কেএম দেলোয়ার হোসেন	ফজলুর রহমান	বড়াইদহ	
১৭৬৭.	শাহজাহান আলী	শামসুল হক	ঘাড়ইদহ	
১৭৬৮.	দলিলুর রহমান	আঃ বাছেত	খন্দকার টোলা	
১৭৬৯.	আঃ রউফ খান	বাহাদুর আলী	গুয়াগাছী	
১৭৭০.	আঃ রাজ্জাক	বাহাদুর আলী	ঐ	
১৭৭১.	মওলা বক্স সরকার	শাহবাজউদ্দিন	হাতিয়ালী	
১৭৭২.	আবদুস সবুর	নছের আলী	জামনগর	
১৭৭৩.	হাফিজুর রহমান	মালেকউদ্দিন	সুঘাট	
১৭৭৪.	তোফাজ্জল হোসেন	জহির উদ্দিন	মামনপুর	
১৭৭৫.	নরোত্তম সরকার	নগেন্দ্রনাথ	চাঁদপুর	
১৭৭৬.	রফিকুল ইসলাম	আব্দুল গফুর	খন্দকারটোলা	
১৭৭৭.	ইউসুফ উদ্দিন	আয়েজউদ্দিন	মির্জাপুর	
১৭৭৮.	মৃত হাবিবুর রহমান	আছের উদ্দিন	খাগা	
১৭৭৯.	রবীন্দ্রনাথ সরকার	নবদ্বীপ	কুসুম্বী	
১৭৮০.	এম এ হান্নান	এম এ বাদে	আফরাতগাড়ী	
১৭৮১.	সুরেন্দ্র চন্দ্র সিং	চরণ সিং	গোড়তা	
১৭৮২.	আঃ খালেক	আবুল হাসেম	বড়ইদহ	
১৭৮৩.	আঃ মালেক	আবুল হাসেম	ঐ	
১৭৮৪.	আবু জাফর	হাছেন আলী	রামনগর	
১৭৮৫.	আইয়ুব হোসেন	দেদু শেখ	দাড়িপাড়া	
১৭৮৬.	আঃ ছাত্তার	আঃ রহমান	গাড়ীদহ	
১৭৮৭.	ওবায়দুর রহমান	আছিম উদ্দিন	বলতাপাড়া	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৭৮৮.	সিরাজুল ইসলাম	হজরত আলী	মমিনপুর	
১৭৮৯.	নদনত চন্দ্র পাল	হরিবন্ধু পাল	কল্যাসী	
১৭৯০.	আকরাম হোসেন খান	খিজির উদ্দিন খান	জয়লাজুয়ান	
১৭৯১.	আবু ছাইদ সরকার	এরফান আলী	চকধলী	
১৭৯২.	আবদুল বারী	আবদুর রশীদ	ঐ	
১৭৯৩.	মোহাম্মদ আলী	ছবের উদ্দিন	ঐ	
১৭৯৪.	আঃ সোবহান	হাসান আলী	ঐ	
১৭৯৫.	মোঃ মহসীন রেজা	নাফিজউদ্দিন	ঐ	
১৭৯৬.	মোজাম্মেল হক	আফাজউদ্দিন	জয়নগর	
১৭৯৭.	রফিকুল ইসলাম	আঃ রশিদ আকন্দ	চকধলী	
১৭৯৮.	এস এম শাহজাহান আলী	পাওমোছা	জয়নগর	
১৭৯৯.	এস এম শাহাদৎ হোসেন	আলীমুদ্দিন	গুয়াগাছী	
১৮০০.	সামছউদ্দিন	আজিজার রহমান	চকধলী	
১৮০১.	আবুল কালাম	আঃ হামাদ	দলিল	
১৮০২.	আবির হোসেন	কছিমউদ্দিন	পাচদেউলী	
১৮০৩.	আফাল উদ্দিন	আমজাদ হোসেন	চুয়াপাড়া	
১৮০৪.	লেঃ নাঃ মোঃ রজব আলী	আঃ ছোবাহান	সিমলা সাতারবাড়িয়া	
১৮০৫.	পরিমল চন্দ্র	রশিক লাল	হালাগাড়ী	
১৮০৬.	সতীন্দ্র নাথ	জগন্দ্রেনাথ	বিশালপুর	
১৮০৭.	আকবর আলী	মোজাহার আলী	রয়োয়া	
১৮০৮.	কাজী ইমরুল কায়েম	নুরুল হুদা	সীমাবাড়ী	
১৮০৯.	আঃ ছাত্তার মল্লিক	শামছুল মল্লিক	সীমলা	
১৮১০.	আশরাফ উদ্দীন সরকার	সামস উদ্দীন	ধনকুন্তি	
১৮১১.	সাইদুর রহমান	রজব আলী	ইকাধুকুরিয়া	
১৮১২.	টি এম আমিনুর রহমান	কুরান উদ্দীন	সীমাবাড়ী	
১৮১৩.	কাজী মোঃ আসাদুল	কাজী নুরুল হুদা	ঐ	
১৮১৪.	ম্যারেব আলী	ফয়েজ উদ্দীন	চককেশব	
১৮১৫.	মৃত আঃ মোত্তালিব	আঃ আজিজ	ধনকুন্তি	
১৮১৬.	আজিজুল ইসলাম	আকিমুদ্দীন	সীমাবাড়ী	
১৮১৭.	ইসমাইল হোসেন	এম বি ওবায়দুর	ঐ	
১৮১৮.	নজরুল ইসলাম	আঃ জুব্বার	কালিয়াকের	
১৮১৯.	মীর বকস	মোবারক আলী	ঐ	
১৮২০.	অতুল চন্দ্র শাহা	যুধিষ্ঠির চন্দ্র	বেতগাড়ী	
১৮২১.	আবদুল বারী	বুজরক	ভাটরা	
১৮২২.	আবদুর রশিদ	আলতাফ উদ্দীন	ভীমজানি	
১৮২৩.	মকবুল হোসেন	মফিজ উদ্দীন	তালপুকুরিয়া	
১৮২৪.	মমতাজুর রহমান	শুকুর মাহমুদ	চৌবাড়িয়া	
১৮২৫.	মমতাজুর রহমান	মোজাহার আলী	খানপুর	
১৮২৬.	মমতাজুর রহমান	ভোলা মন্ডল	শামপুর দহপাড়া	
১৮২৭.	মোসলেহ উদ্দীন	আঃ জোব্বার	ভাটরা	
১৮২৮.	আব্বাছ আলী	আঃ হামাদ	খানপুর	
১৮২৯.	আজিমদ্দীন	বাহাদুর আলী	শালফা	
১৮৩০.	ছাবেদ আলী	আছনতুল্লাহ	চকখাগা	
১৮৩১.	এম এ গনি	জামাত আলী	আটরা	
১৮৩২.	খবির উদ্দিন	আয়জউদ্দীন	মির্জাপুর	
১৮৩৩.	নজরুল ইসলাম	মমতাজ উদ্দীন	ঐ	
১৮৩৪.	ফরমান আলী	নয়ীমুল্লাহ	ঘোলাগাড়ী	
১৮৩৫.	মকবুল হোসেন	তছির উদ্দিন	সাধুবাড়ী	
১৮৩৬.	মকবুল হোসেন	ছফের উদ্দীন	ভাদাইশপাড়া	
১৮৩৭.	যোগেশ চন্দ্র রায়	গনেশচন্দ্র	খামারকান্দি	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৮৩৮.	সাইফুল ইসলাম	জোব্বার আলী	পারভবানীপুর	
১৮৩৯.	সুভাস দত্ত রায়গনেশ দত্ত রায়	খামারকান্দি	ঐ	
১৮৪০.	আঃ রশীদ সরকার	কামাল উদ্দীন	ঐ	
১৮৪১.	আজিজার রহমান	ময়েজউদ্দীন	ঐ	
১৮৪২.	আবুল হোসেন	জামাল উদ্দীন	ঐ	
১৮৪৩.	নুরুল ইসলাম	জোনাব আলী	ঐ	
১৮৪৪.	সেকেন্দার আলী	গাউতা মোল্লা	ঐ	
১৮৪৫.	আবদুর রহমান সরকার	মহির উদ্দিন	ঝাঝর	
১৮৪৬.	নজরুল ইসলাম	বলাই মন্ডল	ঐ	
১৮৪৭.	মকবুল হোসেন	জবানী	সুবলী	
১৮৪৮.	রশীদুল হক	দবিরউদ্দীন	দর্পনিন্দা পাড়া	
১৮৪৯.	তমিজ উদ্দীন	জহির উদ্দীন	ভটিয়া	
১৮৫০.	এটিএম মাহবুবুর রহমান	মালেক মিঞা	ঐ	
১৮৫১.	মিজানুর রহমান	সফের উদ্দীন	গুয়াগাছী	
১৮৫২.	কেএম আমিনুল ইসলাম	হানিফ উদ্দীন	ঐ	
১৮৫৩.	আবদুর রহমান	সানাউল্লাহ	জয়নাজুয়ান	
১৮৫৪.	মোজাম্মেল হক তরফদার	পর্বত আলী	খেরুয়া	
১৮৫৫.	সিয়াজ উদ্দীন (সোহরাব)	ময়েজউদ্দীন মন্ডল	ভাদড়াস	
১৮৫৬.	আনোয়ার হোসেন	জামাল উদ্দীন	মালিহাটি	
১৮৫৭.	মোজাফফর হোসেন	মোশাররফ হোসেন	মালিহাটা	
১৮৫৮.	ঈমান আলী	ফয়েজ উদ্দীন	বাগড়া	
১৮৫৯.	আনোয়ার হোসেন	রিয়াজ উদ্দীন	রনবীর বাল	
১৮৬০.	তরুণী কান্ত বারর্ত্তী	বনবিহারী বারর্ত্তী	ঘোসপাড়া	
১৮৬১.	বিল্লাহ বকুল	আবুল হোসেন	জগন্নাথপাড়া	
১৮৬২.	মৃত শাহজাহান আলী	ফরজ আলী	খন্দকার পাড়া	
১৮৬৩.	মজিবর রহমান	মশমতুল্লাহ	তালপুর	
১৮৬৪.	আবদুল গনি	কাওছার আলী	বারদয়ারীপড়া	
১৮৬৫.	আবদুল আজিজ	জকের আলী মন্সী	হাজিপুর	
১৮৬৬.	মোখলেছার রহমান	ওয়াহেদ ভূইয়া	জয়নাজুয়ান	
১৮৬৭.	আল ইরাকী	আঃ গফুর আকন্দ	মুন্সীপাড়া	
১৮৬৮.	মৃত আবদুস ছাত্তার	রহিম বক্স	বিনোদপুর	
১৮৬৯.	নিমাই চন্দ্র ঘোষ	মৃত ব্রজগোপাল ঘোষ	ঘোষপাড়া	
১৮৭০.	মোঃ ছিদ্দিক হোসেন	মৃত সাদেকুল সরদার	সরদার পাড়া	
১৮৭১.	মৃত আঃ রাজ্জাক ভুইয়া	মৃত আফজাল হোসেন ভুইয়া	রামচন্দ্রপুর	
১৮৭২.	ইয়ার মোহম্মদ	মৃত রেজ্জাক আলী	ধড়মেকাম	
১৮৭৩.	মোঃ আঃ আজিজ	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	শাতিবাড়ী	
১৮৭৪.	নিতাই চন্দ্র	মৃত রশিক লাল	উত্তর পেচুল	
১৮৭৫.	মোঃ জাফর উল্লাহ খান	মৃত খিদির উদ্দিন খান	জয়নাজুয়ান	
১৮৭৬.	মৃত আবুল হোসেন	মৃত আজিমুদ্দিন	ধওয়াপাড়া	
১৮৭৭.	মৃত নুর মোহাম্মদ	মৃত নওশের আলী	ভবানীপুর	
১৮৭৮.	মোঃ রমজান আলী	মৃত হোসেন আলী	চকনসীর	
১৮৭৯.	এ এইচ এম আনিছুর রহমান	ডাঃ মৃত আজিজুল হক	সরদারপাড়া	
১৮৮০.	শাহ মোঃ শায়খুল বারী	মৃত শাহ আঃ বারী	মুন্সী পাড়া	
১৮৮১.	শেখ বাদশা মিঞা	মৃত আফিল উদ্দিন	রামচন্দ্রপুর	
১৮৮২.	মোঃ আফছার আলী	মৃত তছির উদ্দিন	কচুয়াপাড়া	
১৮৮৩.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত মালেক উদ্দিন	জামজানি	
১৮৮৪.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত ফজেল মন্ডল	খানপুর	
১৮৮৫.	মোঃ আনার আলী	মৃত ইসমাইল হোসেন	বড়মন্ডল	
১৮৮৬.	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত ওমর আলী	বিরইল	
১৮৮৭.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত মোজাহার আলী	দুবলাগাড়ী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৮৮৮.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আজিমুদ্দিন	ফুলজোড়	
১৮৮৯.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত জাবেদ আলী	জোড়গাছা	
১৮৯০.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত ছবেদ আলী	সুঘাট	
১৮৯১.	মোঃ হযরত আলী	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	ফুলজোড়	
১৮৯২.	মোঃ আফছার আলী	মৃত আনোয়ার হোসেন	দুবলায়	
১৮৯৩.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত আঃ আজিজ	বিলসোখার	
১৮৯৪.	মোঃ আব্দুল হামিদ	মৃত হবিবর রহমান	পারভবানীপুর	
১৮৯৫.	মোঃ খয়রাত আলী	মৃত রমজান আলী	ঐ	
১৮৯৬.	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	মৃত ময়েজ উদ্দিন	তালয়া	
১৮৯৭.	মোঃ জাফর হোসেন	মৃত হাসান প্রাং	গাড়ীদহ	
১৮৯৮.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত আব্বাস আলী	মদনপুর	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৮৯৯.	মোঃ আব্দুর রশিদ প্রাং	মোঃ নবীর উদ্দিন প্রাং	দুর্গাগাড়ী, মুরইল	
১৯০০.	মৃত আব্দুল হাই সরকার	মৃত জানাত উল্যা সরদার	বরঙ্গাশনি, পাইকড়	
১৯০১.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত তালেব উদ্দিন	চাঁদপুর, দুর্গাপুর	
১৯০২.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত মহির উদ্দিন	উলট্ট, কাহালু	
১৯০৩.	মোঃ আঃ লতিফ মন্ডল	মৃত আলহাজ্ব মজরতুল্লাহ	দুর্গাগাড়ী, মুরইল	
১৯০৪.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মৃত ইব্রাহীম আলী সরকার	কল্যাণপুর, নারহট্ট	
১৯০৫.	মোঃ আবুল হোসেন (বি.এ)	মৃত জসিম উদ্দিন মৃর্ধা	ঐ	
১৯০৬.	মোঃ মোশারফ হোসেন	ছলেমান আলী মীর	কৃষ্ণপুর, জামগ্রাম	
১৯০৭.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত কিসমতুল্লাহ	পাল্লাপাড়া, কাহালু	
১৯০৮.	মোঃ খয়বর রহমান	মৃত ছালেম আলী প্রাং	কাহালু	
১৯০৯.	মৃত ওমর আলী	আলহাজ্ব সৈয়দ আলী প্রাং	মহারাবাণী	
১৯১০.	অধ্যক্ষ হোসেন আলী	মৃত গাজীউর রহমান প্রাং	মহারাবাণী	
১৯১১.	শ্রী বিজয় চন্দ্র সরকার	মৃত প্রভাত চন্দ্র সরকার	শিবা কলমা	
১৯১২.	মোঃ মুনছুর রহমান	মৃত তছির উদ্দিন	বানিয়াপাড়া	
১৯১৩.	মোঃ ইউসুফ আলী	মৃত ছালামতুল্লাহ প্রাং	কাহালু	
১৯১৪.	মোঃ তমিজ উদ্দিন	মৃত সরাফতুল্লাহ	হায়লতা	
১৯১৫.	মোঃ আসাদ আলী	মৃত মহির উদ্দিন	পাতাঞ্জ	
১৯১৬.	মোঃ খয়বর আলী মিয়া	মৌঃ আহম্মদ আলী	নারহট্ট	
১৯১৭.	মোঃ তমিজ উদ্দিন শেখ	মৃত ইব্রাহিম শেখ	ঐ	
১৯১৮.	মোঃ আব্দুল হামিদ প্রাং	মৃত ববিয়া প্রাং	উলট্ট	
১৯১৯.	মোঃ লিয়াকত আলী সরদার	মৃত ইব্রাহিম আলী সরদার	কাহালু	
১৯২০.	মৃত আবুল কাশেম সরদার	মৃত রজিবর রহমান সরদার	নারহট্ট	
১৯২১.	মোঃ আফতাব হোসেন প্রাং	মৃত ছায়েত আলী প্রাং	পুইয়াগাড়ী	
১৯২২.	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত আঃ গনি	কাহালু	
১৯২৩.	মওলা বক্স সরকার	শাহাবউদ্দিন	ছাতিয়ানী	
১৯২৪.	আবদুস সবুর	মছের আলী	জামনগর	
১৯২৫.	হাফিজুর রহমান	খালেকউদ্দিন	সুঘাট	
১৯২৬.	তোফাজ্জল হোসেন	জহির উদ্দিন	মমিনপুর	
১৯২৭.	নরোত্তম সরকার	নগেন্দ্রনাথ	চাঁদপুর	
১৯২৮.	রফিকুল ইসলাম	আব্দুল গফুর	খন্দকারটোলা	
১৯২৯.	ইউসুফ উদ্দিন	আয়েজউদ্দিন	মির্জাপুর	
১৯৩০.	মৃত হাবিবুর রহমান	আছের উদ্দিন	খাগা	
১৯৩১.	রবীন্দ্রনাথ সরকার	নবদ্বীপ	মুসুন্দী	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৯৩২.	এম এ হান্নান	এম এ বাসে	আফরাতগাড়ী	
১৯৩৩.	সুরেন্দ্র চন্দ্র সিং	চরণ সিং	গোড়তা	
১৯৩৪.	আঃ খালেক	আবুল হাসেম	বড়ইদহ	
১৯৩৫.	আঃ মালেক	আবুল হাসেম	ঐ	
১৯৩৬.	আবু জাফর	হাছেন আলী	রামনগর	
১৯৩৭.	আইয়ুব হোসেন	দেলু শেখ	দড়িপাড়া	
১৯৩৮.	আঃ ছাত্তার	আঃ রহমান	গাড়ীদহ	
১৯৩৯.	ওবায়দুর রহমান	অছিম উদ্দিন	ফলতাপাড়া	
১৯৪০.	মমতাজুর রহমান	ভোলা মন্ডল	শ্যামপুর দহপাড়া	
১৯৪১.	মোসলেহ উদ্দীন	আঃ জোব্বার	জাটিরা	
১৯৪২.	আব্বাছ আলী	আঃ ছামাদ	খানপুর	
১৯৪৩.	মোঃ মফিজ উদ্দিন মন্ডল	মৃত হাসমত আলী মন্ডল	দায়হস্ত	
১৯৪৪.	মোঃ তৈয়ব আলী ফকির	মৃত মিয়াজান আলী ফকির	চাকদহ	
১৯৪৫.	শ্রী অমূল্য চন্দ্র শীল	মৃত শ্রী চিত্তনাথ শীল	দুর্গাপুর	
১৯৪৬.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত অছিম উদ্দিন	পুণইল	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৯৪৭.	মোঃ মুনসুর রহমান	মৃত আবেদ আলী	ইসলামপুর	
১৯৪৮.	মোঃ কোরবান আলী সেখ	মৃত বাদশা সেখ	লালুফা	
১৯৪৯.	মোঃ আঃ মালিক খান	মৃত এরফান আলী খান	তালোড়া	
১৯৫০.	শ্রী তারাপদ সরকার	মৃত চন্দ্র কান্ত সরকার	স্বরস্বাবাড়ী	
১৯৫১.	মোঃ মোফলেছার রহমান	মৃত সমতুল্যা প্রাং	ঐ	
১৯৫২.	মৃত ছৈয়দ বদরুল আলম	মৃত শামছুর রহমান	ঐ	
১৯৫৩.	মোঃ আঃ করিম সরকার	মৃত তয়েজ উদ্দিন সরকার	মোড়গ্রাম	
১৯৫৪.	মোঃ রোস্তম আলী প্রাং	মৃত ইয়ার আলী প্রাং	ঐ	
১৯৫৫.	মোঃ মোকসেদ আলী প্রং	মৃত আসাব আলী প্রাং	ঐ	
১৯৫৬.	মোঃ শামছুল হক মন্ডল	মৃত মোঃ আফাজ উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
১৯৫৭.	মোঃ রহিমুদ্দিন	মৃত আলি মুদ্দিন	চান্দাইল	
১৯৫৮.	মোঃ আজাহার আলী ফকির	মোঃ সিরাজ আলী ফকির	ঐ	
১৯৫৯.	মোঃ ইজার উদ্দিন প্রাং	মৃত জসিম উদ্দিন প্রাং	ঐ	
১৯৬০.	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত খয়বর আলী ফকির	ঐ	
১৯৬১.	মোঃ আইয়ুব আলী সরদার		সর্জ্জনকুড়ী	
১৯৬২.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত আবু তালেব প্রাং	ভুইপুর	
১৯৬৩.	মোঃ জয়েন উদ্দীন	কায়েব উদ্দীন মোল্যা	সেরপুর	
১৯৬৪.	এফ. এম আফতাব উদ্দীন	মৃত আব্বাছ আলী ফকির	সেরপুর	
১৯৬৫.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত রমজান আলী	শ্রীপুর	
১৯৬৬.	মোঃ আঃ বাছেদ সরকার	মৃত জালাল উদ্দীন সরকার	ঐ	
১৯৬৭.	মোঃ আরেশ আলী	মৃত রমজান আলী	ভুইপুর	
১৯৬৮.	মোঃ আছাব আলী	মৃত হাবিল সরদার	মাজিন্দা	
১৯৬৯.	মোঃ নিজাম উদ্দীন	মৃত কিসমত আলী আকন্দ	মাজিন্দা	
১৯৭০.	মোঃ আঃ মালেক সরকার	মৃত আবুল হোসেন সরকার	শ্রীপুর	
১৯৭১.	মোঃ লোকমান আলী	মোঃময়েজ উদ্দীন	আমঝুপি	
১৯৭২.	মোঃ আতাবুর রহমান	মৃত মনির উদ্দীন	জারই	
১৯৭৩.	মোঃ বাশেদ আলী	মৃত শুকচান প্রাং	সিংড়াভাটাহার	
১৯৭৪.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত আককাছ আলী	উনাহত সিংড়া	
১৯৭৫.	মোঃ আক্কাছ আলী	মৃত আছিম উদ্দীন মন্ডল	সিংগা	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
১৯৭৬.	মোঃ মোজাম্মেল হক ফকির	মৃতময়েন উদ্দীন ফকির	পুকুর গাছা	
১৯৭৭.	মোঃ আবু কালাম প্রাং	হাজী মফিজ উদ্দীন	দশড়া	
১৯৭৮.	মোঃ আতাউর রহমান প্রাং	মৃত মজিবর রহমান	বড়নিলাহালী	
১৯৭৯.	মোঃ আনছার আলী মন্ডল	মৃত মহসীন আলী	জায়ই	
১৯৮০.	মোঃ আফছার আলী	মৃত কাজেম উদ্দীন	ভানুচহাট	
১৯৮১.	মৃত আঃ রাজ্জাক প্রাং	মৃত রোস্তম আলী	ভানুচহাট	
১৯৮২.	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত বাছির উদ্দীন প্রাং	সিংগা	
১৯৮৩.	মোঃ আছির উদ্দীন ফকির	মৃত জোব্বার ফকির	তালুকা	
১৯৮৪.	মোঃ কেরামত আলী	মৃত মগল প্রাং	সিংড়াভাটাহারা	
১৯৮৫.	মোঃ মোকলেছার রহমান	মৃত তালেব উদ্দিন তাং	সংড়া	
১৯৮৬.	মোঃ বদিউজ্জামান মন্ডল	মৃত সাহেব আলী মন্ডল	তালুকা	
১৯৮৭.	শ্রী লক্ষণ চন্দ্র বর্মণ	মৃত রসিক চন্দ্র	সুর্যাতা	
১৯৮৮.	মোঃ আজিমদ্দীন ফকির	মৃত মিয়াজ আলী	বেলহাটি	
১৯৮৯.	মোঃ আজিজার রহমান	মোঃ কায়েম উদ্দিন	ঐ	
১৯৯০.	মোঃ কছিম উদ্দীন	মৃত মজিবর আলী সাহা	সোহাগীপাড়া	
১৯৯১.	মোঃ কছিম উদ্দীন সোনার	মৃত আজগার আলী সোনার	সোনারপাড়া	
১৯৯২.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত আফজেল আলী	তেবড়া	
১৯৯৩.	মোঃ মজিবর রহমান প্রাং	মোঃ মেছের আলী	ছোটনিলাহালী	
১৯৯৪.	মোঃ আজাদ হোসেন	মৃত আবুল হোসেন সাকিদার	বাড়িয়া	
১৯৯৫.	মোঃ আঃ মোত্তালেব	মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা	ঐ	
১৯৯৬.	মোঃ তামিজ উদ্দীন	মোঃ ইছমত আলী সেখ	সোহাগীপাড়া	
১৯৯৭.	মোঃ তছের উদ্দীন মন্ডল	মৃত ইসমাইল হোসেন	তেবড়া	
১৯৯৮.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মহর আলী ফকির	ঐ	
১৯৯৯.	মোঃ ছামছুদ্দিন প্রাং	মেছের আলী	ঐ	
২০০০.	মোঃ আফজাল হোসেন প্রাং	মোঃ জোব্বার প্রাং	ঐ	
২০০১.	মোঃ মোজাহার হোসেন	মৃত এনায়েত আলী সাহ	পোড়াপাড়া	
২০০২.	মোঃ সেকিন্দার আলী	মৃত মোহসিন আলী প্রাং	ছোটনিলাহালী	
২০০৩.	মোঃ ছামছুদ্দিন প্রাং	মোঃ ওছমান আলী প্রাং	জিয়ানগর	
২০০৪.	মোঃ নিজাম উদ্দীন আহম্মেদ	মৃত ইশারত আলী সেখ	সোহাগীপাড়া	
২০০৫.	মোঃ আঃ ছাত্তার	মৃত কছিম উদ্দিন	খলিশ্বর	
২০০৬.	মোঃ আয়েজ উদ্দীন	মৃত কিনা প্রাং	ঐ	
২০০৭.	মোঃ ইনছাফ আলী খান	মৃত আশরাফ আলী খান	চকশোগরপুর	
২০০৮.	মোঃ ওসমান আলী	মোঃ খোয়াজ আলী	সেবখন্ত	
২০০৯.	শেখ বাদশা মিঞা	মৃত আকিল উদ্দিন	রামচন্দ্রপুর	
২০১০.	মোঃ আফছার আলী	মৃত তছির উদ্দিন	কচুয়াপাড়া	
২০১১.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত মালেক উদ্দিন	তামজানি	
২০১২.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত ফজেল মন্ডল	খানপুর	
২০১৩.	মোঃ আনার আলী	মৃত ইসমাইল হোসেন	ঘড়মকাম	
২০১৪.	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত ওমর আলী	বিরইল	
২০১৫.	মোঃ তোজাম্মেল হক	মৃত মোজাহার আলী	নুখলাগাড়ী	
২০১৬.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আজিমুদ্দিন	ফুলজোড়	
২০১৭.	মোঃ সুজ্জাত আলী	মৃত সোলায়মান আলী	মোস্তফাপুর	
২০১৮.	মোঃ হাছেন আলী	মৃত মফিজ উদ্দিন	মোস্তফাপুর	
২০১৯.	মৃত আবুল মোমেন	মৃত আছির উদ্দিন	ঐ	
২০২০.	মৃত হারুন অর রশিদ	মৃত মোজাম্মেল হোসেন	বেফস্ত	
২০২১.	আঃ সামাদ	মোঃ ইমান আলী	বাশড়া	
২০২২.	মোঃ আমির আলী প্রাং	মৃত ছদের আলী	তাতহান্দা	
২০২৩.	মোঃ আঃ মজিদ	মোঃ মহসিন আলী	সিংগা গুনাহার	
২০২৪.	মৃত গফুর আহম্মেদ	মৃত কলিম উদ্দীন	সিংগা	
২০২৫.	মোঃ জহির উদ্দীন	মৃত আয়েজ উদ্দীন	ঐ	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২০২৬.	আঃ হক মন্ডল	মৃত হাফিজার রহমান	ঐ	
২০২৭.	মো আলি আকবর	মৃত আহম্মদ আলী	অর্জনগাড়ী	
২০২৮.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত হাজী আহম্মদ আলী	ঐ	
২০২৯.	শ্রী জগবন্ধু বর্মন	মৃত জোগেন্দ্র বর্মন	গোতভা	
২০৩০.	মোঃ আজিজার রহমান	মোঃ কায়মুদ্দিন	মেড়াই	
২০৩১.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত মহসিন আলী	ঐ	
২০৩২.	আবু মুসা	মৃত জহির উদ্দীন	চান্দাইল	
২০৩৩.	মাহবুবার রহমান	মৃত মতিয়ার রহমান	দুপচাঁচিয়া	
২০৩৪.	শ্রী অধির চন্দ্র চক্রবর্তী	শ্রী রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী	ঐ	
২০৩৫.	মোঃ আবুল খায়ের	মৃত ইসমাইল হোসেন	ঐ	
২০৩৬.	মজিবর রহমান	মৃত করমত আলী	গোবিন্দপুর	
২০৩৭.	মৃত আঃ গনি মন্ডল	মৃত আকবর আলী	মোড়গ্রাম	
২০৩৮.	মৃত বসারতআলী	মৃত মিরাজ প্রাং	মাজিন্দা	
২০৩৯.	মোঃ আঃ হামিদ খন্দকার	মৃত ছবেদ আলী	আমস্টু	
২০৪০.	মোঃ আঃ জলিল	মৃত জমির উদ্দীন	ভুইপুর	
২০৪১.	মৃত জলিলুর রহমান	মৃত কমর উদ্দীন	মোড়গ্রাম	
২০৪২.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত ফজলুল করিম	গোবিন্দপুর	
২০৪৩.	শহীদ নিজম উদ্দীন	মৃত হানিফ উদ্দীন	ঐ	
২০৪৪.	শহীদ সাহাদত হোসেন	মৃত লায়েব আলী	গালিমহেশপুর	
২০৪৫.	শহীদ মকবুল হোসেন	মৃত গমিন উদ্দীন	ঐ	
২০৪৬.	মোঃ খাজামুদ্দিন	মৃত গাজী মন্ডল	খাঁড়িয়া	
২০৪৭.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত ছবেত আলী	খলিশ্বর	
২০৪৮.	শ্রী যতীন্দ্র নাথ	মৃত ফুলমালী সরকার	জিয়ানগর	
২০৪৯.	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত বাছির হোসেন	পোড়াপাড়া	
২০৫০.	মোঃ নওজেশ আলী	মোঃ রহিম উদ্দিন	জিয়ানগর	
২০৫১.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত নফিজ উদ্দীন	ছোট নিলাহালী	
২০৫২.	মৃত ছোলায়মান আলী প্রাং	মৃত মিরাজ প্রাং	ঐ	
২০৫৩.	মোঃ সেকিন্দার সাকিদার	মোঃ কবির উদ্দীন	খলিশ্বর	
২০৫৪.	মোঃ মোজাহার হোসেন	মৃত মফিজ উদ্দীন	ঐ	
২০৫৫.	মোঃ মোকলেছার রহমান	মৃত এনায়েত আলী	পোড়াপাড়া	
২০৫৬.	মোঃ আনছার আলী প্রাং	মোঃ এবারত আলী	ছোট নিলাহালী	
২০৫৭.	মোঃ হাবিবুর রশিদ	মৃত সৈয়দ তৈয়বর রহমান	খলিশ্বর	
২০৫৮.	মোঃ সোলায়মান আলী	মৃত হুরমতুল্যাহ মন্ডল	বাগাহী	
২০৫৯.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মাহমুদ আলী	মাজিন্দা	
২০৬০.	মোঃ আমীর আলী	মৃত সাহেব আলী	মোড়গ্রাম	
২০৬১.	এবিএম তাহেরুজ্জামান	মৃত আজিমউদ্দিন প্রাং	বড়নিলাহালী	
২০৬২.	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	মৃত ওয়াহেদ আলী তালুকদার	চামরুল	
২০৬৩.	মোঃ আক্কাছ আলী সরদার	মৃত আছর উদ্দীন সরদার	সুবরা	
২০৬৪.	মোঃ বেলাল হোসেন	মৃত ইউনুছ আলী আকন্দ	দুপচাঁচিয়া	
২০৬৫.	মোঃ তমজেদ আলী	মৃত দসরতুল্লা	তালোহার	
২০৬৬.	মোঃ আফছার আলী	মৃত হয় আকন্দ	মাস্টারপাড়া	
২০৬৭.	মোঃ নূরল আমীন খান	মজিবর রহমান	কুন্দহর	
২০৬৮.	মোঃ আবু হেলাল খন্দকার	কাজেম আলী	ঐ	
২০৬৯.	আয়েজ উদ্দিন	রমজান আলী	বালুকাপাড়া	
২০৭০.	মোঃ বাচ্চু আলী কবিরাজ	মৃত রইচ উদ্দিন কবিরাজ	অর্জুনগাড়ী	
২০৭১.	মরহুম হাছান আলী তালুকদার	মৃত হাজী হযরত উল্লাহ তাঃ	বড়নিলাহালী	
২০৭২.	মোঃ আনছার আলী	মৃত রজিব উদ্দিন	মথুরাপুর	
২০৭৩.	আলতাফ আলী	মৃত বছির উদ্দিন	আমকুপী	
২০৭৪.	মোঃ ইসরাফিল হোসেন	মৃত ইসমাইর হোসেন	নেঘা	
২০৭৫.	ময়েজ উদ্দিন	মৃত আজিম উদ্দিন	মহিষমুন্ডা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২০৭৬.	আয়েন উদ্দিন	মৃত হুবের উদ্দিন	কোচপুকুরিয়া	
২০৭৭.	আমান উল্লাহ	মৃত সোয়ায়েব আব্দুল্লাহ	আওন্তা	
২০৭৮.	মোঃ হযরত আলী	মৃত লজাবত আলী	পাঁচথিতা	
২০৭৯.	মোঃ আব্দুর রশিদ মন্ডল	মৃত মনির উদ্দিন	দেবখণ্ড	
২০৮০.	মোঃ আবুল হোসেন আকন্দ	মৃত কাশেম আলী	বাঁশপাতা	
২০৮১.	এটিএম আমিনুল হক	আলহাজু নুরুল হুদা	গাড়ীবেলঘরিয়া	
২০৮২.	মোঃ মকবুল হোসেন	নয়েজ উদ্দিন মৃধা	দেবখণ্ড	
২০৮৩.	মোঃ হাছেন আলী	মৃত তাবিবর রহমান	তালোড়া	
২০৮৪.	মোহাম্মদ আলী	মৃত মবারক আলী	দেবখণ্ড	
২০৮৫.	মোঃ আহসান উল্যাহ	মৃত বদের উদ্দীন আকন্দ	গাড়ীবেলঘরিয়া	
২০৮৬.	মোঃ ইয়াকুব আলী	মৃত কছির উদ্দিন	রসুলপুর	
২০৮৭.	মোঃ ফসিউল আলম খান	মৃত আলমগীর হোসেন খান	দুপচাঁচিয়া	
২০৮৮.	কে কে এম মোজাহারুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল মালেক আকন্দ	গাড়ী বেলঘরিয়া	
২০৮৯.	মৃত মোসলেম উদ্দিন	মৃত গমির উদ্দিন	শেরপুর	
২০৯০.	মৃত হাতেম আলী	কান্দুর প্রাং	ভুইপুর	
২০৯১.	মতিয়ার রহমান	মৃত মহিউদ্দিন	বড়নিলাহালী	
২০৯২.	মোঃ তয়েজ উদ্দিন	মৃত জাবেদ আলী	ডাকাহার	
২০৯৩.	মোঃ আবেদ আলী	হাজী করমতুল্যা প্রাং	ডাকাহার	
২০৯৪.	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	কছির উদ্দিন	সোহাগীপাড়া	
২০৯৫.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত আবু শরীফ	তালোড়া	
২০৯৬.	মোঃ মাজেদুর রহমান	মৃত আনছার আলী	কেউত	

মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা
উপজেলা : আদমদিঘি, জেলা : বগুড়া, বিভাগ : রাজশাহী

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২০৯৭.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত ফয়েজ উদ্দিন	নশরৎপুর	
২০৯৮.	মোঃ মজিদ সাকিদার	মৃত ইব্রাহীম সাকিদার	শিহালী	
২০৯৯.	মোঃ আমজাদ হোসনে	মৃত ইয়াদুল্যা	ডুমরীগ্রাম	
২১০০.	মোঃ আকবর সরদার	মৃত বুদিয়া সরদার	শাওইল	
২১০১.	মোঃ আইয়ুব আলী	মৃত খয়াজ আলী	ধনতলা	
২১০২.	নুর মোহাম্মদ	মৃত বছির উদ্দিন	দত্তবাড়িয়া	
২১০৩.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত ছায়েদ আলী	ঐ	
২১০৪.	মোঃ আঃ সাত্তার আকন্দ	মৃত ছদে আলী	ঐ	
২১০৫.	মোঃ আঃ রহমান	মৃত গহের আলী	কোচগুড়ি	
২১০৬.	মোঃ আলাউদ্দিন আলী	মৃত সাহেব আলী	শিহালী	
২১০৭.	মোঃ আকবর হোসেন	মৃত আলীমুদ্দিন	ঐ	
২১০৮.	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত জহির উদ্দিন	ঐ	
২১০৯.	মোঃ তছলিম উদ্দিন	মৃত কছির উদ্দিন	ঐ	
২১১০.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত তাহির উদ্দিন	পূর্বতালম্ব	
২১১১.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত মহির উদ্দিন	ঐ	
২১১২.	মো আঃ হাই	মৃত তবিয় উদ্দিন	দেলুঞ্জ	
২১১৩.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত মেহের উদ্দিন	শিহালী	
২১১৪.	মোঃ আব্বাস আলী	মৃত আব্বাস আলী	ঐ	
২১১৫.	মোঃ আজিজুর রহমান	মৃত আক্কাস আলী	লক্ষীপুর	
২১১৬.	মোঃ মিয়াকান আলী	মৃত মনসর আলী	অন্তাহার	
২১১৭.	মোঃ ছহিমুদ্দিন	মৃত মনজিলা	দুর্গাপুর	
২১১৮.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত সুজাখান	ছাতিয়ান গ্রাম	
২১১৯.	মোঃ হাসানুজ্জামান	মৃত বাবর আলী	বড় আখিরা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২১২০.	মোঃ সায়েব আলী	মৃত তমিজ উদ্দিন	অন্তাহার	
২১২১.	শ্রী পরমেশ্বর মন্ডল	মৃত পৌরিবাগ মন্ডল	বড় আখিরা	
২১২২.	মোঃ নুর মোহাম্মদ	মৃত ওমর আলী	পঃ সিংড়া	
২১২৩.	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত জসিম উদ্দিন	গলাশি	
২১২৪.	মোঃ আজিজুল হক	মৃত জসীম উদ্দিন	দুর্গাপুর	
২১২৫.	মোঃ মোজাফফর হোসেন	মৃত নায়েব আলী	ছাতিয়ানগ্রাম	
২১২৬.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত কছির উদ্দিন	পঃ সিংড়া	
২১২৭.	মোঃ ওয়ারেছ আলী	মৃত ইনার উদ্দিন	শালগ্রাম	
২১২৮.	মোঃ হামেদ আলী মন্ডল	মৃত আমির আলী মন্ডল	ফেলমারপুর	
২১২৯.	মোঃ মাহাতাব মন্ডল	মৃত বাহির মন্ডল	ঐ	
২১৩০.	মোঃ আঃ রহমান আকন্দ	মৃত আব্বাছ আলী আকন্দ	ঐ	
২১৩১.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত ইব্রাহিম সরকার	ঐ	
২১৩২.	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত ইলিম উদ্দিন	বড় আখিড়া	
২১৩৩.	মোঃ ময়নুল হক তালুকদার	মৃত রমজান আলী	শালগ্রাম	
২১৩৪.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত হাজী জহির উদ্দিন	ঐ	
২১৩৫.	মোঃ আহসান হাবিব	মৃত কায়েম উদ্দিন	পঃ সিংড়া	
২১৩৬.	মোঃ মমতাজুর রহমান	মৃত বয়েজ উদ্দিন	শালগ্রাম	
২১৩৭.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত মোজাম্মেল হক	সুত্রাপুর	
২১৩৮.	শ্রী বুদ্ধ চন্দ্র পাল	মৃত লংকেশ্বর পাল	এরলিয়া	
২১৩৯.	মোঃ আবদুর রহিম	মৃত ছলিম উদ্দিন	কাটানারপাড়া	
২১৪০.	এস এম মোখলেছুর রহমান	মৃত এস এম আশরাফ	জলেশ্বরীতলা	
২১৪১.	মোঃ বেলাল হোসেন	মৃত বুদাশেখ	কানজগাড়ী	
২১৪২.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত শমসের আলী	মহিষাথান	
২১৪৩.	মোঃ আইয়ুব উদ্দিন	মৃত দিরাজ উদ্দিন	ধলমোহনী	
২১৪৪.	মোঃ আঃ হামিদ	মৃত মফিজ উদ্দিন শেখ	নারুলী	
২১৪৫.	মোঃ আইয়ুব উদ্দিন প্রাং	মৃত দিরাজ উদ্দিন প্রাং	ধলমোহনী	
২১৪৬.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মোঃ ইব্রাহিম হোসেন	ঠেংগামারা	
২১৪৭.	মোঃ শামছুল আলম	মৃত হানিফ উদ্দিন	দিঘলকান্দি	
২১৪৮.	মোঃ মোকারম হোসেন	মৃত বয়তুল্যা শাহ	বড় সরলপুর	
২১৪৯.	মৃত এ এম ফারুক	মোঃ আঃ গনি মিয়া	লতিফপুর	
২১৫০.	মোঃ আঃ লতিফ	মোঃ আঃ মালেক	সুত্রাপুর	
২১৫১.	মোঃ বুলু মিয়া খলিফা	মোঃ আমিন আলী খলিফা	সুত্রাপুর	
২১৫২.	মৃত এ টি এম আব্দুল হামিদ	তোজাম্মেল হোসেন	সেউজগাড়ী	
২১৫৩.	সৈয়দ ফজলুল হক	সৈয়দ মহফুজুল হক	সুলতানগঞ্জপাড়া	
২১৫৪.	মোঃ জহুরুল হক (ইকবাল)	আহম্মেদ আলী আফছার	নারুলী	
২১৫৫.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত ছাবেদ আলী মোল্লা	শাখারিয়া	
২১৫৬.	মোঃ আব্দুল কাদের	মৃত ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	রহমান নগর	
২১৫৭.	মোঃ জিয়াউল হক খান মুন্নু	মৃত জসিম উদ্দিন খান	ধাওয়াকোলা	
২১৫৮.	মোঃ শাহজাহান আলী খান	মৃত আলহাজ খুদু খান	কালিমপাড়া	
২১৫৯.	মোঃ আব্দুর রউফ	মৃত ওয়াহেদুর রহমান	চাঁদপুর	
২১৬০.	মৃত নিতাই চন্দ্র দাস	মৃত নগেন্দ্র নাথ দাস	দক্ষিণ চেলোপাড়া	
২১৬১.	মোঃ বজলার রহমান	আজগর আলী আকন্দ	শাখারিয়া	
২১৬২.	হাজী মোঃ ইজান আলী	মৃত দমছের আলী ফকির	ধরমপুর	
২১৬৩.	মোঃ মাহফুজার রহমান	মৃত মোবারক হোসেন	মাটিডালি	
২১৬৪.	মৃত নিত্য গোপাল মালাকার	মৃত রামচন্দ্র মালাকার	নিশিন্দারা কারবালা	
২১৬৫.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত আলাউদ্দিন	ছোট বেলাইল	
২১৬৬.	মোঃ ফিরোজ আহমেদ	মোঃ আলতাফ আলী আহমেদ	জয়পুর পাড়া	
২১৬৭.	মোঃ জিন্নাতুল ইসলাম	মৃত আঃ জোব্বার মন্ডল	নিশিন্দারা	
২১৬৮.	মোঃ আফছার আলী তালুকদার	কছিম উদ্দিন তালুকদার	মালগ্রাম	
২১৬৯.	মোঃ আঃ সাত্তার	মৃত বছির উদ্দিন	ফলসা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২১৭০.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত সাদেক আলী	ঐ	
২১৭১.	মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত আসতুল সরদার	হলুদঘর	
২১৭২.	মোঃ ইয়াছিন আলী মন্ডল	মৃত আজিম উদ্দিন	তারাপুর	
২১৭৩.	মোঃ আনছার আলী	মৃত আমীন উদ্দিন	তারাপুর	
২১৭৪.	মোঃ সোহরাব	মৃত সাহার আলী	ঐ	
২১৭৫.	মোঃ সাইদুর রহমান	মৃত আহম্মদ আলী	ঐ	
২১৭৬.	মোঃ একরামুল হক	মৃত আঃ গফুর সরদার	ছাতনী	
২১৭৭.	মোঃ আঃ কুদ্দুস	মৃত হাজী নাফিজ উদ্দিন	প্রাণাথপুর	
২১৭৮.	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত ফজলার রহমান	ঐ	
২১৭৯.	মোঃ আজিজুর রহমান	মৃত ইমান আলী	কায়েতপাড়া	
২১৮০.	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত আশরত আলী	ঐ	
২১৮১.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত সম্বু সরদার	সান্দিড়া	
২১৮২.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত নঈম উদ্দিন	সান্দিড়া	
২১৮৩.	মোঃ নাসির উদ্দিন	মৃত ইসমাইল হোসেন	ছাতনী	
২১৮৪.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত বাসেদ আলী	ছাতনী	
২১৮৫.	মোঃ আশকর আলী	মৃত কটু প্রাং	কাশিমিলা	
২১৮৬.	মোঃ জামাল উদ্দিন	মৃত ইমান আলী	ঐ	
২১৮৭.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত মাহির উদ্দিন মোল্লা	ঐ	
২১৮৮.	মোঃ আলী হোসেন	মৃত হাজেম মোল্যা	ঐ	
২১৮৯.	মোঃ সহিদুল ইসলাম	মৃত এমদাদুল সরদার	ছাতনী	
২১৯০.	মোঃ জাফর উদ্দিন	মৃত তনু প্রাং	দমদমা	
২১৯১.	মোঃ আঃ আজাদ	মৃত ইলম আলী	সান্দিড়া	
২১৯২.	মোঃ মোহাম্মদ আলী	মৃত ইলম আলী	ঐ	
২১৯৩.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত হাজী সমশের আলী	ঐ	
২১৯৪.	মোঃ নবীন উদ্দিন	মৃত বাদেশ আলী	মন্ডলপুর	
২১৯৫.	মোঃ তোমজেদ হোসেন	মৃত তাহের আলী	মুরাদপুর	
২১৯৬.	মোঃ তছলিম উদ্দিন	মৃত রবেশ আলী	ঐ	
২১৯৭.	মোঃ কাজী জহুরুল ইসলাম	কাজী মতিয়ার রহমান	চরপাড়া	
২১৯৮.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মোজাম্মেল হক মন্ডল	চরপাড়া	
২১৯৯.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মোঃ মুনছের আলী আকন্দ	কাশিয়াহাটা	
২২০০.	মোঃ মোজাফফর রহমান	মৃত রিয়াজ উদ্দিন মন্ডল	কাশিয়াহাটা	
২২০১.	মোঃ সোবহান আলী সরকার	মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার	নান্দিয়ার পাড়া	
২২০২.	মোঃ বায়েছ উদ্দিন আকন্দ	মৃত কাজেম উদ্দিন আকন্দ	নান্দিয়ার পাড়া	
২২০৩.	মোঃ ইজ্জত আলী	মৃত জমসের আলী মোল্লা	নান্দিয়ার পাড়া	
২২০৪.	মোঃ আশরাফ আলী	কলিম উদ্দিন প্রাং	চরপাড়া	
২২০৫.	মৃত ফজলার রহমান	মৃত মাহির উদ্দিন মন্ডল	চরপাড়া	
২২০৬.	মোঃ কাজী আঃ রহিম	মৃত কাজী ইমাজ উদ্দিন	চরপাড়া	
২২০৭.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত জসিম উদ্দিন আহম্মেদ	উল্যাডাঙ্গা	
২২০৮.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত রহিমুদ্দিন মন্ডল	উল্যাডাঙ্গা	
২২০৯.	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত আফছার আলী প্রাং	চরকুমার পাড়া	
২২১০.	মোঃ মন্তেজার রহমান	মৃত মজিতুল্যা প্রাং	চরকুমার পাড়া	
২২১১.	মোঃ নছির উদ্দিন	মৃত গোফার মোল্লা	ছুনপচা	
২২১২.	মোঃ খায়রুল ইসলাম	মৃত ফজলার রহমান মন্ডল	নান্দিয়ার পাড়া	
২২১৩.	মোঃ খোরশেদ আলী	মৃত ধহর উদ্দিন মন্ডল	ছুনপচা	
২২১৪.	মোঃ ওসমান গনি	মৃত আহম্মদ আলী	অন্তরপাড়া	
২২১৫.	মোঃ আছালতজ্জামান	মৃত আঃ রহমান আকন্দ	পারাতিত পরল	
২২১৬.	মৃত গিয়াস উদ্দিন	মৃত নজির হোসেন আকন্দ	পারাতিত পরল	
২২১৭.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত রাজিব উদ্দিন	দারুন্দা	
২২১৮.	মোঃ আঃ কদ্দুস সরকার	মৃত মুনছের আলী সরকার	পাইকরতলী	
২২১৯.	মোঃ আঃ ফরিদ	মৃত আহম্মেদ আলী	দারুন্দা	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২২২০.	এ কে মোহাম্মদ আলী	মৃত ইব্রাহিম প্রাং	বাটিয়া	
২২২১.	মোঃ আজাহারুল ইসলাম	মৃত নিজাম উদ্দিন	ঘুঘুমারী	
২২২২.	মোঃ আব্দুর রহিম	মোঃ ইউনুছ আলী	গোদাখালী	
২২২৩.	মোঃ রোস্তম আলী	মৃত তমিজ উদ্দিন	বিবির পাড়া	
২২২৪.	মোঃ মনোয়ার হোসেন	মৃত আব্দুল কদ্দুছ মন্ডল	কামালপুর	
২২২৫.	মোঃ গোলাম রব্বানী	মৃত আজগর আলী মন্ডল	ইছামারা	
২২২৬.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত ইয়াতুল্যা মন্ডল	কামালপুর	
২২২৭.	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত আশারত উল্যা	পাইকপারা	
২২২৮.	মোঃ সুলতান মাহমুদ	মৃত কাবেজ উদ্দিন	ফরজমারী	
২২২৯.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত হজরত আলী	তেতুলিয়া	
২২৩০.	মোঃ আবু তাহের	মৃত আবুল হোসেন	ধনতলা	
২২৩১.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত কাদের আলী	খলপাড়া	
২২৩২.	মোঃ রায়হান আলী	নাছির উদ্দিন	দেলগু	
২২৩৩.	আবুল কাশেম	মৃত আয়েজ উদ্দিন	লক্ষীপুর	
২২৩৪.	মোঃ আঃ হাকিম	মৃত আব্বাস আলী	শিহারী	
২২৩৫.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত কায়সার আলী	নশরৎপুর	
২২৩৬.	মোঃ আলেফ উদ্দিন	মৃত ফয়েজ উদ্দিন শেখ	শাওইল	
২২৩৭.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত পিয়র আলী	শহারী	
২২৩৮.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত আয়েজ উদ্দিন	ঐ	
২২৩৯.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত ইছাহাক আলী	ঐ	
২২৪০.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত খয়বর আলী	শিহারী	
২২৪১.	মোঃ জয়েন উদ্দিন	মৃত ইমান আলী	দওবাড়ীয়া	
২২৪২.	মোঃ মনসুর আলী	মৃত মমতাজ আলী	ঐ	
২২৪৩.	মোঃ আব্দুর রহিম	মোঃ করম আলী	বিলচাপড়ী	
২২৪৪.	মোঃ আব্দুর রহমান	মোঃ বাহার উদ্দিন	রাঙ্গামাটি	
২২৪৫.	মোঃ ইউনুছ আলী	মোঃ রিয়াজ আলী	বিলচাপড়ী	
২২৪৬.	মোঃ সামছুল হক	আজাহার আলী	বিলচাপড়ী	
২২৪৭.	মোঃ জহুরুল ইসলাম	মোঃ আব্বাস আলী তাং	বিলচাপড়ী	
২২৪৮.	মোঃ তজিবুর রহমান	মোঃ বিনত মন্ডল	বিলচাপড়ী	
২২৪৯.	মোঃ আজাহার আলী ভুঞা	মোঃ মোজাদ্দার হোসেন ভুঞা	উজাল সিং	
২২৫০.	মোঃ আব্বাস আলী	মৃত মুনুরুদ্দিন	পীলহাটী	
২২৫১.	মোঃ আব্দুল মজিদ	মৃত বুজুর আলী	পীলহাটী	
২২৫২.	মোঃ হযরত আলী	মৃত দেলোয়ার হোসেন	জাবারীপাড়া	
২২৫৩.	মৃত সোহরাব হোসেন	মোঃ আছাব উদ্দিন	গোবিন্দপুর	
২২৫৪.	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	মৃত বক্স প্রাং	শহরাবাড়ী	
২২৫৫.	মোঃ মসলিম উদ্দিন	মৃত গেন্দা প্রাং	শহরাবাড়ী	
২২৫৬.	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত মুনসুর রহমান	শিমুলবাড়ী	
২২৫৭.	মোঃ আব্দুল্লাহ হেল কাফী	মৃত বছির উদ্দিন প্রাং	সাতবেকী	
২২৫৮.	ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত মজিবর রহমান মন্ডল	মেড়েরবাড়ী	
২২৫৯.	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত জবানী প্রাং	সাতবেকী	
২২৬০.	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত জসমত উল্লা	শিয়ালী	
২২৬১.	এস এম আব্দুস সাত্তার	মোঃ মানিক মোল্লা	রাঙিলা	
২২৬২.	শ্রী অধির চন্দ্র সাহা	শ্রী সুধির চন্দ্র সাহা	রাঙিলা	
২২৬৩.	শ্রী রনজিৎ চন্দ্র সাহা	শ্রী সুধির চন্দ্র াহা	রাঙিলা	
২২৬৪.	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত চান্দুল্লা শেখ	বুধারগাতি	
২২৬৫.	মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ আব্দুল হামিদ	ধুনট	
২২৬৬.	মোঃ গোলাম ওহাব	মোঃ জাবেদ আলী শেখ	জিঞ্জিরতলা	
২২৬৭.	মোঃ আব্দুর রফিক	মৃত নওশের আলী	উল্লাপাড়া	
২২৬৮.	মোঃ আফজাল হোসেন	মোঃ আলতাফ আলী	চিকাশী	
২২৬৯.	মোঃ মফিজ উদ্দিন সরকার	মৃত গেন্দা সরকার	চৌকিবাড়ী	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২২৭০.	মৃত মমতাজ উদ্দিন সরকার	মৃত গেন্দা সরকার	চৌকিবাড়ী	
২২৭১.	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মোজাহার আলী	জালশুকা	
২২৭২.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	দানেশ উদ্দিন সরকার	গুয়াতহরী	
২২৭৩.	মোঃ গোলাম রহমান	মৃত সোহরাব আলী সরকার	চিথুলিয়া	
২২৭৪.	মোঃ নুরুন্নবী বাহালু	মোঃ আজিজুল ইসলাম	বড়বিলা	
২২৭৫.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত বতলেব আলী	তিলোচ	
২২৭৬.	মোঃ তাহের আলী	মৃত ছামবাগ	তিলোচ	
২২৭৭.	মোঃ তবিবর রহমান	মৃত হাফেজ উদ্দিন সোনার	সোনারপাড়া	
২২৭৮.	মোঃ আঃ সাত্তার	মৃত আয়েজ উদ্দিন	ঐ	
২২৭৯.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত করে আলী	পাদঘাট	
২২৮০.	মোঃ আঃ জলিল প্রাং	মৃত ফজের আলী প্রাং	ঐ	
২২৮১.	মোঃ আনছার আলী	মৃত মোঃ ইয়াছিন	ফোচকুড়ি	
২২৮২.	মোঃ আসাব উদ্দিন	মৃত ছবেদ উদ্দিন	সান্তাহার	
২২৮৩.	মোঃ আজিজুর রহমান	মৃত মোজাহার আলী	হলুদঘর	
২২৮৪.	মোঃ বছির আহম্মেদ	মৃত ওমর উদ্দিন	পাথরকুটা	
২২৮৫.	মোঃ মোস্তফা নুরুল ইসলাম	মৃত আফছার আলী	সান্তাহার	
২২৮৬.	মোঃ রশিদুল ইসলাম	মৃত মোসলেম	কলসা	
২২৮৭.	মোঃ এল কে আবুল হোসেন	মৃত রহিম উদ্দিন	সান্তাহার	
২২৮৮.	মোঃ জহির উদ্দিন	জৈমত সরদার	মালশন	
২২৮৯.	মোঃ মোবারক আলী মন্ডল	মৃত পবন উদ্দিন	ঐ	
২২৯০.	মোঃ এবদাম হোসেন	মৃত খয়ের আলী	কলসা	
২২৯১.	মোঃ আঃ ওহাব	মৃত সাহাদ আলী	হলুদঘর	
২২৯২.	মোঃ আঃ ছাত্তার	মৃত বছির উদ্দিন	ঐ	
২২৯৩.	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত সাদেক আলী	ঐ	
২২৯৪.	মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত আসতুল সরদার	হলুদঘর	
২২৯৫.	মোঃ ইয়াছিন আলী	মৃত তাজিন উদ্দিন	ঐ	
২২৯৬.	মোঃ আনছার আলী	মৃত আমিন উদ্দিন	তারাপুর	
২২৯৭.	মোঃ সোহরাব	মৃত সাহেব আলী	হলুদঘর	
২২৯৮.	মোঃ সাইদুর রহমান	মৃত আহম্মদ আলী	ঘোড়াঘাট	
২২৯৯.	মোঃ আঃ খালেক	মৃত ইয়াদ আলী	বরিয়াবার্তা	
২৩০০.	মোঃ অবির উদ্দিন	মৃত নিলচাঁন	মেজায়	
২৩০১.	মোঃ খগেন চন্দ্র বর্মণ	মৃত দেবেন্দ্রনাথ বর্মণ	বরিয়াবার্তা	
২৩০২.	মোঃ গাজী নজরুল ইসলাম	মৃত কবির উদ্দিন	ঐ	
২৩০৩.	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত সময় উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
২৩০৪.	মোঃ আফছার আলী	মৃত কোকা সাহ	ছোট আখিড়া	
২৩০৫.	মোঃ আব্দুর রহমান	কেরামতুল্লাহ	শালগ্রাম	
২৩০৬.	মৃত মোহাম্মদ আলী	মৃত হাফিজ উদ্দিন	ঐ	
২৩০৭.	মৃত আব্দুল মজিদ মন্ডল	মৃত ছবেদ আলী মন্ডল	অন্তাহার	
২৩০৮.	মোঃ আলীম উদ্দীন	আমির উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
২৩০৯.	মোজাফফর হোসেন	মৃত ছামসুদ্দীন	ঐ	
২৩১০.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত পুলবর আলী মন্ডল	বাগবাড়ী	
২৩১১.	মোঃ সমসের আলী শেখ	মৃত সহীর উদ্দিন শেখ	নিমাই দীঘি	
২৩১২.	মোঃ নাছির উদ্দিন মন্ডল	বাগবাড়ী	ঐ	
২৩১৩.	মৃত আব্দুস সামাদ	মৃত আমির উদ্দিন	বাগবাড়ী	
২৩১৪.	মৃত আব্দুল আজিজ	মৃত হাসেম আলী	দুর্গাপুর	
২৩১৫.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মৃত ফয়েজ উদ্দীন	পাহালোয়ানপাড়া	
২৩১৬.	মোঃ ওয়ারেছ আলী মন্ডল	মৃত আলহাজ্ব সাদেক আলী	কোমারপুর	
২৩১৭.	মোঃ হায়দার আলী খান	মৃত আসকর আলী	বড় আখিড়া	
২৩১৮.	মোঃ আবু তালেব	মৃত মালেক উদ্দীন	লক্ষীকোল	
২৩১৯.	মোঃ খাজা রেজাউল হক	মৃত খাজা আব্দুর রউফ	কোমারপুর	

ক্রঃনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২৩২০.	পরমেশ্বর মন্ডল	মৃত প্যারীলাল মন্ডল	বড় আখিড়া	
২৩২১.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত মজিবর রহমান	শালগ্রাম	
২৩২২.	মোঃ রেজওয়ানুর রহমান	মৃত সমসের আলী	ঐ	
২৩২৩.	মোঃ আক্কাছ আলী সরদার	মৃত আলম সরদার	কোমারপুর	
২৩২৪.	মোঃ একরাম হোসেন	মৃত নায়েব আলী	ডুমুড়ী	
২৩২৫.	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত ছাদের আলী	গলপাড়া	
২৩২৬.	মোঃ বাহার উদ্দিন	হরমত আলী	ঐ	
২৩২৭.	মোঃ তৌফিক হোসেন	আতোয়ার রহমান	সেলুঞ্জ	
২৩২৮.	মৃত খোরশেদ আলম	আজিম উদ্দিন	কেচকুড়ী	
২৩২৯.	মোঃ মন্টু সাকিদার	মৃত বশির সাকিদার	সিহাড়ী	
২৩৩০.	মোঃ আব্দুল জোব্বার	মৃত আছমতুল্লাহ	ধনতলা	
২৩৩১.	তোফাজ্জল হোসেন	মৃত মমতাজ উদ্দীন	গুলিন্দ	
২৩৩২.	মৃত সোলেমান সাকিদার	মৃত জসমত আলী সাকিদার	ঐ	
২৩৩৩.	মোঃ আজিজার রহমান	মৃত ছায়েত আলী মন্ডল	দন্ডবাড়ী	
২৩৩৪.	মৃত আবুল কালাম আজাদ	মৃত হাফেজ ওবায়দুল্লাহ	শিহারী	
২৩৩৫.	আব্দুল হামিদ	মৃত ইসমাইল হোসেন	ফোটকুড়ি	
২৩৩৬.	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত আজিম উদ্দীন	ফোটকুড়ি	
২৩৩৭.	মোঃ কোরেশ আলী	মৃত পরেশ আলী	লক্ষীপুর	
২৩৩৮.	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত মছির উদ্দীন	খারিয়াকান্দি	
২৩৩৯.	মোঃ ইয়াকুব আলী	ইসারত আলী	হলুদঘর	
২৩৪০.	মোঃ ওমর আলী	মৃত মহির উদ্দিন	কোলাদীঘি	
২৩৪১.	মৃত জাহাঙ্গীর আলম	মৃত আলী আজগর	নশরৎপুর	
২৩৪২.	মোঃ জফির উদ্দিন	নাছির মন্ডল	সেলুঞ্জ	
২৩৪৩.	হৃদয় চন্দ্র বর্ম্মণ	বিরল চন্দ্র বর্ম্মণ	ছোট চাটখইর	
২৩৪৪.	মৃত নিজাম উদ্দিন	মৃত তুহিন উদ্দিন	ধনতুলা	
২৩৪৫.	নজরুল ইসলাম	বছির উদ্দিন	লক্ষীপুর	
২৩৪৬.	মৃত শাহ ফরিদ উদ্দিন	মৃত শাহ নুরুল হুদা	ঐ	
২৩৪৭.	মোঃ আব্দুল মজিদ মন্ডল	মৃত হাজী জহির উদ্দিন	নুরইল উত্তর পাড়া	
২৩৪৮.	মোঃ মোসলিম উদ্দিন	মৃত মহির উদ্দিন	লক্ষীপুর	
২৩৪৯.	মোজাম্মেল হক	মৃত আক্কেল আলী	পূর্ব ভালস্ব	
২৩৫০.	মোঃ শামছুর রহমান	মৃত বছির উদ্দিন	ঐ	
২৩৫১.	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত ইছমত আলী মন্ডল	ধনতলা	
২৩৫২.	মোঃ ইব্রাহিম আলী	মৃত হযরতুল্লাহ মন্ডল	নশরৎপুর	
২৩৫৩.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	ছবের উদ্দিন	পূর্বভালস্ব	
২৩৫৪.	মোঃ বয়েজ উদ্দিন	মৃত তয়েজ উদ্দিন	কেশরতা	
২৩৫৫.	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত ইশরত	আদমদীঘি	
২৩৫৬.	মোঃ সেকেন্দার আলী	নায়েব মোল্লা	রানপুরা	
২৩৫৭.	মোঃ আনছার আলী	রমজান আলী	তানশন	
২৩৫৮.	মোঃ আমজাদ হোসেন	বানু আকন্দ	কাশিমালা	
২৩৫৯.	মোঃ মোজাহার মোল্লা	জহির উদ্দিন	সুদিন	
২৩৬০.	মোঃ জয়েন উদ্দিন	মেহের আলী	উজ্জ্বলতা	
২৩৬১.	মোঃ আলীম উদ্দিন	সুভান	ঐ	
২৩৬২.	মোঃ লোকমান আলী	মৃত কয়েজ উদ্দিন	তেতুলিয়া	
২৩৬৩.	অরুন চন্দ্র সরকার	তারিনী কান্ত সরকার	আদমদীঘি	
২৩৬৪.	মোঃ ছাত্তার প্রাং	ছামাউল্লাহ প্রাং	দক্ষিণ গনিপুর	
২৩৬৫.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত হশমদী মন্ডল	ফুলসুখী	
২৩৬৬.	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত বছির উদ্দিন মন্ডল	ঐ	
২৩৬৭.	মোঃ আবুল হোসেন	নাদচাদ প্রাং	পাইকড়া	
২৩৬৮.	মোঃ আফাজ হোসেন	তারিনী	ঐ	
২৩৬৯.	মোঃ বাহার মোল্লা	কাজিম মোল্লা	সুদনি	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমনং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউঃ পৌরসভা
২৩৭০.	মোঃ ইছাহাক	মৃত বাবর আলী	ঐ	
২৩৭১.	মোজাম্মেল হক	মৃত হারেজ আলী	কেশরতা	
২৩৭২.	মৃত মোসলেম উদ্দিন	হাবেছ উদ্দিন	কুসুম্বী	
২৩৭৩.	মোঃ নাজিম উদ্দিন	মৃত বাবর আলী	ঐ	
২৩৭৪.	মোঃ আব্দুল প্রাং	ছহির উদ্দিন	রামপুরা	
২৩৭৫.	মৃত আহমেদ আলী	মৃত রবিয়া সরদার	কাশিমালা	
২৩৭৬.	মোঃ জামাল উদ্দিন	ইসরত প্রাং	জোড়পুকুরিয়া	
২৩৭৭.	মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন প্রাং	খয়ের আলী	কাশিমালা	
২৩৭৮.	নিমাই চন্দ্র কুন্ডু	পিতম্বর কুন্ডু	আদমদীঘি	
২৩৭৯.	মোঃ তোজাম্মেল হোসেন	মৃত আব্দুল গনি	কাশিমালা	
২৩৮০.	মোঃ জাফর উদ্দিন মন্ডল	মোঃ খগবর উদ্দিন মন্ডল	কুসুম্বী	
২৩৮১.	মৃত আদম আলী	মৃত আয়েজ উদ্দিন প্রাং	মুরাদপুর	
২৩৮২.	মোঃ জামাল উদ্দিন	মোঃ মকবুল হোসেন	মুরাদপুর	
২৩৮৩.	মৃত আবুল আনসার	মৃত খোদা বক্স	ভালসন	
২৩৮৪.	মোঃ আব্দুর রহমান	মৃত জসিম উদ্দিন	ঐ	
২৩৮৫.	মোঃ আব্বাস আলী	বাদেশ আলী	দক্ষিণ গনিপুর	
২৩৮৬.	মোঃ শফিউল ইসলাম	মোঃ মমতাজুর রহমান	কুন্দগ্রাম	
২৩৮৭.	মোঃ আবু সুফিয়ান	মৃত আব্দুল জোব্বার	বশিকোড়া	
২৩৮৮.	শ্রী সুরেশ চন্দ্র	মৃত অক্ষয় চন্দ্র	কুড়ই	
২৩৮৯.	মোঃ আব্দুস সামাদ	মৃত ইসমাইল হোসেন	মটপুকুরিয়া	
২৩৯০.	মোঃ নবির উদ্দিন	মোঃ আব্দুর রহমান	কুন্দগ্রাম	
২৩৯১.	মোঃ আব্দুল হোসেন	মৃত নায়েব উল্লাহ	কড়ই	
২৩৯২.	মোঃ ছাইদুর রহমান	মৃত বসব উল্লাহ	ঐ	
২৩৯৩.	মোঃ আব্দুস সামাদ	ইবরাহিম আলী	বিহগ্রাম	
২৩৯৪.	মোঃ সুবিদ আলী	কছির উদ্দিন	পাইকপাড়া	
২৩৯৫.	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	সৈয়দ আলী	ঐ	
২৩৯৬.	মৃত ইয়াছিন আলী	কছির উদ্দিন	পাইকপাড়া	
২৩৯৭.	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত হারান উদ্দিন	ছাতনী	
২৩৯৮.	মোসলিম উদ্দিন	মৃত আহাদ আলী	প্রাণনাথপুর	
২৩৯৯.	আবুবক্কর সিদ্দিক	মোঃ আজের উদ্দিন	ছাতনী	
২৪০০.	মোঃ মমতাজ আলী	মৃত ছহির উদ্দিন	লমদম	
২৪০১.	মোঃ আজমল হোসেন	মৃত মনির উদ্দিন	হলুদবন	
২৪০২.	এ.এফ এম রফিকুল ইসলাম	মৃত ইসাহাক উদ্দিন	সাহেবপাড়া	
২৪০৩.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত আক্কেল আলী	চা-বাগান	
২৪০৪.	সচীন্দ্রনাথ	মৃত শশধর সরকার	কলসা	
২৪০৫.	মোঃ আকবর হোসেন	মৃত মোজাহার	সান্তাহার	
২৪০৬.	মোঃ আব্দুল জোব্বার	হাসেম উদ্দিন প্রাং	কলসা	

সূত্র : বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৪ মে ২০০৫

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ফরম কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস
Primary Sources

১.১ মূল দলিলপত্র

১. ড. আবুল কাশেম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১।

২. মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১)* খণ্ড ১-৩, ঢাকা, গতিধারা, ১৯৯৯।

৩. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও চতুর্দশ খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪।

৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫।

৭. Dr. M.A. Mannan Chowdhury, Sharifa Mannan (editor), *International Documents of Great Liberation War in* Bangladesh [1970-71] vol. I-III, Jatiya Gontha prokashan, 2008.

৮. Government of Pakistan, *Report on General Election in Pakistan 1970-71*, Islamabad, Election Commission, Pakistan, 1972.

৯. J.N. Gupta, *District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam*, Elahabad, 1910.

১০. Maudood Elahi [editor] *Assignment Bangladesh 71*, Dhaka, Momin Publications, 1999.

১১. Quaderi, Fazlul Quader (Rd.) *Bangladesh Genocide and World Press*, Dacca, Alexandra Press, 1972.

১২. Sing, Sheelendra Kumar, *Bangladesh Documents*, Vol. 1 and 2, Dhaka, The University Press Limited, 1999.

১৩. W. W. Huuter, *A statislical Account of Bengal Bogra and Rajshahi*, Vol, vii, London 1876.

১.২ পত্র-পত্রিকা

১. দৈনিক আজাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

২. দৈনিক আজাদ, ২ ও ৩ মার্চ, ১৯৫২।

৩. দৈনিক আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।

৪. দৈনিক আজাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

৫. দৈনিক আজাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

৬. দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

৭. দৈনিক আজাদ, ২ মার্চ, ১৯৫৪।

৮. দৈনিক আজাদ, ২ মার্চ, ১৯৫৪।

৯. দৈনিক আজাদ, ২২ মার্চ, ১৯৫৪।

১০. দৈনিক আজাদ, ২৪ মার্চ, ১৯৫৪।

১১. দৈনিক আজাদ, ২১ এপ্রিল, ১৯৫৪।

১২. দৈনিক আজাদ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

১৩. দৈনিক আজাদ, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

১৪. দৈনিক আজাদ, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

১৫. দৈনিক আজাদ, ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

১৬. দৈনিক আজাদ, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

১৭. দৈনিক আজাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

১৮. দৈনিক আজাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. দৈনিক আজাদ, ৫ মার্চ, ১৯৬৯।
২০. দৈনিক আজাদ, ২৬ ফাল্গুন, ১৩৭৮।
২১. দৈনিক আজাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
২২. দৈনিক আজাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
২৩. দৈনিক আজাদ, ১৯ মার্চ, ১৯৬৯।
২৪. দৈনিক আজাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।
২৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ এপ্রিল, ১৯৬২।
২৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মে, ১৯৬৬।
২৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই, ১৯৬৬।
২৮. দৈনিক করতোয়া, ২৫ মার্চ, ২০০৫।
২৯. দৈনিক করতোয়া, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০০।
৩০. দৈনিক করতোয়া, ১৬ মার্চ, ২০০৪।
৩১. দৈনিক করতোয়া, ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৪।
৩২. দৈনিক পাকিস্তান, ১১ এপ্রিল, ১৯৬৬।
৩৩. দৈনিক পূর্বদেশ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
৩৪. দৈনিক পূর্বদেশ, ১৪ মার্চ, ১৯৭২।
৩৫. দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ মার্চ, ১৯৭২।
৩৬. দৈনিক পূর্বদেশ, ৭ অক্টোবর, ১৯৬২।
৩৭. দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
৩৮. দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৪।
৩৯. দৈনিক বাংলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
৪০. দৈনিক বাংলা, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭২।
৪১. দৈনিক সংগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
৪২. দৈনিক সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
৪৩. দৈনিক সংবাদ, ৫ এপ্রিল, ১৯৯৫।

১.৩ সাক্ষাৎকার

১. আবদুল মতিন। লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিক। স্থায়ী ঠিকানা : কলেজ রোড, শেরপুর, বগুড়া। 'দৈনিক উত্তর বার্তা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। ছাত্রজীবন থেকে বামপন্থী রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী, কবি, সাংবাদিক, কলাম লেখক, মার্ক্সীয় চিন্তা চেতনার ধারক-বাহক। আজীবন প্রলেতারীয় শ্রেণীর মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করেন। ১৯৪৮ সালে ভাষা-প্রশ্নে মিছিল চলাকালে মুসলিম লীগের কর্মী-সমর্থক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হন আযিযুল হক কলেজের অনেক ছাত্রসহ আব্দুল মতিন। ৬৬-র ৬ দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন জনাব আব্দুল মতিন—তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে তথ্যগুলো জানা যায়।

২. ড. এনামুল হক। গীতিকার, নাট্যকার, জাতীয় জাদু ঘরের সাবেক মহাপরিচালক। স্থায়ী ঠিকানা : জলেশ্বরীতলা, বগুড়া। গান রচনা, কণ্ঠ ও সুরারোপে দক্ষ। ভাষা-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধকালে দেশাত্মবোধক গানে এদেশের মানুষকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯৫৩/৫৪ সালে অনেক রাজনৈতিক সভার উদ্বোধনী গণসঙ্গীত গায়ক ছিলেন। সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে গণসঙ্গীত গায়ক ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিসেবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে রাজনৈতিক কারণে জেলে বন্দি হন। ১৯৫৪ সালে গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনো একক রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব নাই। দেশের কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল ছিল ৫৪'র আন্দোলন—সাক্ষাৎকারে তিনি জোর দিয়ে একথা বলেন। ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের নেপথ্যে জনগণের সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক জোয়ারকে তিনি প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন, বগুড়ায় বিশেষত পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, আক্কেলপুর প্রভৃতি স্থানে অগ্রগামী চিন্তাধারায় বামপন্থী কর্মী ও নেতা ছিল বলেই তেভাগা আন্দোলনটা ঐ সমস্ত এলাকাতেই হয়েছিল। যার প্রভাব পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলেছিল।

৩. এ.কে মুজিবুর রহমান। রাজনীতিবিদ, সাবেক সংসদ সদস্য। বর্তমানে ৮৪ বছরের দীর্ঘ জীবনযাপন করছেন। বঙ্গবন্ধুকে 'মিতা' সম্বোধন করতেন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ঘোষণাকালে বগুড়ায় রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ বর্ণনা করেন এভাবে : পাকিস্তানীরা আমাদের শুষে খাচ্ছে, সবকিছু সম্পদ তারা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে ৩টা রাজধানী বানাচ্ছে—করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ।

মুক্তিযুদ্ধকালে বগুড়ার নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম এ.কে মুজিবুর রহমান যুদ্ধকালে সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও তাৎক্ষণিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যা যুদ্ধজয়ের জন্য সহায়ক হয়েছে।

৪. মমতাজ উদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রনেতা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি, বর্তমানে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ও মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দেশচিত্র সম্পর্কে বিশেষত, বগুড়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও চিত্র তুলে ধরেন জনাব মমতাজ উদ্দিন।

৫. আমানউল্লাহ খান। পিতা : কুতুবুদ্দিন খান, গ্রাম : জয়লাজুয়ান, থানা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া। বর্তমান ঠিকানা : নিশিন্দারা হাউজিং প্রকল্প, বাড়ি-২, রোড-২৯, বগুড়া। বর্তমান বয়স : ৬৭ বছর। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর। তিনি যুদ্ধকালে দৈনিক ইত্তেফাক-এর বগুড়া প্রতিনিধি ছিলেন। এখনও সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গেই যুক্ত। ১৯৭১ সালে বগুড়াতেই বিভিন্ন এলাকার মুজিব বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের যুদ্ধবিষয়ক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বগুড়া জেলার পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের include করা, তাদেরকে ট্রেনিং-এ পাঠানো ছাড়াও স্বাধীনতার জন্য কৌশল প্রণয়নসহ এলাকার মানুষের সহযোগিতা ও মনোবল বাড়ানোর জন্য কাজ করেছেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বগুড়া জেলায় নির্বাচন পরিচালকের দায়িত্বপালন করেন। বঙ্গবন্ধু তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন বলে সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় তিনি এই অভিমত দেন। তিনি বলেন, ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হল। ৩০ ডিসেম্বর বগুড়া থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'দৈনিক বাংলাদেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই 'দৈনিক বাংলাদেশ' Divide বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশিত দৈনিক। জনাব খান সাবেক সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা।

৬. অ্যাডভোকেট স্বপন গুহ রায়, সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, বগুড়া। পিতা : শংকর গুহ রায়, চেলোপাড়া, বগুড়া। ব্যক্তিজীবনে আইন ব্যবসা করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন। দেশের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না-পারলেও অবকাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়নকল্পে বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধে তার নাম অগ্রগণ্য। ১৯৬৬-র ৬ দফা সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে বগুড়ার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অবদান সম্পর্কে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৭. ফেরদৌস জামান মুকুল, সাবেক সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রনেতা, বগুড়া। পিতা : আইনুদ্দিন মিঞা, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ধনকুণ্ঠি, চান্দাইকোনা, শেরপুর। বর্তমান ঠিকানা : জলেশ্বরীতলা, বগুড়া। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রলীগ নেতা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ২০/২১ বছরের যুবক ফেরদৌস জামান মুকুল অসম সাহসিকতায় বগুড়ার প্রত্যন্ত এলাকায় এবং বগুড়া শহরে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কাজে লিপ্ত ছিলেন। ট্রেনিং নিয়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছেন, দেশের মুক্তির ব্যাপারে সবসময়ই আশাবাদী ছিলেন। ৬৬-র ৬ দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭১-র মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ ও বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়।

৮. সুবল চন্দ্র দাস। কলেজ রোড, শেরপুর, বগুড়া। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে বয়স ৫৪ বছর। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ১৮ বছরের যুবক ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সুবল চন্দ্র দাস ১৯৭১ সালে শেরপুর ডি.জে হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ২৫ মার্চের নৃশংসতার পর বাড়ি-ঘর-সম্পদহারা সুবল চন্দ্র দাস পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে আশ্রয় নেন। স্থানীয় সহপাঠী বা সাধারণ জনগণ সেই সময়ে শেরপুরের সমগ্র হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক লুটপাট ও হত্যা চালায়। এ-কাজে পাকবাহিনী ও বিহারিরা অগ্রহণী ভূমিকা রাখে। অগ্নিসংযোগ, ইজ্জত হরণসহ পৈশাচিকতার শিকার হন শেরপুরের প্রগতিশীল মানুষ ও হিন্দু পরিবারবর্গ। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে আন্দোলন করেছেন শেরপুরবাসী।

ভারতে গিয়ে শেলুনবাড়ি-তেজপুর হয়ে শিলিগুড়িতে ২৮ দিন ট্রেনিং গ্রহণ করেন। যুড়িমাড়ি সীমান্তে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারপর দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধ করেন। মহাস্থান যুদ্ধ তার জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায়।

৯. আমজাদ হোসেন। গ্রাম : হায়াইল, পোঃ+থানা+জেলা : জয়পুরহাট। পেশা : ব্যবসা। ১৯৭১ সালে বি.এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-এর মহকুমা সভাপতি থাকাবস্থায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হন। ৬৮-৬৯-এর আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। জয়পুরহাট এলাকা পূর্ব থেকেই একদিকে প্রগতিশীল ও অন্যদিকে প্রগতিবিমুখতায় খ্যাত ছিল। তেভাগা আন্দোলন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহসহ নানা বিদ্রোহ সংগ্রাম যেমন হয়েছে এই এলাকায় তেমনি জামাত-শিবির, রাজাকার-আলবদর নেতৃত্বও ছিল প্রবল। এই উভয়বিধ টানাপড়েনের মধ্যেই তাঁরা দেশের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন জীবন বাজি রেখে। সাক্ষাৎকার প্রদানকালে জনাব আমজাদ

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন বৃহত্তর বগুড়া জেলায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত জানা না-জানা অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা, জীবনবাজি রেখে হানাদার বিরোধী যুদ্ধাভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কাজে এসেছে।

১০. আমিনুল হক বাবুল। ১৯৭১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পশ্চিম দিনাজপুরের হিলি থানায় একাধিক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালির জাগরণের কথা উল্লেখ করে বলেন : দলমত নারী-পুরুষ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমান সকলেই সাধ্যমতো মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। স্বল্প সময়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার নেপথ্যে সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে বলেন, আধুনিক সমরাস্ত্র ও ট্রেনিং সজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের নেপথ্যে অসম সাহস ও সকলের সাহায্যই বিজয়ের দাবীদার। বর্তমানে তিনি জয়পুরহাট জেলায় পাঁচবিবি থানার স্টেডিয়াম মোড়ে বাস করছেন।

১১. গাজীউল হক। ভাষা সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধকালীন বগুড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জনাব হক-এর দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থেকে মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

১২. মিসবাহুল মিল্লাত নান্না। বর্তমানে পেশায় ব্যবসা, মুক্তিযুদ্ধকালের মোটর মেকানিক নান্নার বর্তমান বয়স ৬৮। বগুড়া শহরে বসবাসরত এই মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বগুড়াবাসীর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ প্রসঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ২৫ মার্চ রাতের সেই ভয়াল নির্মমতার কথা স্মরণ করে নান্না বলেন : আমরা গাছ কেটে উত্তর দিক রংপুর থেকে পাকবাহিনীকে বগুড়া শহরে প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে প্রাথমিকভাবে বগুড়াবাসীকে রক্ষা করেছিলাম। পরবর্তী পর্যায়ে ১ মাস বগুড়া মুক্ত ছিল। এই মুক্ত থাকার পেছনে আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ বিরাট কাজে লেগেছে। বগুড়া ও বগুড়ার প্রত্যন্ত এলাকার মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত কথা বলেন।

১৩. এনামুল হক তপন। বগুড়ার বড়গোলা নিবাসী এনামুল হক তপন-এর বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিরোধ বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ট্রেনের মধ্যে পজিশন নিয়ে একটি রিভলবারের মাধ্যমে পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। মার্চ থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত বগুড়ার মুক্ত থাকা ও মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

১৪. কমরেড মোখলেসুর রহমান, বগুড়া। বগুড়ার অধিবাসী কমরেড মোখলেসুর রহমান বাম-রাজনীতির একজন পুরোধা ব্যক্তি। ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরী, কমরেড সুবোধ লাহিড়ী, আব্দুল মতিনসহ অনেকের রাজনৈতিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বগুড়াসহ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাম-ধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শ্রমিক-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম, স্বাধীনতা-প্রত্যাশা, ৬ দফা, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। শুধু আওয়ামী লীগ কিংবা ছাত্রলীগ নয়, তৎকালে বগুড়ায় বাম-ধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ হয়েছিল—সর্বজনীনতা পেয়েছিল। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন।

১৫. শোকরানা। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রনেতা, সরকারি আযিযুল হক কলেজের ইন্টারমেডিয়েট ক্লাসের ছাত্র, ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী শোকরানা বগুড়া শহরের ছিলিমপুরের জনাব আব্দুস সামাদের পুত্র। পাক-সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বগুড়ায় ছাত্র-উইং-এ কাজ করার দায়িত্ব পড়ে তার উপর। ১৯৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না-করায় দেশব্যাপী জনমনে সন্দেহের দানা বাধে—পাকসরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব ক্রমশ প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের নির্দেশে বগুড়াতেও ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল নেতা ও কর্মীরা অসহযোগের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত বগুড়াকে সক্রিয় ছাত্র-জনতা মুক্ত রাখে। গাদা বন্দুক দিয়ে পাকবাহিনীকে ১ মাস আটকে রাখার অদম্য সাহসিকতা বগুড়াবাসী প্রদর্শন করে। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। আর শোকরানা ছিলেন বগুড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা। বগুড়ার যুদ্ধ, ভারতে ট্রেনিং গ্রহণসহ আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সম্পর্কে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন শোকরানা।

১৬. অ্যাডভোকেট রেজাউল বাকী, বার কাউন্সিল ভবন, জজকোর্ট, বগুড়া। পিতা মোঃ আবুল জলিল, স্থায়ী ঠিকানা : কালীবাড়ি, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া। পেশা : আইন ব্যবসা, জজকোর্ট, বগুড়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া আযিযুল হক কলেজে ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্র ছিলেন। সেই সময়ে ১৮/১৯ বছর বয়সেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়ায় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন এবং প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন—দুটি দায়িত্ব সমানভাবে পালন করে নেতৃত্বের দিক থেকে সামনের কাতারে আসতে পেরেছিলেন। ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকবাহিনী এসে বগুড়ায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলে বগুড়ার সর্বস্তরের জনগণ ও ছাত্র-যুবক মিলে তা প্রতিরোধ করে। তোতা মিয়া প্রথম শহীদ হন। বগুড়ার পার্শ্ববর্তী নওগাঁ, জয়পুরহাট থেকে ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ এসে প্রতিরোধকামী জনতার সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দেয়াসহ সেই সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক বর্ণনা পাওয়া যায় অ্যাডভোকেট রেজাউল বাকীর সাক্ষাৎকার থেকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে তাঁর বয়স ৫৪/৫৫ বছর।

১৭. এম. এ আজিজ, গ্রাম : বড় টেংরা, বগুড়া সদর। পিতা : মেহের আলী মণ্ডল, এফ.এফ নং-৩৭৫৮, সাময়িক সনদ নং-ম ৪৪৩১৫, স্মারক : ৩/৩৩/২০০২/১২৫১। বর্তমান বয়স ৬০ বছর। মুক্তিযুদ্ধকালে বয়স ছিল ২৪ বছর। ১৯৭১ সালে একটি ব্যাংকের পিয়ন ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। ১৯৭১ সালে বগুড়ার মহাস্থান এলাকায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারাদেশের মানুষ অসহযোগে যোগ দিলে তিনিও যোগ দেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে বালুরঘাটের কামারপাড়ায় প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণের পর পাতিরামপুর ক্যাম্প; অবশেষে উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য শিলিগুড়ির পাথরঘাটার পাহাড়ি এলাকায় গমন, ট্রেনিং গ্রহণ—তারপর তরঙ্গপুর হেড কোয়ার্টারে ২৮ দিন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ৭ নম্বর সেক্টরের হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দিনাজপুর, হিলি, বিরল, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি প্রভৃতি সীমান্তবর্তী এলাকায় তিনি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রামশহর-পীরবাড়ির কয়েকজনের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের কথা বললেন তিনি। পীরবাড়ির শহীদদের কথা স্মরণ করে তার এলাকায় নারীদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। রান্না, সংবাদ আদান-প্রদান এবং পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কের ভান করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ধরিয়ে দেওয়া থেকে তাদের আত্মবিসর্জন ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন তিনি তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে।

১৮. মোঃ আব্দুল জলিল, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শেরপুর কলোনীপাড়া, বগুড়া। গ্রাম : বিলনোখার, ইউনিয়ন : খামারকান্দি, থানা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব আব্দুল জলিল ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে বগুড়ার পূর্বাঞ্চল বিশেষত, সারিয়াকান্দি হয়ে ধুনট এবং শেরপুর এলাকায় প্রবেশ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শেরপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর কমান্ডার ছিলেন। পরবর্তীকালে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জনাব আফরাম হোসেন খানের নেতৃত্বে শেরপুর মুক্ত হলে ১৫ ডিসেম্বর শেরপুরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন জনাব আমাউল্লাহ খান—সাক্ষাৎকার প্রদানকালে জনাব আব্দুল জলিল শেরপুর শহর, দড়িমুকুন্দ, ঘোগাব্রীজ প্রভৃতি স্থানে পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে শেরপুরের রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধীদের কথা তুলে ধরেন। বিহারীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কুখ্যাত মান্নান বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করেন। জনাব গাজীউর রহমান, অধ্যক্ষ রোতম আলী প্রমুখের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপ তুলে ধরেন।

১৯. এ.বি.এম শাহজাহান, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব। '৭১-এ ছাত্র ছিলেন। বগুড়া জেলা বিএলএফ কমান্ডার ছিলেন। পশ্চিম বগুড়া এলাকায় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে (গেরিলা) অংশগ্রহণ করেছেন। স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম : গরিবের পড়িয়া, থানা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।

২০. শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ্, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। '৭১-এ ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন পশ্চিম বগুড়া এলাকায়। সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। বর্তমান ঠিকানা কার্টনার পাড়া, বগুড়া।

২১. গোলাম জাকারিয়া খান রেজা, ব্যবসায়ী, ছাত্র থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। '৭১-এ ছাত্রলীগ বগুড়া জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমান ঠিকানা, শিব্বাটী বগুড়া, স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম : ধাওয়া খোলা, গোকুল, বগুড়া।

২২. সমুদ্র হক, সাংবাদিক। '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বর্তমান ঠিকানা গোহাইল রোড, সূত্রাপুর, বগুড়া-মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২৩. গোলাম মোস্তফা ঠাণ্ডু। চেইন মাস্টার, ধুনট, বর্তমান ঠিকানা গোসাইবাড়ি, ধুনট। '৭১-এ শর্টহ্যান্ড টাইপ কোর্স সমাপ্ত করেন। সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা।

২৪. মোঃ শফিকুল আলম, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন গেরিলা অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন ট্রেন উড়ানো, ব্রিজ উড়ানো ইত্যাদি। বর্তমান ঠিকানা মালতীনগর, চাঁনবাড়ির হাট, বগুড়া।

২৫. মোকসেদুর রহমান বাবলু, সরকারি চাকরিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা পূর্ব বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান ঠিকানা রহমান নগর, বগুড়া শহর।

২৬. মিজানুর রহমান (রতন), ব্যবসায়ী, '৭১-এ এইচ.এস.সি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ভারতে ট্রেনিং গ্রহণ করে পূর্ব বগুড়া, বগুড়া সদর এলাকা এবং পশ্চিম বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান ঠিকানা কার্টনার পাড়া, কালীতলা, বগুড়া।

২৭. আব্দুল আজিজ রঞ্জু, সাবেক জেলা কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বগুড়া জেলা কমান্ড, সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বর্তমান ঠিকানা ঢেলোপাড়া, বগুড়া।

২৮. হোসেন আলী, অধ্যক্ষ, কাহালু ডিগ্রি কলেজ এবং সভাপতি, কাহালু থানা আওয়ামী লীগ। সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. মোঃ আবদুল কাশেম, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, আদমদীঘি থানা কমান্ড, সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা। বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম : শিহারী, ডাকঘর : নশরৎপুর, থানা : আদমদীঘি।

৩০. মোসলেম উদ্দিন, ভাত বিক্রেতা, মুক্তিযোদ্ধা, ভেলুর পাড়ার ট্রেন উড়ানোর সাথে জড়িত। বর্তমান ঠিকানা ঢেলোপাড়া, রেলওয়ে সীমান্ত এলাকা, বগুড়া।

৩১. মোঃ আজিজুল বারী, অনারারি ক্যাপ্টেন (অব.) মুক্তিযোদ্ধা, পশ্চিম বগুড়ার জয়পুরহাটের বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান ঠিকানা সদর রোড, জয়পুরহাট।

৩২. এস.এম জাকির উদ্দিন (জাকারিয়া), মুক্তিযোদ্ধা, প্রাথমিক প্রতিরোধের সময় বগুড়ায় ছিলেন। পরে বগুড়ার পতন হলে ট্রেনিং নিয়ে পশ্চিম বগুড়া এলাকায় যুদ্ধ করেন। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম : খঞ্জনপুর, ২ নম্বর ওয়ার্ড, জয়পুরহাট পৌরসভা, জয়পুরহাট।

৩৩. জনাব আলী, চাকুরিজীবী (জয়পুরহাট টিনিকল), মুক্তিযোদ্ধা, পশ্চিম বগুড়া এলাকাসহ নওগাঁ এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান ঠিকানা মাস্টারপাড়া, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।

৩৪. মোঃ তহসিন আলী, সরকারী চাকরিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, পূর্ব বগুড়া এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম : বুরুজ, ডাকঘর : কদমতলী, থানা : গাবতলী।

৩৫. মোঃ আব্দুল জলিল, ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমান ঠিকানা গ্রাম : নশিপুর, বাগবাড়ি, থানা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

৩৬. খাজা নাজিমুদ্দিন, কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাবতলী থানা কমান্ড, বগুড়া। মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম : জয়ভোগা, থানা ও পোস্ট গাবতলী।

৩৭. সুনীল চন্দ্র প্রামাণিক, প্রভাষক, নশরৎপুর, দুপচাঁচিয়া বগুড়া। মুক্তযোদ্ধা, পশ্চিম বগুড়ার বিভিন্ন এলাকা এবং নওগাঁ এলাকায় যুদ্ধ করেছেন।

৩৮. মাসুদ হোসেন আলমগীর (নবেল), চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধা, বগুড়ার প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বগুড়ার পতন হলে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেন। বর্তমান ঠিকানা বাগবাড়ি হাউজ, সূত্রাপুর, বগুড়া।

৩৯. শাহীনা আক্তার শাহীন, '৭১ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। রাজাকার ও পাক আর্মিদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। বর্তমান দীনহীনভাবে কষ্টে দিনযাপন করছেন।

৪০. রেজাউল করিম মন্টু, এ্যাডভোকেট ও রাজনীতিবিদ, বগুড়া পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান, মুক্তিযোদ্ধা। বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন যার অধিকাংশই ছিল সফল গেরিলা অপারেশন। ঠিকানা জলেশ্বরীতলা, বগুড়া শহর।

৪১. একরামুল হক, চিনি কলের চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত। মুক্তিযোদ্ধা, জয়পুরহাট এলাকায় প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন। টিনিকলের ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে একটি কামান তৈরি করেন শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্য। এছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৪২. আফতাব হোসেন, চাকরিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, ৭নং সেক্টরের বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। ঠিকানা গ্রাম : সাতবেকী, ইউনিয়ন নিমগাছি, ধুনট, বগুড়া।

৪৩. মোঃ সিদ্দিক হোসেন, ব্যবসায়ী, ৭নং সেক্টরের গাড়িচালক। যুদ্ধরত সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার মহান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমান ঠিকানা শেরপুর, উত্তর সাহাপাড়া।

৪৪. মোঃ বদরুল আলম মজনু, ব্যবসায়ী, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে গাবতলী, ফুলবাড়ী, সরুগ্রাম, নিমগাছি, শাহজাহানপুর প্রভৃতি এলাকায় যুদ্ধ করেন। ঠিকানা মালতীনগর, বগুড়া।

৪৫. নূরুল ইসলাম, চাকরিজীবী, '৭১-এ ১৬ বছরের কিশোর ছিলেন। জয়পুরহাট কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাকবাহিনী বগুড়া দখল করলে ভারতে চলে যান। পরবর্তীতে আজিজুল বারী ও আমজাদ হোসেনের গ্রুপের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। ঠিকানা বুলুপাড়া, পৌরসভা, জয়পুরহাট।

৪৬. দেলোয়ার হোসেন বাবলু, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, জয়পুরহাটের বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। ঠিকানা আরামনগর, জয়পুরহাট।

৪৭. ডা. জহুরুল ইসলাম, হোমিও চিকিৎসক, মুক্তিযোদ্ধা, বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। ঠিকানা নায়লী, বগুড়া।

৪৮. আইন উদ্দিন শেখ, রাজাকার, মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে তখনকার প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকেই তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। তাই রাজাকার হয়েছেন। ঠিকানা পূর্ব ভরনসই, ধুনট।

Dhaka University Institutional Repository

২. দ্বৈতয়িক উৎস
Secondary Sources

২.১ প্রবন্ধ

১. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে বিহারি সম্প্রদায়ের ভূমিকা*, ইতিহাস সমিতি ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি সংখ্যা ২৯-৩০, ১৪১২-১৪।

২. _____, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৯৯১।

৩. আশফাক হোসেন, *মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০০-০৪।

৪. আবুল কাশেম, *বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন : প্রকৃতি ও পরিধি*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০২-০৪।

৫. কে.এম মোহসীন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা* : ইতিহাস সমিতি পত্রিকা ২০-২২ সংখ্যা, ১৩৯৮-১৪০০।

৬. গোলাম মহিউদ্দিন, *বগুড়ায় ভাষা আন্দোলন*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৮।

৭. তৌফিক হাসান ময়না, *২৫ মার্চে প্রতিরোধের যুদ্ধে বগুড়া*, মুক্ত প্রাণের আভা, বিজয় দিবস ২০০৭, জেলা প্রশাসন বগুড়া।

৮. তাইবুল হাসান খান, *মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া*, The Jahangirnagar review part-c, vol-5, সম্পাদনা : নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, ১৯৯১।

৯. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ছয়দফা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০২-০৪।

১০. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণা : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৯০।

২.২ গ্রন্থ

১. অলি আহাদ, *জাতীর রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৮৮।

২. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

৩. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

৪. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, কবির আহমেদ, পড়ুয়া, ১৯৯৬।

৫. আখতারুজ্জামান মন্ডল, *১৯৭১ উত্তর রণাঙ্গণে বিজয়*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯০।

৬. আবু ওসমান চৌধুরী (লে. কর্ণেল অব.), *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা, সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১।

৭. আবুল কালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা*, ঢাকা, পাবনা জেলা, সাহিত্য প্রকাশ।

৮. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধ, চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

৯. _____ (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।

১০. _____, *বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু চর্চা*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

১১. _____ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪।

১২. _____, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯।

১৩. _____ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা*, অরণি প্রকাশনী, ১৯৯৩।

১৪. _____, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা, ১৯৯১।

১৫. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী*, ঢাকা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ১৯৯৮।

১৬. আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩।

১৭. _____, *অসহযোগের দিনগুলি, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮।

১৮. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, অনন্যা, ২০০০।

১৯. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০২।

২০. আমীরুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *শত মুক্তিযোদ্ধার কথা*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

২১. _____, আসলাম সানী (সম্পাদিত), *আমার বাবা, শহীদ বুদ্ধিজীবীর সন্তানদের স্মৃতিকথা*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯১।

২২. আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তি সংগ্রামে বাংলা ১৯০৫-১৯৭১*, ঢাকা, ফাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২৩. _____, *মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্র বাহিনী*, ঢাকা, কৃষ্টি প্রকাশ, ১৯৯৯।

২৪. _____, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯২।

২৫. আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী, *ভাষা আন্দোলন : অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯০।

২৬. আসাদ চৌধুরী এবং এনামুল কবির সম্পাদিত, *যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ (প্রথম খণ্ড)*, ঢাকা, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১।

২৭. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, তৃতীয় বর্ধিত মুদ্রণ, ১৯৭৫।

২৮. আতিউর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস, লিঃ, ২০০০।

২৯. আহমদ রফিক, *একাত্তরে পাক বর্বরতার সংবাদ ভাষ্য*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০১।

৩০. এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৫।

৩১. _____, *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা, ২০০০।

৩২. _____, *রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত)*, ঢাকা, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০১।

৩৩. এম.আর আখতার মুকুল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

৩৪. _____, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯৭।

৩৫. _____, *চরমপত্র*, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ২০০০।

৩৬. এম.এস পনির উদ্দিন রশীদ হায়দার ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ১৯৯৯।

৩৭. এম.এস.এ ভূঁইয়া, *মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯।

৩৮. এহসানুল হক রিপন, *মুক্তিযুদ্ধের লেখক*, সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, ১৯৯৯।

৩৯. এন্থনীম্যাস করেনহাস, *দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ (রণাঙ্গি অনূদিত)*, ঢাকা, পপুলার পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬।

৪০. এ.কে মুজিবুর রহমান, *রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিকথা (তৃতীয় সংস্করণ)*, প্রকাশক মিসেস মিনু রহমান, ১৯৯৫।

৪১. এ.জে.এম সামুছউদ্দিন তরফদার, *দুই শতাব্দীর বুকে বগুড়া (বগুড়ার ইতিহাস)*, ১ম খণ্ড, বগুড়া, প্রজাবাহিনী প্রেস, ১৯৭৬।

৪২. কাজী মোহাম্মদ মিছের, *বগুড়ার ইতিকাহিনী [বৃহত্তর বগুড়া জেলার ইতিহাস]*, গতিধারা, ২০০৭।

৪৩. কাজী জাহেদ ইকবাল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস চর্চার গতিধারা*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০।

৪৪. কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২।

৪৫. কাজী হারুনর রশীদ, *নারী নির্যাতন '৭১*, ঢাকা, দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৯১।

৪৬. কাজী সামসুজ্জামান, *আমরা স্বাধীন হলাম*, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৮।

৪৭. কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৯২।

৪৮. কে.এম রাইছউদ্দীন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬।

৪৯. গাজীউল হক, *একাত্তরের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ।

৫০. তুলরুদ্দীন, *মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৯।

৫১. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬।

৫২. জোবাইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।

৫৩. জাকির হোসেন রাজু, *গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ*, দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

৫৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৫৫. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৫৬. ড. কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৩।

৫৮. _____, *একাত্তরে গাইবান্ধা, বাংলাদেশ চর্চা*, ঢাকা, ২০০৫।

৫৯. ড. শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাগেরহাট জেলা*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৫।

৬০. ড. তপন বাগচী, *মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ*, ঢাকা, ঐতিহ্য, ২০০৭।

৬১. ড. মোহাম্মদ হানদান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নিকট বিশ্লেষণ*, কলিকাতা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৬।

৬২. _____, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)*, ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব গ্রন্থলোক, ১৯৯১।

৬৩. ডা. এম.এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী, একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত নারী নির্যাতন ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সংকট বিষয়ক প্রামাণ্য দলিল ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি*, ঢাকা, জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্ট্যাডিজ সেন্টার, ২০০২।

৬৪. _____, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি জেনোসাইড*, ঢাকা, আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্টাডিজ সেন্টার, ২০০১।

৬৫. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, ঢাকা, দিব্য এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

৬৬. _____, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৬।

৬৭. _____, *গণহত্যা ১৯৭১*, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০০১।

৬৮. *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৭-১৯৪৮*, ঢাকা, ১ম খণ্ড প্রতিভাস, ২০০১।

৬৯. দেবেন শিকদার, *উপমহাদেশের কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি*, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ১৯৮৮।

৭০. নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৫।

৭১. নিগার চৌধুরী, *উনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলি*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

৭২. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউজ ১৯৯৩।

৭৩. পান্না কায়সার, *হৃদয়ে একাত্তর*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

৭৪. পারভেজ হোসেন, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী।

৭৫. প্রভাস চন্দ্র সেন বি.এল, *বগুড়ার ইতিহাস*, বগুড়া, বগুড়া ইতিহাস গবেষণা পরিষদ, ২০০০।

৭৬. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৪।

৭৭. ব্রিগেডিয়ার এম মোসাহেদ চৌধুরী (অব.), সম্পাদক *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বগুড়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৮৯।

৭৮. ফয়িদ ফবিয় (অনূদিত), *মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক*, ঢাকা, পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

৭৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ১ম খণ্ড, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

৮০. _____, *সাম্প্রদায়িকতা*, মুক্তধারা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮০।

৮১. _____, *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ*, মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮২।

৮২. _____, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬।

৮৩. বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

৮৪. বেগম মুশতারী শফি, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, ঢাকা, প্রিতম প্রকাশনী, ১৯৮৯।

৮৫. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৮৬. বেগম মুশতারী শফি, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, ঢাকা, প্রিয়ম প্রকাশনী, ১৯৯২।

৮৭. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৮৮. বেগম ফোরকান, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকা, সুমী প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ১৯৯৮।

৮৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (ষষ্ঠ খণ্ড), *এরিয়া সদর দপ্তর বগুড়া, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনা সদর*, ঢাকা, *শিক্ষা পরিদপ্তর*, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮।

৯০. মইদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি, ১৯৮৬।

৯১. মওদুদ আহমেদ, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৬।

৯২. মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, ঢাকা, গণ প্রকাশনী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, ২০০১।

৯৩. মফিজুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, বই বিতান, ১৯৮৫।

৯৪. মনসুর আহমদ খান (সম্পাদিত), *উনসত্তরের শহীদ ডক্টর শামসুজ্জোহা*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. মহিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *আমাদের একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, সিডিএল, ২০০৬।

৯৬. মোহাম্মদ সা'দাত আলী (সম্পাদিত), *রণাঙ্গন '৭১, সাতাশটি বৃহৎ যুদ্ধ*, সূচিপত্র, ২০০৫।

৯৭. মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী, *সংবাদপত্রে একাত্তরের স্বাধীনতা*, জোনাকী প্রকাশনী, বইমেলা ২০০১।

৯৮. মনসুর আহমেদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

৯৯. মইনুল হাসান (প্রধান সম্পাদক); *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল, প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

১০০. মুহম্মদ জাফর ইকবাল (সম্পাদিত), *বিশ বছর পর*, মোহনা প্রকাশনী, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, ১৯৯৩।

১০১. মুহাম্মদ নুরুল কাদির, *দু'শো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা, মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯।

১০২. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী, রাষ্ট্র, সমাজ রাজনীতি*, দিব্য প্রকাশ, ২০০৪।

১০৩. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ২০০২।

১০৪. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খণ্ড), (১৯৫৩-১৯৬৯)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

১০৫. মোহাম্মদ এমদাদুল হক, *সংগ্রামী ঠাকুরগাঁও ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, সূচিপত্র, ২০০৬।

১০৬. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস একটি অনুসন্ধান*, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৬।

১০৭. মোঃ হামিদুল্লাহ খান (বীর প্রতীক), *উত্তর রণাঙ্গন*, ফরিদ কবির (সম্পাদিত), *স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪।

১০৮. মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি ১, বাংলাদেশ চর্চা*, ঢাকা, ২০০৪।

১০৯. _____, (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি ২, বাংলাদেশ চর্চা*, ঢাকা, ২০০৪।

১১০. মুনতাসীর মামুন, *ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০১।

১১১. _____, *পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

১১২. _____, *ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

১১৩. মেজর এটিএম হামিদুল হোসেন তারেক, বীরবিক্রম পি.এস.সি (অব.), *জলছবি '৭১*, প্রকাশক মিসেস শামীম তারেক, বইমেলা ২০০০।

১১৪. মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীরবিক্রম, *একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা, ঐতিহ্য।

১১৫. মেজর রফিকুল ইসলাম, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : প্রতিরোধের প্রথম প্রহর*, ঢাকা, ইউ.পি.এল ১৯৯৩।

১১৬. _____, *মুক্তিযুদ্ধের দু'শো রণাঙ্গন*, ঢাকা, অনন্যা, ১৯৯২।

১১৭. _____, *রণাঙ্গণে জেডফোর্স, জে ফোর্স, এস ফোর্স*, ঢাকা, অনিন্দ্য, ১৯৯২।

১১৮. _____, পি.এস.সি *বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯২।

১১৯. _____, পি.এস.সি *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯১।

১২০. _____, পি.এস.সি *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার*, ঢাকা, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭।

১২১. _____, পি.এস.সি *উত্তর জনপদে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।

১২২. _____, পি.এস.সি *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

১২৩. _____, পি.এস.সি *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা ১৯৭১*, ঢাকা, অনন্যা, ১৯৯৪।

১২৪. _____, পি.এস.সি *মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯।

১২৫. মেজর নাসির উদ্দিন, *যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১২৬. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশ মাস*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১২৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ*, কলকাতা, ১৯৭৪।

১২৮. রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

১২৯. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

১৩০. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১।

১৩১. _____, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

১৩২. _____, (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

১৩৩. রফিক উল ইসলাম, বীরোত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ*, ঢাকা, বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১।

১৩৪. রাবেয়া খাতুন, *একাত্তরের নয় মাস*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

১৩৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ)*, কলকাতা।

১৩৬. রশীদ হায়দার, *অসহযোগ আন্দোলন : একাত্তর*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

১৩৭. _____, (সম্পাদিত), *স্মৃতি : ১৯৭১ (১-৯ খণ্ড)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৯৯।
১৩৯. রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৭।
১৪০. রফিকুর রশীদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুর জেলা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী ২০০৭।
১৪১. রিটা আশরাফ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনল যারা*, শিখা প্রকাশনী, ২০০০।
১৪২. লেঃ কর্ণেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১।
১৪৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা*, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৪।
১৪৪. _____, *একাত্তরের রণাঙ্গণ*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৮।
১৪৫. শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, একাত্তরের ঘাতক, ঢাকা, দালাল নির্মূল কমিটি, ২০০৭।
১৪৬. _____, (সম্পাদিত), *সেক্টর কমান্ডাররা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৬।
১৪৭. _____ (সম্পাদিত), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, ঢাকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯৯।
১৪৮. _____, *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০০।
১৪৯. _____, *শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৭।
১৫০. শাহীন আখতার, হামিদা হোসেন, সুরাইয়া বেগম, সুলতানা কামাল মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, *নারীর ৭১ ও যুদ্ধ পরবর্তী কথা কাহিনী*, ঢাকা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০০১।
১৫১. শেখ মোহাম্মদ জাহিদ, *মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লেবারেশন ফোর্স (বি.এল.এফ)*, ঢাকা, আগামী, প্রকাশনী, ১৯৯৭।
১৫২. স্বদেশ রায়, *বিক্ষুব্ধ মার্চ '৭১*, পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯১।
১৫৩. সাইদুজ্জামান রওশন, ১৯৭১ *ঘাতক দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি*, বইপত্র, ২০০৭।
১৫৪. সত্যেন সেন, *বগুড়ার ছাত্রদের অভিনন্দন জানাই, প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭১।
১৫৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬।
১৫৬. _____, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।
১৫৭. _____, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা*, ঢাকা, ভান্না প্রকাশনী, ১৯৮২।
১৫৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রধান সম্পাদক), *বাংলা পিডিয়া (১-১০ খণ্ড)*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।
১৫৯. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন*, কলকাতা, ১৯৭২।
১৬০. সালাহ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
১৬১. সুকুমার বিশ্বাস, *অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
১৬২. _____, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য কাহিনী*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।
১৬৩. _____ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর, অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪।
১৬৪. _____, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।
১৬৫. _____, *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*, সুবর্ণ ২০০১।
১৬৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল*, কলকাতা, ভারতী বুকস্টল, ১৯৮০।
১৬৭. সিমিন হোসেন রিমি, *আমার বাবার কথা*, ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
১৬৮. সুবীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষল, *রংপুর জেলায় কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস*।
১৬৯. সাইদুর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।
১৭০. সিরাজ উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ গড়লো যারা*, ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী।
১৭১. হারুন হাবীব, *জনযুদ্ধের উপাখ্যান*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।
১৭২. হারুন হাবীব (সম্পাদিত), *প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১।
১৭৩. হাসান আজিজুল হক, *অতলের আঁধি*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৪. হাসান আনোয়ার (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ*, ঋদ্ধি প্রকাশন, ১৯৯৮।

১৭৫. হাসান উজ্জামান, *১৯৭০-এর নির্বাচন ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নীতি : বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গ*, ঢাকা ১৯৮১।

১৭৬. A. M. Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1967.

১৭৭. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Rule of Awami League*, Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1982.

১৭৮. Abdul Karim, *Social History of Muslims in Bengal Down to A.D 1338*, Baitus-sharaf Islamic Research Institute Chittagong, 1985.

১৭৯. *Bangladesh Population Census 1991*.

১৮০. Momtazur Rahman Tarafdar, *Hosain Shahi Bengal* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1965.

১৮১. R.C Majumdar, *History of Ancient Bengal*, Calcutta, G Bharadheai and Company, 1971.

১৮২. _____, *Struggle for Freedom* (Indian Press), 1971.

১৮৩. P.N. Chopra [ed], *India : Society Religion and Literature in Ancient and medieval period*, Publication Division Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi, 1990.

১৮৪. Fakhruddin Ahmed, *Critical Times*, Dhaka, University Press Ltd, 1994.

১৮৫. Herbert Feldman, *From Crisis to Crisis, Pakistan : 1969-1971*, London, Oxford University Press, 1972

১৮৬. _____, *The End and the Beginning : Pakistan 1969-1971*, London, Oxford University Press, 1975.

১৮৭. Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, Dhaka, Academic Publishers, 1990.

১৮৮. Rounak Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, New York, Columbia University Press, 1972.

১৮৯. Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh : Explorations of a Hidden Nation*, Dhaka, University Press Ltd, 1996.

১৯০. M.A Mohaimen, *Awami League in the Politics of Bangladesh*, Dhaka, Pioneer Publications, 1990.

১৯১. Shamsul Huda Harun, *The Making of the Prime Minister : H.S Suhrawardhy*, Dhaka, National University, 2001.

১৯২. Kamruddin Ahmad, *A Socio Political History of Bengal and the birth of Bangladesh*, Dacca Inside Library, 4th edn, 1975.

২.৩ অপ্রকাশিত থিসিস

১. আব্দুস সাত্তার, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা*, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল. থিসিস, (অপ্রকাশিত)।

২. মোঃ হাবিব উল্লাহ বাহার, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলা*, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল. থিসিস, ২০০২ (অপ্রকাশিত)।

৩. মীর ফেরদৌস হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে মানিকগঞ্জ*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল. থিসিস (অপ্রকাশিত)।

৪. দিনাক সোহানী কবির, *পূর্ব বাংলায় রেলওয়ের আগমন এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর এর প্রভাব ১৮৬২-১৯৪৭*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি.এইচ.ডি থিসিস, ১৯৯৫ (অপ্রকাশিত)।

৫. সৈয়দ মোঃ শাহান শাহ্, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নরসিংদী (১৯৪৭-৭১)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ ২০০৫।

৬. নূরে নাসরিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনায় ক্ষেত্রে জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত তথ্যের মূল্যায়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২।

৭. মোঃ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৫৩-১৯৬৬*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি.এইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।